আনন্দমেলা



প্রচ্ছদকাহিনী
দেশবিদেশের ঘুড়ি
লীলা মজুমদারের সম্পূর্ণ উপন্যাস
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা
মীরা বালসুব্রমনিয়নের ভ্রমণকাহিনী
সমরেশ মজুমদারের গল্প



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান ঃ নীলাচল বৈদ্য

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদকাহিনী **'বিশ্বকাপ জিতবে কারা'**
লিখেছেন: ক্লাইভ লয়েড, মাইক ব্রিয়ারলি, অ্যালান বর্ডার, মাইক গ্যাটিং, অভীক মিত্র, সম্বরণ ব্যানার্জি, মানস চক্রবর্তী, অশোক রায়, সুব্রত সরকার, রাজু মুখার্জি, কৃশানু ভট্টাচার্য
প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়া
সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ উপন্যাস 'পক্ষিরাজ'
অজেয় রায়ের গল্প 'ফেকলুদার গাড়ি'

সম্পাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম পাঁচ টাকা।
বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ৩০ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

গত সংখ্যার উত্তর

(১) রঘুনন্দন স্বরূপ পাঠক ।
(২) স্বামী বিবেকানন্দ ।



(৩) ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্যাটেলাইট ।
(৪) নীরদ সি চৌধুরী ।
(৫) সেলিম আলি ।
(৬) জ্যাকি কুগান ।
(৭) নেপালে ।
(৮) মাইকেল ফ্যারাডে ।
(৯) মাইক টাইসন (ও' বি) ।
(১০) ফ্রেঞ্চ শব্দ অ্যাভিরিয়া থেকে ।
(১১) জামাইষষ্ঠী ।
(১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
(১৩) কিউই পাখি ।
(১৪) অ্যালান নট (ইংল্যান্ড) ।
(১৫) পামির ও তিব্বত ।
(১৬) মেসোপটেমিয়া ।
(১৭) ডব্লিউ, এইচ কের্বোথ্রাসের নেতৃত্বে গবেষণা চালিয়েছিল **E.I.Du pout de Nemours & Co.**
(১৮) ওয়েস্‌লি হল ।



(১৯) কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত ।
(২০) এম· এ· এম· রামস্বামী ।



কুইজ

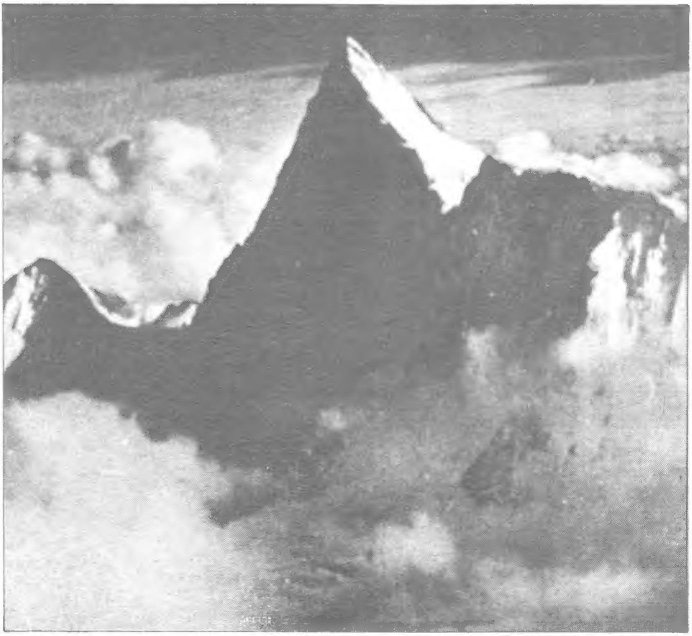
নিল ও'ব্রায়েন

সেই ছোট্ট ছেলেটি কথা রেখেছিল

দুর্ধর্ষ রোমানরা কার্থেজিনিয়ানদের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষে নেমেছিলেন সিসিলিতে । কার্থেজিনিয়ানরা তখন শক্ত হাতে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন । রোমানরা ডাঙায় ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী, কিন্তু যুদ্ধ জয়ের জন্য জাহাজ বানানোর ওপরেও জোর দিয়েছিলেন তাঁরা । এমনকী শুকনো জমির ওপরেও নৌকো চালাবার তালিম দেওয়া হত ।

যুদ্ধে রোমানদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিরাট, কিন্তু নতুন-নতুন জাহাজ তৈরিতে এবং নিত্য নব সেনা নিয়োগে রোমানদের উৎসাহের কোনও অন্ত ছিল না । দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে পরের পর আক্রমণ চালিয়ে রোমানরা কার্থেজিনিয়ানদের তাড়িয়ে দিয়ে সিসিলি দখল করে নেন অবশেষে ।

অশান্ত পরিবেশের মধ্যে উভয় পক্ষই ভবিষ্যতের আরও বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছিল । ওই সময় একটি ছোট ছেলেকে স্পেনের পূজা-বেদীর সামনে নিয়ে গিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প নেওয়ানো হয় । ছেলেটি ছিল ভবিষ্যৎ-পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক, নাম হ্যানিবল । বড় হওয়ার পরে স্থলপথে রোম আক্রমণ করেছিলেন হ্যানিবল । পথটি ছিল ভয়ঙ্কর দুর্গম । অশান্ত উপজাতিদের শায়েস্তা করে খুব খারাপ আবহাওয়ায় হাতিসমেত আল্পস পার হওয়া ছিল অসম্ভব এক কাজ ।



বরফ-ঢাকা দুর্গম আল্পস



হ্যানিবল

বরফ-ঢাকা দুর্গম পাহাড়ি পথ, হাতি ইত্যাদি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্তু সঙ্গে নিয়ে পার হওয়ার কথা কল্পনা করতে পারো তোমরা ! পথ অতিক্রম করতে বহু দিন লেগে গিয়েছিল হ্যানিবলের, এবং পথের মধ্যেই তাঁর সেনাবাহিনীর এক-চতুর্থাংশ প্রাণ হারিয়েছিল । কিন্তু ইতালিতে পৌঁছবার পরে তিনি অনায়াস-দক্ষতায় রোমান সেনাবাহিনীকে তছনছ করে দিয়ে উত্তর ইতালি দখল করে নেন ।

রোমের মিত্রপক্ষ এবার রোমের পাশে এসে দাঁড়ান । পরিবর্তিত রণনীতিতে হ্যানিবলের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে নামলেন না কেউ । কার্থেজ থেকে সরবরাহ আসার পথ বন্ধ হল । ফলে, দুর্বল হয়ে পড়লেন হ্যানিবল।কিন্তু শত্রুদের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এলেন প্রতিভাবান সেনানায়ক । তবে খাদ্য, অস্ত্র ও সৈন্যের জোগান দরকার । এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যে স্পেন থেকে এলেন তাঁর ভাই হাসড্রুবল । তবে দুর্ভাগ্যক্রমে পরাজিত হলেন তিনি । তাঁর ছিন্ন মাথা ছুঁড়ে দেওয়া হল হ্যানিবলের শিবিরে ।

রোম এবার পালটা আক্রমণ হানল কার্থেজের ওপর । শহরকে রক্ষা করার জন্য ডেকে পাঠানো হল হ্যানিবলকে । হ্যানিবল ছিলেন ইতালিতে, পনেরো বছর ধরে ওখানে অভিযান চালিয়ে গেছেন তিনি । প্রবল এক যুদ্ধের শেষে পতন হল কার্থেজের । শান্তির শর্ত হিসেবে আত্মসমর্পণ করতে বলা হল হ্যানিবলকে । কিন্তু যুদ্ধের বীর নায়ক হ্যানিবল আত্মসমর্পণের চাইতে আত্মহননকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন ।

দুটি ছাপার ভুল

(১) ২৪ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত অস্ত্রোপচার-কাহিনীর প্রথম তারিখটি হবে **১৮৬৫, অবশ্যই ১৯৮৫** নয় ।

(২) ২২ জুলাই 'গত সংখ্যার উত্তর' অংশে অয়েল অ্যান্ড-এর পরে বসবে **ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন** ।

প্রশ্ন

(১) কোন্ ভারতীয় রাজ্যে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি ? (১৯৮১-র লোকগণনা অনুযায়ী)—**সুজাতা মুখোপাধ্যায়**, রানিগঞ্জ ।

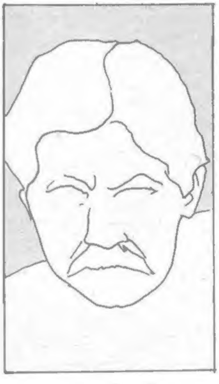
(২) অফসেট প্রিন্টিং পদ্ধতির আবিষ্কারক কে ? —**বলাইলাল চিনি**, মেচেদা ।

(৩) 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থের রচয়িতা কে ? —**জয়দীপ ঘটক**, রানিগঞ্জ ।

(৪) 'ওনাম' ভারতের কোন্ রাজ্যের উৎসব ? —**প্রদীপ্ত বাগচী**, শেওড়াফুলি ।

(৫) 'কেতকী মিত্র' কোন্ উপন্যাসের চরিত্র ? —**মহুয়া ভট্টাচার্য**, শান্তিনিকেতন ।

(৬) আলেক্সি পেশকভ কে ছিলেন ? —**প্রদীপ্ত বাগচী**, শেওড়াফুলি ।



(৭) 'দ্য সাইক্রোনিক হিন্দু' কে ? —**অমিতাভ দত্ত**, মধ্যমগ্রাম ।

(৮) বর্তমানে ইউ- এন- সদর দফতর কোথায় ?—**মৌ বন্দ্যোপাধ্যায়**, রানিগঞ্জ ।

(৯) এশিয়ার বৃহত্তম সার-কারখানা কোথায় অবস্থিত ? —**সুদীপ মণ্ডল**, বহরমপুর ।

(১০) অ্যালফ্রেড নোবেল কত সালে মারা যান ? —**সুপ্রিয় কর্মকার**, কলি-২৮ ।

(১১) ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কে ? —**সমীর হালদার**, কলি-১৪ ।



(১২) উত্তরমেরু কে আবিষ্কার করে ? **স্বপন সিংহ রায়**, দুর্গাপুর-১৩ ।

(১৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের মুদ্রার নাম কী ? —**শ্রাবণী ঘোষ**, হুগলি ।

(১৪) জাপানের জাতীয় ফুল কী ? —**শেখর রায়**, হাবড়া ।

(১৫) পৃথিবীর প্রথম মহাকাশযানের নাম কী ? —**কালিদাসী রায়**, মেচেদা ।

(১৬) এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ট্রফিটির নাম কী ? —**সন্দীপন পাল**, মেদিনীপুর ।

(১৭) জুলফিকার আলি ভুট্টোর ফাঁসি হয় কবে ? —**শ্যামলী বাগচী**, মালদা ।



(১৮) রুমানিয়ার মুদ্রার নাম কী ? —**অজেয় সিংহ**, কলি-২৭ ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

সম্পাদকের চিঠি

চলছে ইল্‌শেগুঁড়ি,
তবু দুই ভাই
তৈরি রেখেছে ঘুড়ি,
মাঞ্জা, লাটাই।
‘ভোকাট্টা’ চিৎকারে
কাঁপাবে আকাশ
ওরাই, কে জেতে হারে,
কাল দেখে যাস।



পিরামিডের অন্তরালে

২৪ জুনের আনন্দমেলায় ‘পিরামিডের অন্তরালে’ পড়লাম। ভাল লাগল মিহির বিশ্বাস ও আশিস উপাধ্যায়ের প্রচ্ছদকাহিনী। তবে তুতানখামেনের সমাধি-আবিষ্কারক ও সর্বাধিক উৎসাহী ব্যক্তি হাওয়ার্ড কার্টার-এর নাম ‘তুতানখামেনের অভিশাপ’ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়নি। কার্টার অবশ্য সমাধি আবিষ্কারের সতেরো বছর পর, ১৯৩৯ সালে মারা যান। এবং তাঁর মৃত্যু অস্বাভাবিক কোনও কারণে ঘটেনি।
কেতকী বসুর ভ্রমণকাহিনীতে একটি ভুল চোখে পড়ল। তিনি লিখেছেন, ‘চলে আসি ১৯২২ সালে। মিশরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন চলছে পুরোদমে। হাওয়ার্ড কার্টার নামে এক ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ কাজ করছেন লুক্সারে। অনেক জায়গায় কাজ শেষ হয়ে গেছে, বহু সমাধি উদ্ধার করা হয়েছে।’ এ ব্যাপারে বলি, হাওয়ার্ড কার্টার শুধু তুতানখামেনের সমাধিই আবিষ্কার করেছিলেন।

শুভেন্দু দাশমুন্সী
কলকাতা ২৫

পিরামিড তৈরি করতে কত খরচ পড়বে

২৪ জুনের আনন্দমেলার প্রচ্ছদকাহিনী পড়ে পিরামিডের বিশালত্ব অনুমানের চেষ্টা করছিলাম। লেখাটির শেষাংশে আধুনিক যুগে মোটামুটিভাবে শস্তায় পিরামিড তৈরির খরচের কথা বলা হয়েছে। একটা মস্ত বড় সংখ্যা কথায় বলা আছে। কিন্তু এককটা বলা হয়নি। মার্কিন ভদ্রলোকের হিসাব হলে ওটা ডলার হওয়াই স্বাভাবিক। লেখক হয়তো টাকার অঙ্কেই খরচটা দেখিয়েছেন। সঠিক এককটা জানতে আগ্রহী থাকলাম।

স্বাতী সেনগুপ্ত
কলকাতা ৬৪



পিরামিডের উপরিভাগ

মিহির বিশ্বাস লিখেছেন, গিজা-র দা গ্রেট পিরামিডের উপরিভাগ ছুঁচলো নয়, চূড়ায় অনেকটা সমতল জায়গা আছে। আবার ওই ২৪ জুন সংখ্যাতেই কেতকী বসু তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন, পিরামিডটি একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। এই দু’টি তথ্যের কোন্‌টি ঠিক, তা জানতে ইচ্ছে করে।

অয়ন চক্রবর্তী
কলকাতা ৯০

সত্যিই কি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না

পিরামিড নিয়ে তথ্য ও রোমাঞ্চ-ভরা লেখাগুলি সত্যিই অনবদ্য। এর মধ্যে আশিস উপাধ্যায়ের লেখাটি দারুণ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। ওঁর লেখাটি পড়ে জানতে পারা গেল, মিশরের মমি বা পিরামিডের ব্যাপারে যে বেশি উৎসাহ দেখিয়েছে, পিরামিডের খননকার্য করেছে বা মমি সরিয়েছে, তাদেরই কিছু না কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। আজকের বিজ্ঞানের যুগে এসব মেনে নেওয়া কঠিন। ওই সব দুর্ঘটনার সত্যিই কি কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি?

পতিতপাবন মণ্ডল
দুর্গাপুর ১০

সত্যিই কি অভিশাপ

‘তুতানখামেনের অভিশাপ’ প্রবন্ধটি পড়লাম। প্রশ্ন হল, তুতানখামেনের নিজস্ব মমিটি কোথায় আছে? সেটা কি পিরামিডের ভিতরে, না কোনও মিউজিয়মে? মিউজিয়মে যদি থাকে, তবে সেখানে কি দর্শক ও কর্মচারীরা তাঁর অভিশাপ পাচ্ছেন না? পিরামিডের চোররাও কি অভিশপ্ত হচ্ছে না? তা ছাড়া এখানের মমির ছবিগুলি যাঁরা তুলেছেন, তাঁদেরও কি কিছু হয়নি? পিরামিডের ভেতরে এখন যাঁরা ঢোকেন, তাঁদের কি কোনও অসুবিধা হয় না?

উদয়ন মজুমদার
হালিশহর, উত্তর ২৪ পরগনা

গামা রশ্মি

‘তুতানখামেনের অভিশাপ’ লেখাটি, এক কথায়, দারুণ রোমাঞ্চকর। ফারাওদের অভিশাপের ব্যাপারটা বিজ্ঞান অন্তত স্বীকার করবে না। সাংবাদিক ফিলিপ ভ্যান্ডেনবার্গ ও পরমাণু বিজ্ঞানী বুলগারিনির মতবাদই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। বিশেষ করে বুলগারিনির মতবাদ। প্রায় তিন হাজার বছর আগের পিরামিডের সমাধিতে স্বাভাবিকভাবেই বহু ব্যাকটিরিয়া জন্মেছে। আবার ডার্মাটেরিয়া নামে এক ধরনের মাছির প্রধান আশ্রয়স্থল হয় এই সব স্থান। এই মাছিরা জোরোফোরা নামের এক ধরনের মশার দেহে ডিম পাড়ে। ডিমবহনকারী ওই সব মশা সুস্থ মানুষের দেহে বসার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ডিম থেকে লার্ভা বের হয় ও সুস্থ মানুষ মারাত্মক চর্মরোগে আক্রান্ত হয়। শতকরা ৯৫ জন মানুষেরই এই রোগে মৃত্যু হতে পারে। কারণ ওই সব লার্ভা মানুষের টিস্যু অসাড় করে দেয়। কিন্তু লর্ড কারনারভন ও তাঁর সহকর্মীরা নিশ্চয় এই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন।
তাই মনে হয়, বিজ্ঞানী বুলগারিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম থেকে বিচ্ছুরিত মারাত্মক গামা রশ্মি যে-কোনও মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আমার ধারণা, তুতানখামেনের অভিশাপ নয়, গামা রশ্মিই ‘অস্বাভাবিক’ মৃত্যুর কারণ।

সমীর বাগ
কুলগাছিয়া, হাওড়া

উনিশ, না আঠারো?

‘ফারাওয়ের দেশে’ ভ্রমণকাহিনীটি পড়লাম। লেখিকা বলেছেন, তুতানখামেন মাত্র উনিশ বছর বয়সে মারা যান! কিন্তু আমার ইতিহাস-বইয়ে আছে, ‘Tutankhamen was only nine years old when he became King and he died at the age of 18.’ কোন্‌টা ঠিক জানার ইচ্ছা রইল। আমি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি।

বিক্রম সাহা
কলকাতা ৫৪



তিনটে কোকিল

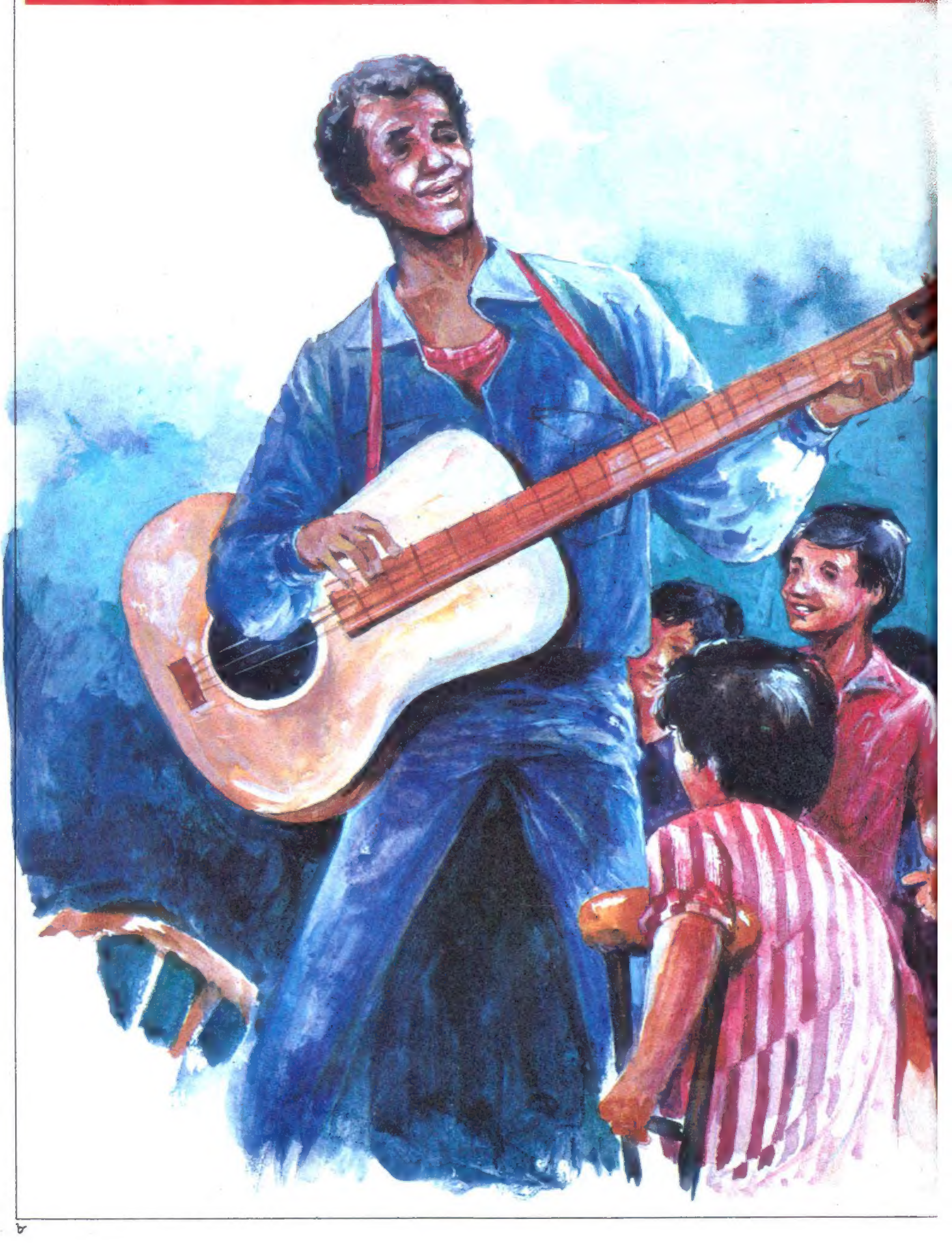
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তিনটে কোকিল সন্ধেবেলা ডাকে
বসন্তে নয়, প্রচণ্ড বৈশাখে
শিরীষ গাছে, কৃষ্ণচূড়ায়, তেঁতুল পাতার ফাঁকে
এ এখানে, সে সেখানে, কে যে কাকে ডাকে !

সারাটা দিন আগুন গলা, আকাশ যেন পাথর
কাঠবিড়ালি, পিঁপড়েরাও কাতর
হাওয়ায় দোলে চোখ-ঝল্‌সা ধপধপে এক চাদর
নদীর মধ্যে নদীও নেই, পাথর !

এই গ্রীষ্মে সমস্ত গান মানা
পুড়ে যাচ্ছে চাতক পাখির ডানা
এর মধ্যেই হঠাৎ এমন দুরন্ত এক বসন্তের হানা
তিনটে কোকিল মানল নাকো মানা !

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী





প্রতিবন্ধী

সমরেশ মজুমদার

ওকে প্রথম দেখেছিল রাহুল। যেদিন পায়ে বেশি ব্যথা লাগে, সেদিন দোতলার ব্যালকনিতে চুপচাপ ক্রাচ পায়ে রেখে বসে থাকে সে। ডক্টর সোমের সেইরকমই নির্দেশ।

তখন সকালবেলা। পড়ার সময় শেষ হয়ে গেছে। হোমের ছেলেমেয়েরা রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ব্যালকনিতে বসে রাহুল মাউথঅর্গানে জিভ ছোঁয়াচ্ছিল। তার পাশে বসে ছিল রুনা। রুনা চোখে দেখতে পায় না। রাহুলের সঙ্গে ওর খুব ভাব।

ডক্টর সোমের এই হোমে পাঁচরকমের প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমে সাহায্য করা হয়। ডক্টর সোম প্রায়ই বলেন, 'তোমরা কতটা অক্ষম, সেটার হিসেব না-করে কতটা সক্ষম সেইটে জানতে হবে। প্রতিটি দিন যাতে সেই জানাটা এক জায়গায় থেমে না থাকে, তার চেষ্টা করা মানে বেঁচে থাকা।'

এই হোমে আসার আগে রাহুলের মতো রুনাও ভাবতে পারেনি, তাদের সামনে একটা সুন্দর জীবনের ইঙ্গিত আছে। পাবলো বলে একটা বাচ্চাকে ওর বাবা-মা এখানে রেখে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। পাবলো না পারত কথা বলতে, না সে কানে শুনত। ছোট্ট একটা অপারেশনের পর ডক্টর সোম আর সুপ্রিয়াদিদি কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাবলোকে 'মা' বলতে শিখিয়েছেন। পোলিওতে রাহুলের একটা পা অকেজো হয়ে গেছে। যে হাতটা দিয়ে সে মাউথঅর্গান বাজায়, সেটাকে কোনওমতে সে মুখ পর্যন্ত তুলতে পারে।

দেখতে পেয়ে রাহুল অবাক হয়ে বলেছিল, "এই দ্যাখ কে ঢুকছে হোমে!"

রুনার চোখে কালো চশমা, "আমি কী করে দেখব?"

রাহুল জিভ কাটল। তারপর সাত বছরের রুনার কাঁধে হাত রেখে বলল, "একটা বিরাট লম্বা কালো মানুষ। 'টমকাকার কুটির' বলে একটা বই আছে, সেই টমকাকার মতো।"

রুনার কপালে ভাঁজ পড়ল। "সেই যে লোকটা, যাকে মনিব চাবুক মারত, সে এসেছে?"

"দূর! সে তো বইয়ে আছে। এ অন্য লোক। ওইরকম দেখতে।"

ডক্টর সোম চিঠিটা পড়লেন। পাকা চুলে হাত বোলানো তাঁর অভ্যাস। বললেন, "আপনি এতদিন পুরুলিয়ার ইন্টারন্যাশনাল হোম ফর অর্ফান-এ কাজ করেছেন। ফাদার লিখেছেন, দেশে ফিরে যাওয়ার আগে আপনি কয়েকদিন প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাটাতে চান। কিন্তু কেন?"

লোকটির চেহারা বিশাল। গায়ের রঙে কালো বিদ্যুৎ যেন ঠিকরে ওঠে নড়াচড়া করলেই। মাথায় জমে-যাওয়া কোঁকড়া চুল। একটা ব্যাগ আর গিটারের বাক্স পাশে রাখা। লুথার হাসল, "ওয়েল ডক্টর, আমি এতদিন যে-সব বাচ্চাদের দেখেছি, তারা সামাজিক প্রতিবন্ধী। ঈশ্বর কিংবা মানুষের অবহেলা যাদের শারীরিক প্রতিবন্ধী করে


ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!
BRITANNIA
Milk Bikis
সুস্বাদু পুষ্টিকর বিস্কুট
ব্রিটানিয়া

রেখেছে, তাদের একটু কাছ থেকে জানতে চাই। সাতদিন থাকব এখানে, আমার দ্বারা যে-কাজ হবে বলে মনে করবেন, তা-ই করে দেব।"

ডক্টর সোম হাসলেন, "কিছু মনে করবেন না। আমরা ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষা দিই, যাতে তারা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পারে। সে-ব্যাপারে আপনি কোনও সাহায্য করতে পারবেন না। কিন্তু ফাদার লিখেছেন, আপনি চমৎকার গিটার বাজিয়ে গান গাইতে পারেন। আপনি বাচ্চাদের ভাল লাগার গান গাইতে জানেন ?"

লুথার মাথা নাড়ল। "আমি চেষ্টা করি গান গাইতে, কখনও-কখনও যখন ছেলে-বুড়ো সবার ভাল লাগে, তখন বুঝি, গানটা হল।"

কথাটার মানে ধরতে পেরে হেসে উঠলেন ডক্টর সোম। নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললেন, "গুড! আমাদের একটা গেস্টরুম আছে। সেখানেই থাকবেন। অ্যাদ্দিন যখন পুরুলিয়ায় ছিলেন, তখন আমাদের খাবারে নিশ্চয়ই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আপনি যদি ওদের উদ্দীপ্ত করার গান শিখিয়ে দেন, কয়েকদিনে, খুশি হব। আসুন আমার সঙ্গে।"

লুথারকে নিয়ে ডক্টর সোম তাঁর অফিস থেকে বেরিয়েই সুপ্রিয়াকে দেখতে পেলেন। সুপ্রিয়া অমলের হুইলচেয়ার ঠেলতে-ঠেলতে আসছিল গল্প করতে করতে। ডক্টর সোম ডাকলেন, "সুপ্রিয়া, এদিকে এসো। ইনি লুথার। আমেরিকার ছেলে। পুরুলিয়ায় ফাদার ডিমকের হোমে ছিলেন। সাতদিন এখানে থেকে সবাইকে গান শোনাবেন।"

একজন নিগ্রোকে দেখে সুপ্রিয়া বিস্মিত হয়েছিল। বস্তুত এই প্রথমবার সে সামনাসামনি কোনও নিগ্রোকে দেখতে পেল। কাঁপা গলায় বলল, "নমস্কার।"

মাথা ঝাঁকাল লুথার। তারপর এগিয়ে গিয়ে পা মুড়ে নিলডাউন হল অমলের পাশে। "আমার নাম লুথার। তুমি ?"

অত বিশাল একটা কালো মানুষকে তার কাছে এগিয়ে আসতে দেখে অমলের বুক টিপটিপ করছিল। সে পেছন দিকে সিঁটিয়ে বসে রইল। ডক্টর সোম বললেন, "কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে হয়, অমল। নামটা বলো।"

আর সেইসময় লুথার হাসল। তার কালো মুখে মুক্তোর ছটা ছড়াল। অমলের মুখে নামটা শুনতে পেয়ে কয়েকবার শব্দটা নাড়াচাড়া করল লুথার, "ওমোল, ওমোল।"

নিজের নামটার অমন উচ্চারণ শুনে হাসি পেয়ে গেল অমলের। কিন্তু তখন লুথার বলল, "নাউ, ওমোল, উই আর ফ্রেণ্ডস। ডক্টর, আমি যদি ওমোলের সঙ্গে বেড়াতে যাই, আপত্তি আছে আপনার ? ওমোল ক্যান ইন্ট্রোডিউস মি টু আদার্স।"

ডক্টর সোম বললেন, "নো আপত্তি।"

লুথার স্যুটকেসটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে গিটারের বাক্সটার স্ট্র্যাপ বন্দুকের মতো কাঁধে ঝুলিয়ে হুইলচেয়ার সন্তর্পণে ঠেলতে লাগল। ওরা দৃষ্টির বাইরে যাওয়া মাত্র সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কী ডক্টর ? লোকটা কে ?"

ডক্টর সোম বললেন, "ওর নাম লুথার। আমেরিকান। আন্তর্জাতিক অনাথ আশ্রমের ভলান্টিয়ার। এরকম মানুষ পৃথিবীতে আছে বলেই মানুষের নিশ্বাস এখনও স্বাভাবিক। তুমি ভেবে দ্যাখো সুপ্রিয়া, ওর পূর্বপুরুষকে ক্রীতদাস করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হয়তো একদিন আমেরিকায়। অনেক বেত পড়েছে ওর পূর্বপুরুষের পিঠে। আর আজ ও পৃথিবীর অনাথদের সেবা করে চলেছে স্বার্থহীন ভাবে দেশে-দেশে ঘুরে। ফেরার আগে লুথার আমাদের সঙ্গে ক'দিন থাকতে চায়। তুমি দেখো, ছেলেমেয়েরা যেন ওর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মেশে।"

লুথার হুইলচেয়ার ঠেলছিল। অমল সিঁটিয়ে বসে ছিল। ওর খুব ভয় করছিল। রাহুলের চেয়েও অমলের অবস্থা খারাপ। সে নিজের পায়ে উঠেও দাঁড়াতে পারে না। ওর দুটো পা'ই অকেজো হয়ে গেছে। কিন্তু হোমে আসার পর তার মনমরা ভাবটা অনেক কম। হঠাৎ লুথার দাঁড়িয়ে পড়ল। তার কানে মাউথঅর্গানের সুর এসেছে। মুখ তুলে চারপাশে দেখে লুথার জিজ্ঞেস করল, "কে বাজাচ্ছে ওমোল ?"

"রাহুল," অমল শুকনো গলায় উত্তর দিল।

"বিউটিফুল," লুথার মাথা নাড়ল, "তুমি পারো না ?"

"না। আমি ছবি আঁকতে পারি।"

"খুব ভাল। গান ?"

"না। আমি তো কখনও গান শিখিনি।"

"ঠিক আছে, আমি তোমাকে গান শিখিয়ে দেব।"

"আমার গলায় গান হবে ?"

"কেন হবে না ? যত খারাপ হোক গলা, যদি বুকের ভেতর থেকে গাইতে পারো, তা হলে সেটা গান হবেই। এখানে তোমরা যারা আছ, তাদের অসুবিধে কী ?"

অমলের ততক্ষণে মনে হয়েছে, এই মানুষটার সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। একে দেখতে পরিচিতদের মতো নয়। সাহেবদের যে চেহারা সে ছবিতে দেখেছে, তার সঙ্গেও মিল নেই। গায়ের রং এত কালো কী করে হয় ? তবু তার কথা বলতে সঙ্কোচ হল না এখন। "আমি হাঁটতে পারি না, ওমর, রুনা চোখে দেখতে পায় না। কয়েকজন আছে, যারা কানেও শুনতে পায় না, কথাও বলতে পারে না। আবার কারও শরীরটা একটুও বড় হয়নি, মানে বাড়েনি, কিন্তু বুদ্ধি খুব পরিষ্কার। আবার কেউ-কেউ স্বাভাবিক লোকের মতো বড় হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।"

খবরটা ছড়িয়ে গিয়েছিল হোমে। নইলে দিদিদের কথা উপেক্ষা করেও সবাই এক জায়গায় জড়ো হবে কেন ? দৃশ্যটা দেখে লুথার থমকে গেল। এত ছেলেমেয়ে, যাদের কারও বয়সই পনরোর উপরে নয়, প্রতিবন্ধী ! সে মাউথঅর্গান হাতে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসল, "তুমি রাহুল ?"

রাহুল হতবাক। সে দাঁড়িয়ে ছিল একটা ক্রাচে ভর করে। অবাক হয়ে রুনার দিকে তাকাল সে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, "এ কী রে ! আমার নাম জানে !"

রুনা চশমা চোখে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করে জানলে ?"

লুথার হাসল, "আমি জানি। যারা সুর বাজায়, তারা আমার বন্ধু।"

অমল বলল, "তা হলে তখন তুমি আমাকে বন্ধু বললে কেন ? আমি তো সুর বাজাতে পারি না।"

লুথার মাথা নাড়ল, "ঠিক,ঠিক। তবে সুর কি কেবল যন্ত্রে কিংবা গলায় বাজে ? সুর বাজে আকাশে, বাতাসে, ঘাসে, গাছের পাতায়, এমনকী, মানুষের হাসিতে। যে পরিষ্কার হাসতে পারে, সে কেন বন্ধু হবে না ?"

লুথার যুক্তি দিল বটে, কিন্তু অমলের মন খারাপই থেকে গেল। রাহুল একটু সাহস করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এমন বাংলা বলো কী করে ?"

"আমি তো অনেকদিন আছি পুরুলিয়ায়। তবু আমার বাংলা ভাল না।"

"তোমার পিঠে ওটা কী ?"

"এইটা ?" স্ট্র্যাপটা হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাক্স খুলল লুথার, "এটা আমার গিটার। আমি একে কখনও হাতছাড়া করি না। এ-ও সুর বাজায়, তাই আমার বন্ধু।"

রুনা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। লুথারের আকৃতি কিংবা রং সে দেখতে পাচ্ছে না। সে মনে জিজ্ঞেস করল, "তুমি গিটার বাজাতে পারো ?

"একটু একটু। তোমরা শুনবে ?"

রুনা একাই ঘাড় কাত করে টেনে হ্যাঁ বলল। চোখ বন্ধ করে গিটারের তারে আঙুল বোলাল লুথার। সঙ্গে-সঙ্গে সুর ছিটকে উঠল বাতাসে। যারা দূরে কিংবা আড়ালে ছিল, তারাই এগিয়ে এল। যারা চোখে দেখতে পায়, তাদের আতঙ্কটা বেশি ছিল। লুথারের চেহারার মানুষের সঙ্গে যেহেতু ওদের কখনওই পরিচয় ছিল না, তাই আতঙ্ক। কিন্তু যারা চোখে দেখতে পায় না, যেমন রুনা কিংবা ওমর, সুর শোনামাত্র গুটিগুটি তারা এগিয়ে এল লুথারের পাশে। সুর মনে-মনে স্থির করে নিয়ে লুথার চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় গাইল,

গুড মর্নিং হোয়েন ইট্'স মর্নিং,
গুড মর্নিং টু দি সানসাইন,
গুড ডে হোয়েন ইট্'স লাইট,
গুড লাইট হোয়েন ইট্'স নাইট ;
অ্যান্ড হোয়েন ইট'স টাইম টু গো অ্যাওয়ে,
গুড বাই—গুড বাই—গুড বাই।

যারা কথা বুঝল, তারা চমকিত হল। যারা বুঝল না, তারা সুরের নড়াচড়ায় দুলে উঠল। একই লাইন নানান সুরে গাইছে লুথার। হঠাৎ ভিন্ন বাজনা কানে আসতেই সে চোখ খুলে দেখল, রাহুল তার সুরে সুর মেলাচ্ছে মাউথঅর্গানে। সে গাইতে-গাইতে একটা হাতের মুঠোয় উৎসাহ প্রকাশ করল।

চব্বিশ ঘণ্টা কাটল না, লুথার ডক্টর সোমের হোমের ছেলেমেয়েদের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মানসিক জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন আর অন্ধদের খুব বন্ধু হয়ে গেল সে। ওর গিটারের ঠেলায় হোমের সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা বানচাল হওয়ার উপক্রম। কিন্তু ডক্টর সোম কোনও বাধা দিলেন না।

"নো বয়েজ, ইউ মাস্ট প্লে। পা নেই তো ঠিক হ্যায়, যে খেলা খেলতে পা লাগে না সেই খেলা খেলবে। নাউ টেল মি, কোন্ খেলায় পা লাগে না ?"

একজন চেঁচিয়ে উঠল, "লুডো।"

কেউ বলল, "ক্যারম আর তাস।"

"ইয়েস,ইয়েস, সবাই ঠিক বলেছে, কিন্তু যে-খেলা এখন সমস্ত পৃথিবীতে জনপ্রিয়, সেই খেলাটার নাম হল চেস, দাবা। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ? বুদ্ধিমানদের খেলা। যত খেলবে তত তোমার চিন্তা করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে।"

মানসিক জড়বুদ্ধিসম্পন্ন একজনকে দেখিয়ে রাহুল বলল, "ও তো চিন্তা করতেই পারে না। ও কী করে খেলবে ?"

"ও দৌড়বে, আর গান গাইবে। তুমি এদিকে এসো। কাম।"

যাকে ডাকল লুথার, তার মুখে কোনও ভয়ের চিহ্ন নেই। শুধু সকালবেলায় বাথরুমের পর্ব মিটে যাওয়ার পর থেকে ওর মুখে যে হাসি সেঁটে যায়, তা রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত মোছে না। বছর পনেরোর লম্বা শিশির এগিয়ে এল ইতস্তত করতে করতে। লুথার দৌড়ে তার হাত ধরে সবার সামনে নিয়ে এল। তারপর গিটারটা তুলে সুর ধরতেই শিশির মাথা নাড়ল খুশিতে। লুথার ঝুঁকে শিশিরের বুকে একটা আঙুল রেখে বলল, "তোমাকেও গাইতে হবে আমার সঙ্গে।"

সুর বন্ধ হওয়ায় কপালে ভাঁজ পড়েছিল শিশিরের। লুথার আবার বলল, "গান গাইতে হবে। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ? গা—ন।"

শিশির এবার মাথা নাড়ল।

লুথার গাইল,

দি লাভ ইন ইওর হার্ট
ওয়াজ'ন্ট পুট দেয়ার টু স্টে
লাভ ইজ'ন্ট লাভ
টিল ইটস গিভন অ্যাওয়ে।

বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় শিশির প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে গানটা গাইবার চেষ্টা করল। কিন্তু আস্তে-আস্তে যখন মাঠের মাঝখানে দাঁড়ানো বা হুইলচেয়ারে বসা বাচ্চারাই গলা মেলাল, তখন সে সরব হল। নাচের ভঙ্গিতে বাচ্চাদের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে গান গাইছিল লুথার গিটার বাজিয়ে। বাচ্চারাও জোর আনন্দ পেয়ে গেছে তখন। সুর স্থির থাকছে না, কিন্তু আবেগটা চিৎকারের পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল।

ক্রমশ মিশে গেল লুথার। রুনা যখন তার পাশে বসে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কাবুলিওয়ালার গল্প জানো ?" তখন মাথা নেড়ে 'না' বলে সে।

রুনা বলে, "তুমি মুখ দিয়ে জবাব দেবে, কেমন ?"

লজ্জিত হয় লুথার, "আই অ্যাম সরি। মুখ তো ঈশ্বর দিয়েছেন কথা বলার জন্যে। আমি যে কেন ছাই সেটার ব্যবহার করতে পারি না সবসময়!"

রাহুল জিজ্ঞেস করল, "তুমি 'আঙ্কল টম'স কেবিন' পড়েছ ?"

"হু ইজ আঙ্কল টম ?"

রাহুল আর রুনা হাততালি দিয়ে উঠল, "এ মা, তুমি কিচ্ছু জানো না! আঙ্কল টম তোমার মতো দেখতে, আর তার গল্প পড়োনি ?"

"আমার মতো দেখতে ? গল্পটা বলবে ?"

রাহুল গল্পটা শুরু করল। সবাই ঘন হয়ে বসল। গল্প শেষ হতে সবাই লুথারের চোখে জল দেখতে পেল। অমল জিজ্ঞেস করল, "তুমি কাঁদছ ? টমকাকার জন্যে কষ্ট হচ্ছে ?"

লুথার মাথা নাড়ল, "না। টমকাকার গল্প এত দূরে বসেও তোমরা এমন ভাবে করছ বলে আনন্দ হচ্ছে।"

রুনা জিজ্ঞেস করল, "আনন্দে কেউ কাঁদে নাকি ?"

"হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল বের হয় না ?" অমল জানিয়ে দিল।

লুথার হাতের পাতায় মুখ ঘষে জল সরিয়ে দিল, "ইউ মাস্ট ওভারকাম। তোমাদের মতো ভাল ছেলেমেয়েরা কখনওই সারেণ্ডার করবে না। খুব কষ্ট হবে, কিন্তু একটা দিন আসবেই, সেদিন তোমরা সুস্থ মানুষের চেয়ে কম কাজ করতে পারবে না। খুব কষ্ট করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, যাতে হাত, পা, চোখ কিংবা বুদ্ধির অভাবগুলো দূর হয়ে যায়। তোমরা কিছুতেই প্রতিবন্ধী নও।"

এই সময় সুপ্রিয়াকে দেখা যায় এগিয়ে আসতে, "মিস্টার লুথার, আপনাকে ডক্টর সোম ডাকছেন।"

"ডোণ্ট কল মি মিস্টার, আমি শুধু লুথার। ওয়েল ফ্রেণ্ডস, তোমরা কথা বলো, আমি আসছি।"

ডক্টর সোম গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। তাঁর সামনে ফাদার ডিমকের একটা চিঠি খোলা। কিন্তু চিঠির দিকে নজর ছিল না তাঁর।

হঠাৎ দরজা থেকে চিৎকার ভেসে এল, "হাই ডক্। আপনি আমাকে ডেকেছেন? একটা চমৎকার গল্প শুনছিলাম রাহুলের কাছে। জানেন, এই ছেলেমেয়েদের কেউ কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ওরা সমস্ত রকমের প্রতিবন্ধকতা দূর করবেই।"

"থ্যাঙ্কস। বোসো।" ডক্টর সোম চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

"হোয়াটস দ্য ম্যাটার?" চেয়ার টেনে নিয়ে প্রশ্ন করল লুথার।

"ফাদার ডিমক চিঠি দিয়েছেন। তিনি তোমাকে এখনই আমেরিকায় যেতে বলেছেন।"

"কেন? আমার তো এখানে কিছুদিন থাকার কথা।"

"ছিল।"

"কেন, আমি কি কোনও অসুবিধে করছি আপনার?"

"নো নো, নট অ্যাট অল্। ফাদার ডিমক লিখেছেন, তুমি মাঝে-মাঝেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়ছ। পুরুলিয়ার কোনও ডাক্তার রোগটা ধরতে পারছে না। অসুখটার চিকিৎসার জন্যে তোমার এখনই দেশে ফিরে যাওয়া উচিত।"

ঠোঁট কামড়াল লুথার, "আই অ্যাম অল রাইট। দশ-পনেরো দিনে কিছু হবে না।"

"নো, ইউ আর নট," ডাক্তার সোম উত্তেজিত হলেন।

"ওয়েল, ডু ইউ থিংক আই অ্যাম ক্যারিয়িং সাম ইনফেকশাস ডিজিজ?"

"নো। সার্টেনলি নট। আমি তোমার জন্যেই বলছি। ইউ মাস্ট গো ব্যাক টু-মরো। তোমার টিকিট পাশপোর্ট আমাকে দাও। আমার একটি পরিচিত ট্রাভ্ল এজেন্টকে দিয়ে কালকের টিকিট করিয়ে নিচ্ছি।"

সেই রাত্রে দুর্ঘটনা ঘটল। হুইলচেয়ার থেকে বিছানায় নিজে-নিজে উঠতে গিয়েছিল অমল। সেই সময় ব্যালেন্স হারিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। মাথার পাশে এমন আঘাত লাগে যে, সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সঙ্গে-সঙ্গে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যে সিস্টার ওদের ডিউটিতে ছিলেন, তিনি জানান, অমল কিছুতেই তার কথামতো একটু অপেক্ষা করেনি। অন্য একটি ছেলেকে তিনি যখন সাহায্য করছিলেন, তখন অমল উৎসাহটা দেখায়। পড়ে যাচ্ছে দেখে ছুটে এসেও তিনি কিছু করতে পারেননি। অমলের বাবা-মা থাকেন শহরের এক প্রান্তে। খবর পেয়ে তাঁরাও ছুটে এসেছেন। ডক্টর সোম বিব্রত এবং চিন্তিত হয়ে পায়চারি করছেন বাইরে। সুপ্রিয়াকে হোমের দায়িত্বে রেখে তিনি এসেছেন। এরকম ঘটনার পেছনে যা-ই কারণ না থাক না কেন, এটা তার হোমের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা হিসেবেই প্রচারিত হবে। এবং তিনি দায়িত্ব অস্বীকার করছেনও না। অমলকে যারা পরীক্ষা করছিলেন, তাঁদের একজন সিনিয়ার ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই বলে মনে হচ্ছে। কানের ওপরে স্কালে সামান্য চোট লেগেছে। এক্স-রে রিপোর্ট তা-ই বলছে। রাতটা দেখব। দরকার হলে সকালে অপারেশন করতে হবে।"

অমলের বাবা বললেন, "ও আমার একমাত্র সন্তান। যেমন করেই হোক..."

হসপিটালের ডাক্তার বললেন, "চিন্তা করবেন না। শুধু দু'বোতল রক্ত তৈরি রাখুন। ওর ব্লাড গ্রুপ একটু বাদেই বলে দিচ্ছি।"

অমলের বাবা মাথা নাড়লেন, "ওর আর আমার একই ব্লাড গ্রুপ। কিছুদিন আগে আমরা করিয়েছিলাম।"

ডাক্তার হাসলেন, "নট দ্যাট। আমাদের স্টক থেকে আমরা রক্ত দেব। শুধু আপনারা যে-কোনও গ্রুপের ব্লাড দিয়ে ওটাকে রিপ্লেস করে দেবেন।"

দূরে দাঁড়িয়ে শরীর কুঁকড়ে শুনছিল লুথার। এবার এগিয়ে এসে বলল, "ডক্টর, আমি রক্ত দিচ্ছি, এখনই নিয়ে নিন। আমি কাল চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমার রক্ত এখানে থাক।"

ডক্টর সোম দ্রুত মাথা নাড়লেন, "নো। তা হয় না।"

"কেন হয় না? ওই ছেলেমেয়েদের জন্যে আমি রক্ত দিতে পারি না?"

"পারো না। তুমি পারো না," ডক্টর সোম মাথা নাড়লেন।

"কিন্তু কেন? আমার অপরাধ কী?"

"জাস্ট ডোন্ট আস্ক মি। আমি বলতে পারব না।"

হোমে ফিরে এসে ঘুমোতে পারছিলেন না ডক্টর সোম। তাঁর হোমের কোনও ছেলের এমন দুর্ঘটনা কখনও ঘটেনি। কাল সকালে যদি অমল সুস্থ না হয়? তিনি জানলা দিয়ে অন্ধকারের আকাশ দেখছিলেন। এবং তখনই নজর গেল নিজের অফিসের দিকে। শোবার ঘর থেকে যে জানলাটা দেখা যায়, সেখানে আলো পড়েছে। অথচ তিনি ঘরের আলো নিভিয়ে এসেছিলেন। ডক্টর সোম নিঃশব্দে নেমে এলেন।

তাঁর অফিসঘরের দরজাটা ভেজানো। ধীরে-ধীরে চাপ দিতেই খুলে গেল। তিনি দেখলেন, একটা ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে লুথার। ফাইলটাতেই তিনি ফাদার ডিমকের চিঠি রেখেছেন। চিঠিটা খুঁজে পেয়ে দ্রুত পড়ে ফেলছিল লুথার। তারপর চিৎকার করে উঠল, "ও মাই গড!" ধপ করে বসে পড়ল সে চেয়ারে। বসে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। ডক্টর সোম একটু ইতস্তত করে দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে চললেন শোওয়ার ঘরের দিকে।

বিকেলে চলে যাবে লুথার। একটু আগে খবর এসেছে, অমলের বিপদ কেটে গেছে। সে ভাল হয়ে উঠবে কিছুদিনের মধ্যেই। হোমের সমস্ত ছেলেমেয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল। ডক্টর সোম লুথারকে তার ঘর থেকে নিয়ে এলেন। লুথারের এক হাতে স্যুটকেস, অন্য হাতে গিটারের বাক্স। সুপ্রিয়া ছেলেমেয়েদের বোঝাচ্ছিল কী করতে হবে। এদের দেখে কথা বন্ধ করল। হঠাৎ লুথার ডক্টর সোমকে বলল, "থ্যাঙ্কস, ডক্টর। কাল আমাকে রক্ত দিতে নিষেধ করে ভাল করেছেন। এই রক্ত কোনও সুস্থ মানুষকে দেওয়া যায় না।"

ডক্টর সোম বললেন, "আমেরিকায় এখন তো এর ট্রিটমেন্ট..."

"ইউজলেস," বাধা দিল লুথার, "লিউকোমিয়া যখন প্রমাণিত, তখন আমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে। ফাদার ডিমকের চিঠি কাল রাত্রে দেখেছি আমি, আপনাকে না-জানিয়ে। আমার ব্লাড রিপোর্টের কথা ফাদার আমাকে জানাননি। কিন্তু জেনে গেলাম। মাই ডেজ আর লিমিটেড। বাট নট দেয়ার্স। হেল্প দেম।"

লুথার যখন ওদের সামনে এল, তখন সবক'টি গলা মাউথঅর্গানের সুরে সুরে মিলিয়ে গেয়ে উঠল, "গুড মর্নিং হোয়েন ইট'স মর্নিং, গুড নাইট হোয়েন ইট'স নাইট, অ্যাণ্ড হোয়েন ইট'স টাইম টু গো অ্যাওয়ে, গুডবাই-গুডবাই-গুডবাই।"

হঠাৎ লুথার চিৎকার করে কেঁদে উঠতেই সবাই থেমে গেল। ওরা অবাক হয়ে দেখল, পিঠ থেকে গিটারের বাক্সটা খুলে নিয়ে লুথার রাহুলের হাতে ধরিয়ে দিল, "ইট'স মিউজিক, আমার অনুরোধ, নেভার সে গুডবাই টু ইট, ও কে?"

তারপর ধীরে-ধীরে গেটের বাইরে অপেক্ষারত ট্যাক্সির দিকে পা বাড়াল লুথার।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী



পরীক্ষার সময় রাতজেগে পড়াশোনার সময়

এখনই তো শরীরকে
রাখতে হবে
সম্পূর্ণ সুস্থ...
এখনই তো চাই
কমপ্লান®

একমাত্র কমপ্লানেই আছে একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩ টি খাদ্যগুণ, বাড়তি পুষ্টির জন্য ওর যা এখন দরকার।

সাধারণত : ১৫-১৬ বছর বয়সের মধ্যে ছেলেমেয়েরা সবদিকথেকে পুরোপুরিভাবে বেড়ে ওঠে, তাই তাদের পুষ্টিপ্রয়োজনও হয় বিশেষ ধরণের। আর যখন পরীক্ষার চাপ থাকে তখন তো কথাই নেই। সেইজন্য মায়েরা জানেন যে পরীক্ষার সময় মানেই **কমপ্লানের** সময়।

বাচ্চাদের শরীর গড়ে তুলতে যে-পুষ্টি সরাসরিভাবে সাহায্য করে সেটা হল প্রোটিন। **কমপ্লানে** প্রোটিন তো আছেই (২০%), আছে মিল্কপ্রোটিন, যা বাচ্চাদের জন্য সেরা। তাছাড়া আছে বাইশটি অন্যান্য খাদ্যগুণ, যেমন কার্বোহাইড্রেট, খনিজ ও স্নেহ পদার্থ এবং নানান ভিটামিন। বাড়ন্তবয়সের ছেলেমেয়েদের এগুলি বিশেষ দরকার।

আপনার ছেলেমেয়েদেরও দিনে দুবার করে **কমপ্লান** খাওয়ান।

কমপ্লান-পাবেন বাচ্চাদের মনের মত চকোলেট, স্ট্রবেরি, আইসক্রীম ও এলাচ-জাফরান স্বাদে। প্লেন-ও পাবেন।



কমপ্লান®–সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GX/22/244 BEN

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

অ দ্ভু তু ড়ে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

***আগে যা ঘটেছে** : নন্দবাবুর ভাইপো মানিক পুরনো মোটর-সাইকেল কিনেছে, তার সঙ্গে একটা হেলমেট। নন্দবাবুর একটা ভৌত ক্লাব আছে, সেখানে ভূত-প্রেত নিয়ে গবেষণা চলে। একদিন সন্ধেবেলা পুরনো স্যুট-বুট এবং ওই হেলমেট পরে ভৌত ক্লাবে হাজির হলেন। ভূতের উদয় হয়েছে মনে করে সে এক হুলুস্থুলু কাণ্ড। একে-একে সবাই চলে যাওয়ার পরে, নন্দবাবু ক্লাবের পেছনের ভাঙা ঘরে কারও পায়ের শব্দ শুনে হেলমেট ফেলে রেখে নিজের বাড়ির দিকে ছুটলেন। ভুবন রায়ের বয়স পঁচাশি। তিনি বাড়ির ল্যাবরেটরিতে ভূত দেখার যন্ত্র তৈরি করে ছেলে রামলালকে কিছু একটা তৈরি করতে বললেন। এও বললেন, দুলাল সেনকে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসেবে নিয়েছেন। সব শুনে রামলাল ঠাকুমা হরমোহিনীর কাছে গেলেন। তারপর···*

সবাই জানে, ভুতোর মাথায় যখন পরি ভর করে তখন একটা কিছু হবেই।

ভুতো এ-বাড়ির ছেলে নয়। এমনকী আত্মীয় পর্যন্ত নয়। তবু ভুতো এ-বাড়ির একজন হয়ে গেছে। আগে তাকে দিয়ে বাড়িতে চাকর-বাকরের কাজ করানো হত। তারপর তার খোলতাই মাথা আর নানা বাহাদুরি দেখে তাকে ইস্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে সেও পড়ে। বলতে গেলে সে-ই হল সর্দার-পোড়ো।



তবে মুশকিল হল মাঝে-মাঝে তার মাথায় পরি ভর করে। কিন্তু পরি ভর করাটা কী ?

তা ভুতো জানে না। তবে ভুতোর ভাষায়, "সেই যে-বার দেশে খুব আকাল হল, তখন আমার বাবা একদিন আমাকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সংসারে শুধু আমি আর বাবা-ই তো ছিলাম। মা কোন্‌কালে মরে গিয়েছে। তা বাবার কাঁধে করে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। চারদিকে পোড়া মাঠ, ঘাস নেই, পাতা নেই, গাঁ-গঞ্জ সব খরায় জ্বলে পুড়ে খাক। নদী, নালা, পুকুর, কুয়ো, টিপকল সব শুকনো। তেষ্টায় বাপ-ব্যাটার গলা কাঠ। তা সন্ধেবেলা আমরা একটা ভুতুড়ে বাড়িতে পৌঁছে গেলুম। বাবা বলল, 'এখানেই বাপ-ব্যাটায় রাত কাটাব।' বাবা গামছা পেতে আমাকে শুইয়ে দিয়ে বলল, 'তুই একটু জিরো, আমি চিঁড়ে-মুড়ি কিছু একটু জোগাড় করে আনছি।' তা বাবা গেল, আর আমিও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ধকল তো বড় কম যায়নি। তারপর হল কি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি কি, কোথায় সেই ভাঙা পুরনো বাড়ি, আর কোথায় বা বাবা। আমি দেখলুম, দিব্যি একটা ঘরের মধ্যে নরম বিছানায় আমি শুয়ে আছি। চারদিকে সব আমার বয়সী ছেলেমেয়ে। তবে সকলের পিঠেই একজোড়া করে ফিনফিনে পাখনা লাগানো। তারা বেশ উড়ছে, হাঁটছে, বসছে। কী সুন্দর সব চেহারা। আমি চোখ মেলতেই সবাই এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। আমি তো ভয় খেয়ে কেঁদে-কেটে একশা। তারা আমার চোখের জল মুছিয়ে দিল, অনেক খাবার দিল, শরবত দিল, খেলনা দিল। আমি যতবার বাবার কাছে যাওয়ার বায়না করি ততবারই তারা কেবল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, আর তাদের মুখগুলো ভারী করুণ হয়ে যায়। তারা তাড়াতাড়ি আমাকে আরও খেলনা দিল, মজার-মজার সব গল্প বলল, গান গাইল, নাচল। আমি বাবার দুঃখ ভুলেই গেলুম। তাদের ভারী সুন্দর বাগান ছিল। সেখানে বারোমাস রামধনু ফুটে থাকে আকাশে। সেখানে কখনও অন্ধকার হয় না। কারও কখনও অসুখ করে না, কেউ কখনও মরে না। সে ভারী মজার জায়গা।

"তারপর কী হল ?

"একদিন একটা কালোমতো রাগি পরি এসে বলল, 'এসব কী হচ্ছে ? পৃথিবীর একটা ছেলেকে তোমরা কেন রেখেছ ? যাও, ওকে রেখে এসো।' ব্যস, সেইদিন পরিরা আমার চোখে পালক বুলিয়ে ঘুম পাড়াল। ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি, একটা গাছতলায় শুয়ে আছি। সেখান থেকেই তো রামলাল-জ্যাঠামশাই আমাকে নিয়ে এলেন এ-বাড়িতে। কিন্তু আমার মনে হয়, পরিরা এখনও আমাকে ভালবাসে। মাঝে-মাঝে আমি হঠাৎ শুনতে পাই, কারা যেন চুপিচুপি আড়াল থেকে আমাকে ডাকে, 'ভুতো ! এই ভুতো ! তোমার কি খিদে পেয়েছে ? তোমার কি অসুখ করেছে ?' আমিও তখন তাদের কথার জবাব দিই। মাঝে-মাঝে ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার বালিশের পাশে একটা খেলনা পড়ে আছে হয়তো। কখনও হয়তো একবাক্স সন্দেশ। অসুখ করলে কে যেন আমাকে এসে হাওয়া করে, মাথায় জলপট্টি দেয়।"

ভুতোর পরির গল্প সবাই জানে। কিন্তু সবাই বিশ্বাস করে না।

ভুতোকে মোটেই পছন্দ করে না ছোট দাদু। ছোট দাদু হলেন

ভুবন রায়ের সেজো ভাই ত্রিভুবন রায়। তিনি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, অনেক মরা মানুষ বাঁচিয়েছেন বলে শোনা যায়।

সেবার ফটিকবাবুর মায়ের সন্ন্যাস-রোগ হল। ত্রিভুবনবাবু গিয়ে নাড়ী ধরে বললেন, "রাত কাটবে না। চারটে বেজে তেরো মিনিট উনিশ সেকেন্ডে মারা যাবেন।"

ভুতো কাছেই ছিল। ফশ করে বলে বসল, "মরলেই হল? অ্যাকেসিস ওয়ান এম দাও না। বুড়ি একশো বছর বাঁচবে।"

ত্রিভুবন ভুতোকে ছাতাপেটা করতে উঠেছিলেন।

কিন্তু ফটিকবাবু ভুতোর পরির গল্প বিশ্বাস করতেন। তিনি অ্যাকেসিস ওয়ান এম এনে খাওয়ালেন। আর ফটিকবাবুর মা সকালবেলায় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে চান-টান করে ঠাকুরপুজোয় বসে গেলেন। কে বলবে যে, তাঁর শক্ত অসুখ হয়েছিল।

এই ঘটনায় ত্রিভুবনবাবুর কিছু অখ্যাতি হল।

এরপর নরেনবাবুর বাবার হল কলেরা। ত্রিভুবন ডাক পেয়ে দেখতে গেছেন, সঙ্গে ওষুধের বাক্স নিয়ে ভুতো। ত্রিভুবন যে ওষুধটা দিয়ে গেলেন সেটা দেখে ভুতো চোখ কপালে তুলে বলল, "ও কী দিচ্ছ? ও খেলেই রুগির চোখ উলটে যাবে।"

ভুতোকে পেল্লায় একটা ধমক দিয়ে ত্রিভুবন সেই ওষুধই দিলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে নরেনবাবুর বাবা চোখ উলটে গোঁ-গোঁ করতে লাগলেন। যায়-যায় অবস্থা।

ভুতো তাড়াতাড়ি বাক্স থেকে আর-একটা শিশি বের করে দু'ফোঁটা খাইয়ে দিল। আর রুগি ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল। পরদিন থেকে একেবারে চাঙ্গা।

সেই থেকে ভুতোর ওপর ত্রিভুবন হাড়ে-হাড়ে চটা।

শুধু ত্রিভুবনই নন, ভুতোর ওপর চটা আরও অনেকেই, কিন্তু সে-কথা পরে হবে।

এ-বাড়ির ছেলেপুলেরা ভুতোকে পেয়ে দারুণ খুশি। ভুতো চমৎকার ঘুড়ি-লাটাই বানাতে পারে, পাখির খাঁচা বানাতে পারে, গাছের মগডালে উঠে ফলপাকুড় পাড়তে পারে। চমৎকার গল্প বলতে পারে, বাঁশি বাজাতে পারে, আরও অনেক কিছু পারে। কিন্তু তার যেটা সবচেয়ে বড় গুণ তা হল, পরিদের সঙ্গে তার যোগাযোগ।

মাঝে-মাঝে যখন তার মাথায় পরি ভর করে, তখন সে অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলে। তার চাউনিটা অন্যরকম হয়ে যায়। চেহারাটাও যেন পালটে যায় তখন।

রায়বাড়ির একতলায় কোণের দিকে পড়ার ঘর। সন্ধেবেলা সেখানে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে পড়তে বসে। অনাদি-মাস্টার পড়াতে আসেন। দুর্দান্ত রাগি আর রাশভারী অনাদিবাবুকে শুধু ছাত্ররাই নয়, ছাত্রদের বাবারাও ভয় পান।

আজ অনাদিবাবু কোথায় শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেতে গেছেন। সুতরাং আজ ছুটি। পড়ার ঘরে বসে মণ্টু, গদাই, লালু, হৈমন্তী, কাজু, টিকলি, নিমাই, সব কিছুক্ষণ গলা ছেড়ে পড়ার পরই ভুতোকে চেপে ধরল, "ভুতোদা, একটা গল্প বলো।"

ভুতো বই-খাতা সরিয়ে রেখে একগাল হেসে বলল, "গল্প শুনবে? কিন্তু দাঁড়াও, আমার মাথার মধ্যে কেমন একটা রিমঝিম হচ্ছে।"

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, "পরি! পরি!"

ভুতো হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে ইঙ্গিত করল, তারপর চোখ বুজে বসে রইল।

হঠাৎ দেখা গেল ভুতোর মুখটা কেমন যেন স্বপ্ন-স্বপ্ন হয়ে যেতে লাগল। এমনিতে ভুতো দেখতে কালো আর রোগা! মুখখানা শুকনো আর লম্বামতো। কিন্তু এখন তার মুখ দিয়ে যেন একটা



আলোর আভা বেরোতে লাগল।

সে বিড়বিড় করে বলল, "দাদামশাই ভূতের যন্তরটা তৈরি করে ভাল কাজ করেননি। অনেক ভোগাবে।"

লালু বলে উঠল, "ভূতের যন্ত্র? আরে, সেটা তো আমি নিজে চোখ রেখে দেখেছি, কিছু দেখা যায় না।"

ভুতো মাথা নেড়ে বলল, "এখনও দেখা যায় না বটে, কিন্তু একদিন দেখা যাবে, তখন বিপদ হবে। আর দুলাল সেনকে নিয়েও বিপদ হবে।"

লালু ফের বলল, "কিন্তু দুলাল সেন-স্যার তো ভাল লোক।"

ভুতো মাথা নেড়ে বলল, "ভাল বলেই তো বিপদ।"

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

গদাই বলল, "কিন্তু দুলাল সেন-স্যার তো সেই কামারপাড়ায় থাকেন। তাঁকে নিয়ে আমাদের বিপদ কিসের?"

ভুতো ফের মাথা নেড়ে বলল, "মোটেই কামারপাড়ায় থাকেন না। তিনি দাদামশাইয়ের ল্যাবরেটরিতে থানা গেড়েছেন।"

ল্যাবরেটরিটা বাচ্চাদের কাছে একটা দারুণ কৌতূহলের জায়গা।



যেখানে নানারকম মজার কাণ্ডকারখানা হয় বলে তারা শুনেছে। কিন্তু তালা দেওয়া থাকে বলে তারা ঢুকতে পারে না। ভুবন রায়ের কঠিন নিষেধাজ্ঞা আছে, বাচ্চারা যেন খবর্দার কেউ ওখানে না ঢোকে। সেখানে দুলাল সেন আছে শুনে বাচ্চারা ফের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

হঠাৎ লালু লাফিয়ে উঠে বলল, "চল তো দেখে আসি। দুলাল-স্যার ভীষণ ভালমানুষ। আমরা বললেই ঢুকতে দেবেন।"

এ-কথায় সবাই হইহই করে উঠে পড়ল।

ধ্যান ভেঙে গেলে ভুতোও বাচ্চাদের মতোই হয়ে যায়। তখন আর সে অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা ভাবেও না, বলেও না। বাচ্চাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে ভুতো চোখ চাইল। তার ধ্যানটা কেটে গেছে।

"ভুতোদা, তুমিও চলো।"

"চলো।"

টিকলি সাবধান করে দিয়ে বলল, "কিন্তু পা টিপেটিপে, দাদু টের পেলে আস্ত রাখবে না।"

সামনে ভুতো, পিছনে সারবন্দী ছেলেমেয়েরা খুব সাবধানে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার বাগানে নেমে পড়ল। সামনে ঝোপঝাড়, ঘাসজমি, খানাখন্দ। ল্যাবরেটরিটা বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা তফাতে।

ল্যাবরেটরির কাছে এসে ভুতো বলল, "দাঁড়াও, আগে জানলা দিয়ে ভিতরে কী হচ্ছে দেখে নিই।"

বাচ্চারা ছড়িয়ে পড়ে এক-একটা জানলা দিয়ে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল।

কাজু টিকলিকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, "ওই দ্যাখ, দুলাল-স্যার বেলুন ফোলাচ্ছেন।"

"বেলুন?" বলে টিকলি বড়-বড় চোখে চেয়ে দেখল।

বাস্তবিকই দেখা গেল, দুলাল সেন নিবিষ্ট মনে একটা সিলিন্ডারের মুখে একটার-পর-একটা বেলুন লাগিয়ে ফুলিয়ে তুলছেন। তারপর সেগুলোর মুখে সুতো বেঁধে ছেড়ে দিচ্ছেন। বেলুনগুলো গিয়ে সিলিং-এ ঠেকে জমা হচ্ছে। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

ভুতুড়ে কম্পিউটর

প্রদীপচন্দ্র বসু

দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল রুমা। প্রায় সাড়ে-চারটে বাজে। শীতের বিকেল দেখতে-দেখতে ফুরিয়ে এল। উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাস আলপিন ফোটাচ্ছে সারা শরীরে। আর-একটু পরেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঢেকে দেবে চারদিক। অথচ ভাই এখনও ফিরল না।

অন্যদিন এরকম দেরি করলে ভাইয়ের জন্য চিন্তা করত না রুমা। স্কুল থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে রোজই খেলতে যায় ভাই। সন্ধের মুখে-মুখে ফেরে। খেলায় ওর দারুণ নেশা। কিন্তু আজ ভাইয়ের অঙ্ক পরীক্ষা ছিল। অঙ্কটা ও একেবারেই পারে না। ভাগ্যিস এবার ভাইদের স্কুলের ক্লাস সিক্সের বার্ষিক্ব পরীক্ষার রুটিনে শেষদিন অঙ্কটা রেখেছিল। তাই রক্ষে। আগে হলে, মনখারাপের চোটে ভাইয়ের পরের পরীক্ষাগুলোও খারাপ হয়ে যেত।

শনিবার ইতিহাস পরীক্ষা হয়ে যাবার পর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত রুমা ভাইকে অঙ্ক শিখিয়েছে। মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা দেবার পর ওর নিজের এখন পড়ার চাপ নেই সেরকম। টেস্টের রেজাল্ট বার হলে আবার পড়াশুনো শুরু করবে। সেজন্য ভাইকে পরীক্ষার প্রস্তুতির সাহায্য করেছে যতটা পারে। অন্যান্য সব বিষয়ে ভাইকে পরীক্ষার জন্য ও ভালই তৈরি করে দিয়েছিল। শুধু অঙ্কটাই পারেনি। কেন যে ভাই অঙ্কের সূত্রগুলো বোঝে না, কে জানে?

এদিকে বাড়িতে আজ ছোটকাকা এসেছেন লণ্ডন থেকে। অবশ্য ছোটকাকার আসার কথা আগে থেকেই সবার জানা ছিল আসার আগে ছোটকাকা ট্রাঙ্ককলে জানিয়েছিলেন, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে দিল্লি এসে তারপর ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের প্লেনে কলকাতা আসবেন। দিল্লি থেকে প্লেন দেরিতে আসায় ছোটকাকার বাড়ি পৌঁছতে দেরি হয়ে গেছে। ভাই দেখে যেতে পারেনি। একটায় ওর পরীক্ষা শুরু।

আসার অনেকদিন আগেই রুমাকে চিঠিতে ছোটকাকা লিখেছিলেন, 'এবার তোকে আর শুভকে চমকে দেবার মতো একটা জিনিস নিয়ে যাব।' কিন্তু জিনিসটা কী তা লেখেননি। আজ সকাল থেকেই সেজন্য শুভ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল কখন ছোটকাকা এসে পৌঁছবেন আর চমকে দেবার মতো জিনিসটাও দেখবে। প্লেন দেরি করায় ভাই তা আর দেখে যেতে পারেনি।

বছর দুয়েক বাদে-বাদে ছোটকাকা যখনই বিদেশ থেকে আসেন, প্রচুর বিদেশী জিনিস কিনে আনেন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের উপহার দিতে হয়। ছোটকাকার এটা অভ্যাস। তবে সবার উপহারের মধ্যে রুমা ও শুভর জিনিসগুলোই হয় বেশি দামের। ছোটকাকার কথায়, স্পেশাল গিফ্‌ট। যেমন এর আগেরবার এনেছিলেন দু'জনের জন্য দুটো রুলার যার মধ্যে ইলেকট্রনিক ঘড়ি ও ক্যালকুলেটার বসানো। তবে দুঃখের বিষয়, মা ওই রুলার দুটো ওদের ব্যবহার করতে দেন না। মা'র ধারণা, এখন থেকেই ক্যালকুলেটার ব্যবহার করলে ওরা আর জীবনের অঙ্ক শিখবে না।

এবারও ছোটকাকা অনেক কিছু এনেছেন। সিন্থেটিক শাড়ি, পারফিউম, সিগারেট, লেটেস্ট রক-মিউজিকের রেকর্ড, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, আরও কত কী! তবে সব কিছুকে ম্লান করে দিয়েছে মাইক্রো হোম কমপিউটরটা। কমপিউটরটা দেখে সত্যিই রুমা চমকে গেছে। বাবা-মা'ও যে বেশ অবাক হয়েছেন, মুখ দেখেই বোঝা গেল। এর আগে রুমা বা শুভ কেউ জলজ্যান্ত কমপিউটর দেখেনি। বই আর টিভিতে দেখেছে কমপিউটরের ছবি। রুমার ধারণা শুভও নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে জিনিসটা দেখে চমকে যাবে। হইহই করে উঠবে। এমনিতেই ছোটকাকা প্রতিবার বিদেশ থেকে এলে বাড়িতে ওদের আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। শুভকে তখন পায় কে? অথচ সেই ছোটকাকা আজ বাড়ি আসবেন জেনেও ও কেন ফিরছে না? পরীক্ষা তো চারটেতেই শেষ হয়ে যাবার কথা।

বাড়িতে এখন বাবা, মা, ছোটকাকা কেউ নেই। রুমার সেজন্য



আরও চিন্তা হচ্ছিল। খানিক আগে তিনজনেই বেরিয়ে গেছেন বরানগরের পিসির বাড়িতে যাবেন বলে। ছোটকাকা এবার মাত্র সাতদিনের ছুটিতে এসেছেন। তাড়াতাড়ি সব দেখা-সাক্ষাৎ সারতে হবে ওঁর। বলে গেছেন, আটটা-নাগাদ ফিরে আসবেন। বাড়িতে এখন শুধু রুমা আর ওদের সারাদিনের কাজের লোক মধুবালামাসি। ভাইয়ের পরীক্ষা নিয়ে বাবা-মা বিশেষ চিন্তা করেন না। জানেন, অঙ্ক বাদে আর সব পরীক্ষাতেই ও ভাল নম্বরই পাবে। আর, অঙ্কের ব্যাপারটা এইট-নাইনে উঠলে প্রাইভেট টিউটর রেখে ঠিক করে নেওয়া যাবে। ভাইকে নিয়ে বাবা-মা'র চিন্তা যাই থাকুক না কেন, রুমার এখন চিন্তা, ভাই কেন ফিরছে না।

দুপুরে খাবার পরে ছোটকাকা কমপিউটরের অনেক ব্যাপার-স্যাপার রুমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন কমপিউটর আসলে একটা যন্ত্র। ১৮৩৩-এ চার্লস ব্যারেজ প্রথম কমপিউটর তৈরি করেন। কমপিউটর মানুষের মতো অনেক কাজ করলেও, এর মগজ মানুষের মতো নয়। কোনও এক বিজ্ঞানীর নাম করে ছোটকাকা বলেন, 'মানুষের হচ্ছে মিট ব্রেন আর কমপিউটরের মেকানিকাল ব্রেন। ফলে কমপিউটরের দুঃখ বা আনন্দের অনুভূতি নেই। যদিও



মানুষের চেয়ে নির্ভুল অঙ্ক কষতে পারে, ছবি আঁকে, মেশিন চালায়, গান গায় বা কথা বলে, তবু এই যন্ত্র কখনও মানুষ হতে পারবে না। মানুষের নির্দেশ নিয়েই কমপিউটারকে কাজ করতে হয়।' এই নির্দেশ দেওয়াকে ছোটকাকা বলেছিলেন, প্রোগ্রাম করা। কমপিউটারে যেভাবে প্রোগ্রাম করা থাকবে, সেভাবেই কাজ হবে। একচুলও এদিক-ওদিক হবে না। যে-সব তথ্য বা নির্দেশ একবার কমপিউটারের মগজে ভরে দেওয়া হবে তা এটি কখনও ভুলবে না।

তবে রুমার সবচেয়ে অবাক লেগেছে কমপিউটারের অঙ্ক করার ব্যাপারটা জেনে। শূন্য আর এক, কমপিউটার নাকি মাত্র এই দুটো সংখ্যা ব্যবহার করেই সব অঙ্ক করে! অক্ষর লেখার কাজেও নাকি এই সংখ্যা দুটিই কাজ করে। আর, অনেক অঙ্ক নাকি কোনও-কোনও কমপিউটার এক সেকেণ্ডের দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে করে ফেলতে পারে, যাকে বলে ন্যানো সেকেণ্ড। ভাই আসতে এত দেরি করছে দেখে সেই মুহূর্তে রুমার কাছে এক-এক ন্যানো সেকেণ্ড এক-এক ঘণ্টার মতো লাগছিল।

কমপিউটার নিয়ে আপন মনে ভাবতে ভাবতে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে খেয়াল করেনি রুমা। ওদের আটতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে সুপারমার্কেটের দোকানগুলির আলোয় ঝলমলে হয়ে উঠেছে চারদিক। রাস্তায় কর্পোরেশনের হ্যালোজেন বাতিগুলিও জ্বলে গেছে। আগের থেকে মানুষের ভিড়ও বেড়েছে রাস্তায়। সারাদিনের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে লোকজন। দূরের দিকে তাকিয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ শুভকে দেখতে পেল রুমা। মাথা নিচু করে আস্তে-আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে আসছে।

ভাইকে দেখতে পেয়ে বুকে বল ফিরে এল রুমার। আরও দেরি করলে কী যে করত রুমা তা ও নিজেই জানে না। কোথায় খুঁজতে যেত ভাইকে? হয়তো পিসির বাড়িতে ফোন করে বাবা-মা'কে খবর দিতে হত!

ভাই আসছে।

রান্নাঘরে মধুবালামাসি কাজ করছিল। ওর উদ্দেশে কথাটা বলেই রুমা ফ্ল্যাটের সদর দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত একতলায় নেমে গেটের দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। শুভ ততক্ষণে একতলার গেটের কাছে এসে গেছে।

যে ভাইয়ের জন্য এতক্ষণ ধরে চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিল রুমা, মুখোমুখি তাকে দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হবার বদলে কীরকম বিস্মিত হয়ে গেল ও।

এ কী চেহারা হয়েছে ভাইয়ের? চুল উশকোখুশকো। তার মধ্যে ঘাসের ডগা, শিকড় লেগে আছে। মুখটা কালো। গর্তে ঢুকে গেছে চোখ দুটো। পেনের কালিতে সোয়েটারের বুকের বাঁ-পাশটা ভেজা। হাফপ্যান্টটা ধুলো মাখা। হাঁটুর নীচে থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ধুলোয় সাদা। এক পায়ের চটির বুড়ো আঙুলের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে।

ভাইয়ের চেহারা দেখে রুমা ওর পরীক্ষা কেমন হয়েছে তা না জানতে চেয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কোথাও মারামারি করে এলি নাকি?"

রুমার মুখের দিকে তাকিয়ে শুভ নিচু গলায় উত্তর দিল, "না।"

"তা হলে?"

"ওপরে চল বলছি।"

আর কথা না বাড়িয়ে দিদিকে পাশ কাটিয়ে গটগট করে ওপরে উঠে এল শুভ। ভাইয়ের পেছন পেছন রুমাও।

হাত-মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে বসার পরে জলখাবার দিয়ে গেল মধুবালামাসি। খেতে শুরু করার আগে রুমা বলল, "এবার বল, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? তোর এরকম চেহারাই বা হল কী করে?"

খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল শুভর। স্বাভাবিক। সেই দুপুর বারোটা-নাগাদ ভাত খেয়ে পরীক্ষা দিতে গেছে। আলুর দম দিয়ে গোটা-চারেক লুচি না খাওয়া পর্যন্ত ও দিদির প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না।

রুমা অবশ্য বুঝতে পারছিল ভাইয়ের খুব খিদে পেয়েছে। সেজন্য ভাইকে উত্তরের জন্য তাগাদা না দিয়ে চুপচাপ বসে ভাইয়ের গোগ্রাসে খাওয়া দেখছিল।

লুচি আর আলুর দম শেষ করে এক গ্লাস জল খেয়ে তারপর শুভ রুমার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, "পরীক্ষা দিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে শুয়ে ছিলাম।"

ভাইয়ের উত্তর শুনে, কেন খেলার মাঠে গিয়ে শুয়ে ছিল, তা আর জিজ্ঞেস করল না রুমা। বুঝতে পারল, এবারেও অঙ্ক পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি শুভ। পারলে, খেলার মাঠে শুয়ে থাকার বদলে নিজেই খেলতে নেমে যেত। তবু জিজ্ঞেস করল, "পরীক্ষা কীরকম হয়েছে তোর?"

দিদির এ-প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না শুভ। একটু থেমে ও পালটা প্রশ্ন করল, "ছোটকাকা এসেছেন?"

রুমা বলল, "হ্যাঁ।"

"কাউকে দেখছি না বাড়িতে। সবাই কোথায়?"

"পিসির সঙ্গে দেখা করতে গেছে।"

"ফিরবে কখন?"

"বলেছে তো আটটা নাগাদ!" আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল রুমা।

রুমার কথা শেষ হবার আগেই শুভ দেওয়ালে টাঙানো ইলেকট্রনিক ঘড়িটার দিকে তাকাল। ছ'টা দশ বাজে।

পরীক্ষা কেমন দিয়েছে না বলায় রুমা আবার শুভকে জিজ্ঞেস করল, "পরীক্ষা কেমন দিয়েছিস বললি না তো!"

"বলছি দাঁড়া।" কিন্তু শুভ এবারও পরীক্ষার কথা বলল না। কয়েক সেকেণ্ড কী যেন ভাবল। তারপর রুমাকে জিজ্ঞেস করল, "দিদি, তুই প্ল্যানচেট করতে পারিস?"

ছোটবেলায় শুভর খুব ভূতের ভয় ছিল। এখনও যে পায় না তা নয়। দু' ভাই-বোন একঘরে পাশাপাশি আলাদা খাটে শোয়। ঘরে নাইট ল্যাম্প জ্বলে। তবু মাঝরাত্রে বাথরুম যেতে হলে রুমাকে আগে ডেকে তোলে শুভ। সেই শুভ আজ হঠাৎ প্ল্যানচেট করার কথা বলছে। রুমার খুব কৌতূহল হল। ব্যাপারটা কী?

ভাইয়ের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল ও। পরে বলল, "করিনি কখনও। তবে বইয়ে পড়েছি কী করে করতে হয়। তার আগে বল, তুই প্ল্যানচেট করার কথা জিজ্ঞেস করলি কেন?"

শুভ বলল, "আমি তোকে নিয়ে এখনই প্ল্যানচেট করতে বসব।"

শুভর প্রস্তাব শুনে রুমার ভুরু, কপাল কুঁচকে গেল। ভাইকে জিজ্ঞেস করল, "হঠাৎ প্ল্যানচেট করতে বসবি কেন?"

"অঙ্কে পাশ করব কিনা জানতে," নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিল শুভ।

"সে কী রে! নিজে পরীক্ষা দিয়ে বলতে পারছিস না যে, পাশ করতে পারবি কি না?"

"না।"

"তুই না পারলে প্ল্যানচেট কী করে পারবে?"

"প্ল্যানচেটে আমরা কোনও মৃত মানুষের আত্মাকে ডাকব।"

"তারপর?"

"তাকে অনুরোধ করব আমি অঙ্কে পাশ করতে পারব কি না বলতে।"

"আত্মা কী করে পারবে ? সে কি তোর অঙ্ক পরীক্ষার খাতা দেখতে পাবে ? সব খাতা তো এখন স্কুলের আলমারিতে আছে।"

দিদির কথা শুনে শুভ একটু অবাক হবার ভান করল। বলল, "তুই কি জানিস না মৃত মানুষের আত্মারা আগে থেকেই সব দেখতে ও জানতে পারে ?"

"তোকে এ-কথা কে বলেছে ?" রুমা জিজ্ঞেস করল।

"আমার বন্ধু বলেছে," উত্তর দিল শুভ।

রুমা এবার হেসে ফেলল। ভাইটা সত্যিই এখনও আগের মতোই বোকা আছে। ক্লাস সিক্সে পড়ে তবু একটুও বুদ্ধি হয়নি। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে।

দিদিকে হাসতে দেখে শুভ রেগে গেল, "হাসছিস কেন ?" রেগে গেল। "হাসছিস কেন ?" জিজ্ঞেস করল ও।

হাসি চাপতে চাপতে রুমা বলল, "মৃত মানুষের আত্মার দরকার নেই। আমিই বলে দিতে পারি তুই অঙ্কে কত পাবি।"

"কী করে পারবি ?"

"কেন ? অঙ্কের প্রশ্নের পাশে-পাশে তুই নিশ্চয়ই উত্তরগুলি লিখে এনেছিস। আমি অঙ্কগুলি করে উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব।"

"আমি তো উত্তরগুলি লিখে আনিনি।"

ভাই উত্তর লিখে আনেনি শুনে রুমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বলল, "পরীক্ষা দিতে যাবার আগে তোকে পই-পই করে বলে দিলাম অঙ্কগুলি করে উত্তর লিখে আনতে। তাও আনিসনি ?"

"না।"

"কেন ?"

কেন'র উত্তর শুভ সঙ্গে-সঙ্গে দিতে পারল না। খাওয়ার শেষে খালি প্লেটে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে করুণ-চোখে দিদির মুখের দিকে তাকাল। তারপর ধরা গলায় বলল, "আজ পরীক্ষার আগে হেডস্যার বললেন এ-বছর এক সাবজেক্টে ফেল করলে প্রমোশন দেওয়া হবে না। শুনে আমি এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম···।"

ভাইয়ের কথা শেষ না করতে দিয়ে রুমা জিজ্ঞেস করল, "তাতে তোর নার্ভাস হবার কী হয়েছিল ?"

"বাঃ! নার্ভাস হব না। জানিসই তো আমি অঙ্ক ভাল পারি না," শুভ উত্তর দিল।

রুমা জিজ্ঞেস করল, "এখন পরীক্ষা দিয়ে কী মনে হচ্ছে ? ভাবছিস কি পাশের নম্বরটুকুও পাবি না ?"

"জানি না। আসলে এত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম যে, পরীক্ষার খাতায় কী যে লিখে এসেছি কিছুই মনে নেই।"

কী আর বলার আছে ভাইকে ? রুমা ভাবল, পরীক্ষার সময় সবাই নার্ভাস হয়ে যায়। ও নিজেও হয়। সুতরাং বকাবকি করে লাভ কী ? অঙ্ক দেখলেই তো ভাইয়ের গায়ে জ্বর আসে। রুমা আর কথা বাড়াল না।

খাবার টেবিলে দু' ভাই-বোন চুপচাপ বসে রইল কয়েক মিনিট। মধুবালামাসি এসে সরিয়ে নিয়ে গেল এঁটো কাপ-ডিশগুলি। খাবার আগে চশমাটা খুলে টেবিলে রেখেছিল শুভ। চশমাটা তুলে আবার পরতে পরতে রুমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী রে দিদি, করবি প্ল্যানচেট ?"

রুমার ইচ্ছে ছিল না। তবু ভাইয়ের অবস্থার কথা ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও রাজি হয়ে গেল। বলল, "করতে পারি। তবে এ-বিষয়ে যা



পড়েছিলাম, সব মনে আছে কি না ভেবে দেখতে হবে।"

দিদি রাজি হয়েছে দেখে শুভ উৎসাহের সঙ্গে বলল, "তোকে ভাবতে হবে না। আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে সব জেনে এসেছি। ওর মাসতুতো দাদা ভূত-বিশেষজ্ঞ। দু'জন একসঙ্গে একবার প্ল্যানচেটে বসেছিল।"

ভাইয়ের কথা শুনে রুমা জিজ্ঞেস করল, "প্ল্যানচেট করতে কী-কী লাগে বল তো?"

"তেমন কিছু না," শুভ উত্তর দিল। একটা তেপায়া টেবিল, একটা পেনসিল আর এক টুকরো কাগজ। আমাদের বসতে হবে একটা দরজা-জানলা বন্ধ ঘরে। ঘরের নাইট-ল্যাম্পটা শুধু জ্বালিয়ে রাখতে হবে।"

ঘর, কাগজ বা পেনসিল নিয়ে কোনও সমস্যা হল না। সমস্যা দেখা দিল তেপায়া টেবিল নিয়ে। বাড়িতে একটা আছে। কিন্তু সেটা ছোটকাকার ঘরে। আর, ছোটকাকা তার ওপর বিলেত থেকে সদ্য-নিয়ে-আসা মাইক্রোহোম কমপিউটরটা বসিয়ে রেখে গেছেন। ওটাকে নামানো ঠিক হবে কি হবে না, এই নিয়ে ভাবছিল ভাই-বোনে। কমপিউটরটা প্রথম দেখার পর শুভর কাছ থেকে যেরকম আনন্দ বা উচ্ছ্বাস দেখবে আশা করেছিল, রুমা তা দেখতে পায়নি। আসলে অঙ্ক পরীক্ষা নিয়ে ভাইয়ের দুর্ভাবনাই সব মাটি করে দিয়েছে। শুধু কমপিউটরটা দেখে ও একবার বলল, "এটা দেখে মনে হচ্ছে একটা টিভি আর টাইপ মেশিন একসঙ্গে জোড়া লাগানো।"

শেষ পর্যন্ত শুভই সমস্যার সমাধান করল। বলল, "দেখ দিদি, টেবিলটা দরকার কাগজ-পেনসিল রাখার জন্য। কাকা যে টেবিলের ওপর কমপিউটর রেখেছেন তাতে কাগজ-পেনসিল রাখার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে। সুতরাং কমপিউটর না নামিয়েই ওটা ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভাইয়ের প্রস্তাব শুনে রুমা বলল, "ঠিক বলেছিস।"

শুভ বলল, "তা হলে আয়, এবার তাড়াতাড়ি বসে পড়ি। বাবা-মা আসার আগেই সব করে ফেলতে হবে।"

"আমি দরজা-জানলা সব বন্ধ করছি," রুমা বলল, "তুই রান্নাঘরে গিয়ে মধুবালামাসিকে বলে আয় যে, আমরা ছোটকাকার ঘরে বসে একটা জরুরি কাজ করছি। মাসি যেন ঘন্টাখানেক এ-ঘরে না আসে বা আমাদের না ডাকে।"

শুভ চলে গেল।

দরজা-জানলা বন্ধ ঘর। নাইট-ল্যাম্পের হালকা নীল আলোয় কী রকম আবছায়া চারদিকে। শীতের রাত সন্ধেতেই সুনসান হয়ে পড়ে। বাইরে থেকে কোনও শব্দ ভেসে আসছে না। ঘরের এক কোণে তেপায়া টেবিলের ওপর কমপিউটর। পাশে একটুকরো সাদা কাগজ। তার ওপর পেনসিল। টেবিলের একটা পায়ের কাছে পাশাপাশি বসেছে দু' ভাই-বোন।

প্ল্যানচেট শুরুর আগে ঠিক করে নিতে হয় কোন্ আত্মাকে ডাকা হবে। শুভ নিজে এটা ঠিক করতে পারছিল না। নিচু গলায় রুমাকে জিজ্ঞেস করল, "কার আত্মাকে আমরা ডাকব বল তো।"

রুমা উত্তর দিল, "এটা তোর ব্যাপার। তুই ঠিক কর।"

"আমি ঠিক করতে পারছি না," শুভ বলল। তারপর একটু ভেবে বলল, "আচ্ছা, জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকারকে ডাকলে কেমন হয়?"

"উনি তো এখন বেঁচে আছেন। ওর আত্মা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসবে কী করে?"

"তা হলে, জগদীশচন্দ্র বোসকে ডাকি।"

"জগদীশচন্দ্র বোস তো গাছ নিয়ে গবেষণা করতেন। অঙ্কের ব্যাপারে ওঁকে ডাকা কি ঠিক হবে?"

"দিদি, সত্যেন বোসকে ডাকা যেতে পারে কিন্তু। ওর জীবনীতে পড়েছি, উনি অঙ্কে তুখোড় ছিলেন।"

সত্যেন বোসের নামটা রুমার মনে ধরল। ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ! ওঁকে ডাকা যেতে পারে। ওঁর ছবি ছাড়াও ওঁকে খুব ছোটবেলায় সামনে থেকে আমি দেখেওছিলাম একবার। কিন্তু দেখতে যা গম্ভীর লেগেছিল, মনে হয়, আমরা ডাকলে ওঁর আত্মা আসবে না।"

দিদির কথায় শুভ মুষড়ে পড়ল, "তা হলে আর কাকে ডাকব বল? রবীন্দ্রনাথকে ডাকা যেতে পারত! কিন্তু উনি তো কবি ছিলেন।"

ভাইয়ের হতাশাগ্রস্ত গলা শুনে রুমা বলল, "দাঁড়া, আমাকে এক মিনিট ভাবতে দে।"

"এক মিনিট কি, আধ মিনিটও পার হয়নি। রুমা উচ্ছ্বাসের গলায় বলে উঠল, "পেয়েছি, পেয়েছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে শুভ জিজ্ঞেস করল, "কাকে রে দিদি?"

"আইনস্টাইনকে," রুমা বলল, "আমরা আইনস্টাইনের আত্মাকে ডাকব। উনিও অঙ্কের বিশাল পণ্ডিত ছিলেন। সত্যেন বোসের সঙ্গে ওঁর খুব বন্ধুত্বও ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, আজ ছোটকাকার কাছে শুনেছি, উনি নাকি ছোটদের খুব ভালবাসতেন।"

দিদির এই প্রস্তাবে শুভ কিন্তু খুব উচ্ছ্বসিত হতে পারল না। বলল, "তা না হয় হল। কিন্তু আমি কখনও আইনস্টাইনকে দেখিনি। এমন কী ওঁর ছবিও দেখিনি। ওঁর আত্মাকে স্মরণ করব কী করে?"

"তাতে কী হয়েছে?" ভাইকে উৎসাহ দিল রুমা। বলল, "আমি আজ আইনস্টাইনের ফোটো দেখেছি। লণ্ডনের মাদাম ত্যুসোর মিউজিয়াম থেকে ছোটকাকা তুলে এনেছেন। মিউজিয়ামের গায়ে লাগানো লণ্ডন প্ল্যানেটেরিয়ামে বসানো মোমের তৈরি আইনস্টাইনের মূর্তির ফোটো। দেখলে বিশ্বাসই হবে না যে, ফোটোটা আইনস্টাইনের বেঁচে থাকার সময়ের নয়, মোমের মূর্তির থেকে তোলা।"

রুমার মুখে সব শুনে শুভ বলল, "তা হলে আমাকে বল, আইনস্টাইন কী-রকম দেখতে ছিলেন।"

"দেখতে সাধারণ সাহেবদের মতোই," রুমা বলতে লাগল, "ধূসর রঙের গরম ফুলপ্যান্ট আর পিঙ্ক কালারের পুলওভার পরা। খুব মোটা নন। দোহারা চেহারা। ছ' ফুটের ওপর লম্বা। দুধে-আলতা গায়ের রঙ। মাথাভর্তি সাদা ধপধপে সিল্কের মতো অল্প কোঁকড়ানো চুল। মুখটা বেশ শার্প। তবে চামড়ায় সামান্য ভাঁজ পড়েছে। আর, চোখ দুটো দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত, কৌতুক মেশানো।"

দিদির মুখে আইনস্টাইন কী-রকম দেখতে ছিলেন শুনে শুভ বলল, "আয়, তা হলে আমরা আইনস্টাইনের আত্মাকেই ডাকি।"

রুমা বলল, "ঠিক আছে। শুরু কর।"

দু' ভাই-বোন এবার কথা বন্ধ করে জোড়াসনে বসে তেপায়া টেবিলটা এক হাত দিয়ে ছুঁয়ে আইনস্টাইনের আত্মাকে একমনে স্মরণ করতে শুরু করল। প্রথম দিকে দু'জনেই একটু ছটফট করছিল। রুমা ভাবছিল, সব ঠিকঠাক করা হচ্ছে কি না। শুভর ঠিক উলটোটা। ওর গা ছমছম করছিল ভয়ে।

দু'জনেরই চোখ বন্ধ। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড চলে যাচ্ছে। মিনিটের পর মিনিট। কত সময় যে কেটে গেল দু'জনের কারও খেয়াল নেই। আইনস্টাইনের আত্মা আর আসে না।

হঠাৎ দুজনকে চমকে দিয়ে কমপিউটরটা ক্যা-ক্যা শব্দে আওয়াজ করে উঠল। শব্দ শুনেই দু' ভাই-বোন চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে

কমপিউটরের টেলিভিশনের মতো দেখতে ভিডিও টার্মিনাল স্ক্রিনে আলোর অক্ষরে লেখা ফুটে উঠেছে—

আমি এসেছি

দুপুরবেলায় ছোটকাকা রুমাকে একবার কমপিউটরটা চালিয়ে দেখিয়েছিলেন ।তখন রুমা দেখেছে টার্মিনালে সব লেখা ইংরেজিতে ফুটে ওঠে। বাংলাতে নয়। অথচ এখন স্ক্রিনে বাংলায় লেখা। তা ছাড়া আত্মার তো পেনসিল দিয়ে কাগজে লেখার কথা। কমপিউটরের মাধ্যমে নয়। রুমার এতক্ষণ বিশেষ ভয়টয় করেনি। কিন্তু এবার ভয় জড়িয়ে ধরল ওকে। আর, শুভ তো ভয়ে প্রথম থেকেই বোবা হয়ে আছে।

অনেক কষ্টে ভয়ের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে রুমা কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে ?"

কমপিউটর রুমার প্রশ্ন শুনে আবার ক্যা-ক্যা শব্দ করল। টার্মিনালের হালকা-সবুজ স্ক্রিনে একটা উজ্জ্বল আলোর বিন্দু দ্রুত বাঁ দিক থেকে সরলরেখায় ডান দিকে সরে উজ্জ্বল আলোর অক্ষরে লিখে দিল—আমি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

রুমা আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কমপিউটরের মাধ্যমে উত্তর দিচ্ছেন কেন ? আমরা তো কাগজ-পেনসিল রেখেছি।

আইনস্টাইন বললেন, "তোমরা তো প্ল্যানচেট করতেই ভুল করেছ। প্ল্যানচেট করতে হলে তিনজনকে বসতে হয়। তাদের মধ্যে একজন হয় মিডিয়াম, যার ওপর মৃত ব্যক্তির আত্মা ভর করে। সেই মিডিয়ামের হাতে রাখতে হয় পেনসিল। তোমরা তো তা করোনি। আমি কী করে লিখে উত্তর দেব। তা ছাড়া আমি ভেবে দেখলাম তোমাদের কাউকে মিডিয়াম হিসেবে বেছে নিলে ভয় পেতে পারো। তাই কমপিউটরকে মিডিয়াম করলাম।"

এই পর্যন্ত বলে আইনস্টাইন থামলেন। রুমা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে লজ্জা-জড়ানো গলায় বলল, "আমরা ভুলের জন্য দুঃখিত। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।"

রুমা ক্ষমা চাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শুভ দেখল টার্মিনালের স্ক্রিনে নিমেষের মধ্যে লেখা ফুটে উঠল—'না! না! দুঃখিত হবার কী আছে ? ছোটরা তো ভুল করতেই পারে। আর, আমরা যারা বড়, আমাদের কাজ ছোটদের ভুল ক্ষমা করে তাদের শুধরে দেওয়া।'

আইনস্টাইন এ-কথা বলা সত্ত্বেও রুমার লজ্জা কাটছিল না। শুভর লজ্জার ব্যাপার নেই। ভয়েই চুপ। দুজনের কারও মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছিল না।

কয়েক সেকেণ্ড পরে কমপিউটর আবার ক্যা-ক্যা শব্দ করে উঠল। শুভ ও রুমা তাকিয়ে দেখল আইনস্টাইন জিজ্ঞেস করছেন, "আমাকে কেন ডেকেছ তোমরা ?"

আইনস্টাইনের এ-প্রশ্ন শুনে রুমা ভাবল, আর লজ্জা করলে চলবে না। এত বড় বিজ্ঞানীর আত্মা ওদের মতো সামান্য দুজন ছেলেমেয়ের ডাকে এসেছেন যখন, তাঁর সঙ্গে সহজভাবে কথা বলে সম্মান জানানো উচিত।

সবকিছু ভেবেটেবে রুমা বলল, "আমার ভাই শুভর অঙ্ক-পরীক্ষা আজ খুব খারাপ হয়েছে। ও বুঝতে পারছে না পাশ করবে কি ফেল করবে। আপনি একবার দয়া করে বলে দিন, ও অঙ্কে কত নম্বর পাবে।"

রুমার অনুরোধের উত্তরে কমপিউটর টার্মিনালে সঙ্গে সঙ্গে কোনও লেখা দেখা গেল না। কয়েক সেকেণ্ড স্ক্রিনটা অন্ধকার হয়ে রইল। রুমা ভাবল, ওর অনুরোধ শুনে আইনস্টাইনের আত্মা হয় খুব রেগে গেছেন, নয়তো মনে মনে হাসছেন। অথবা এমনও হতে পারে স্কুলে গেছেন ভাইয়ের অঙ্ক পরীক্ষার খাতা দেখতে।

স্ক্রিনটা যতক্ষণ অন্ধকার ছিল শুভ আর রুমা চুপ করে থাকলেও, শুভ খুব উৎকণ্ঠায় ভুগছিল। পাশ-ফেলের ব্যাপারটা তো এবার জানা যাবে। কী হবে ?

ক্যা··· ক্যা···

কমপিউটর আবার সজীব হয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে ভাইবোন তাকাল টার্মিনালের স্ক্রিনে। দেখল, আইনস্টাইন শুভর উদ্দেশে বলছেন, শুভ তোমার অঙ্ক পরীক্ষার খাতা দেখে এলাম।

টার্মিনাল স্ক্রিনে এই লেখা দেখে রুমা এবার নিশ্চিন্ত হল। যাক, ওর অনুরোধ শুনে আইনস্টাইন রাগও করেননি বা হাসেনওনি। ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াসলিই নিয়েছেন।

রুমা যখন এসব ভাবছে, শুভ দেখছে লেখার পর লেখা ফুটে উঠছে কমপিউটরের স্ক্রিনে। সবই শুভর উদ্দেশে।

শুভ, তুমি এবারের অঙ্ক পরীক্ষায় একশোতে একশো পেতে পারতে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য বড়জোর এক নম্বর কাটা যেত। কিন্তু অত পাবে না। তোমার খাতা দেখে মনে হল, তুমি অঙ্কের প্রশ্নগুলি ভাল করে পড়ে বোঝার চেষ্টা করোনি। অঙ্কের স্টেপগুলিও ধারাবাহিকভাবে করোনি। তাড়াহুড়ো করেছ। তা ছাড়া অঙ্ক প্র্যাকটিসেরও অভাব আছে।

টার্মিনালে এই কথাগুলি দেখে রুমা সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "আপনি ঠিক ধরেছেন। শুভ কোনও অঙ্কের প্রশ্ন বারবার পড়ে ঠিকমতো বোঝার চেষ্টা করে না। তাড়াহুড়ো করে অঙ্ক শেষ করতে চায়। আর, অঙ্ক করতে বললেই যেন ওর গায়ে জ্বর আসে।"

রুমার কথা শেষ হতে শুভ এবার প্রথম মুখ খুলল। ভয়ার্ত গলায় আস্তে আস্তে বলল," "আমি কী করব ? অঙ্ক করতে বসলে আমার যে খুব ভয় করে।"

শুভর কথা শুনে কমপিউটরে এবার ক্যা···ক্যা··· শব্দটা বারবার হতে লাগল। মনে হল, যেন শুভর কাতরোক্তি শুনে আইনস্টাইনের আত্মা খুব মজা পেয়ে হাসছেন।

শব্দটা শেষ হবার পর স্ক্রিনে লেখা ফুটে উঠল আবার।

অঙ্ককে ভয় পাওয়ার কী আছে ? অঙ্ক খুবই সোজা, যদি সূত্রগুলি মনে রাখতে পারো এবং যে অঙ্কটা সহজে বুঝবে না বারবার পড়ে বোঝার চেষ্টা কোরো। সব অঙ্ক তাড়াতাড়ি করা যায় না। তবে ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলে একসময় না একসময় হবেই। অঙ্ককে ভয় পেও না, তা হলে অঙ্ক করতেও ভয় পাবে না।

আইনস্টাইনের উপদেশগুলি শুনে শুভ ঘাড় নাড়ল। বলল, "কাল থেকে আপনার কথামতোই অঙ্ক করব। কিন্তু আজকের পরীক্ষায় পাশ করব তো ?"

আইনস্টাইন উত্তরে কমপিউটরের স্ক্রিনে লিখে জানালেন, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর তো আমি আগেই দিয়েছি। বুঝতে পারোনি।

শুভ আগের উত্তরগুলি মনে করে কিছু বোঝার চেষ্টা করার আগেই বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়ল। ছোটকাকার বাজখাঁই গলা শোনা গেল, "এই তোরা ঘর বন্ধ করে কী করছিস ?"

রুমা শুনতে পেল মা বলছেন, "শিগ্‌গিরি দরজা খোল।" জোরে জোরে ধাক্কাও দিচ্ছেন দরজায়।

দুই ভাই-বোন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল দরজা খোলার জন্য। দরজা খুলতে যাবার আগে শেষবারের মতো তাকাল কমপিউটরের টার্মিনাল স্ক্রিনের দকে। দেখল, তাতে উজ্জ্বল আলোর অক্ষরে লেখা আছে, আমাকে ডাকার জন্য ধন্যবাদ। তোমরা দুজনে আমার ভালবাসা নিও।

ছবি দেবাশিস দেব

টেক্স বেনসন



অফিসার্স' ক্লাবে বসে টেক্স আর বো বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় ডাক পড়ল টেক্সের।
ক্যাপ্টেন বেনসন···অনুগ্রহ করে জেনারেল ম্যাকিনটায়ারের অফিসে আসুন!
ওহ! আবার কী জন্যে?
বিরক্ত হোয়ো না টেক্স···উনি বোধহয় কাজটা ভালভাবে করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে চান।
হয়তো তাই···
তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ!
ঠিক আছে···দিনদুয়েকের মধ্যে তোমাকে খামারে আশা করছি। পাখি মারার বন্দুকটা এনো···একটু পাখি শিকার করা যাবে···বিদায় বন্ধুরা!
টেক্স 'মগ ওয়ান' চালিয়ে জেনারেল ম্যাকিনটায়ারের অফিসে হাজির হল।
পূর্ব-টেকসাসে বেশ গরম··· পুরনো ধাঁচের বাড়িঘর··· অন্যান্য গ্রহের মতো নয়।
একটু বাদেই জেনারেলের অফিসে।
স্বাগতম টেক্স। দারুণ কাজ করেছ তুমি!
ধন্যবাদ ম্যাক!
আহ্!
হাই টেক্সি!
রাজকুমারী এখানে কী করছেন?
হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই জন্যেই তোমাকে ডেকেছি···একটা সমস্যা ক্যাপ্টেন···
এখন আর কোনও কাজ নয় ম্যাক! দলের সবাই ক্লান্ত, অসুস্থ। এখন বিশ্রাম নিতে না দিলে ওরা দাঙ্গা বাধাবে!
আমার কথা শোনো ক্যাপ্টেন···কাজটা নিলে তোমরা সবাই প্রচুর টাকা পাবে।
টাকা?···বেশ, তা হলে আপনার কথা শোনা যাক জেনারেল।
জেনারেল ম্যাকিনটায়ারের অফিসে···
একটা গোপন খবর আছে টেক্স···ক্রোটনদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার মুখে। এখন এটা রাজনীতিকদের হাতে। সবকিছুই ভাল. শুধু একটা জিনিস বাদে··· কাউন্ট ট্রাগোর সমর্থনে ক্রোটনরা স্কর্পিয়া দখল করেছে। ট্রাগো এখন নাকি 'সুপ্রিম রুলার'!
ওই গ্রহে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। মার্কিন সরকার এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে এটি আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের চেহারা নিতে পারে···রাজকুমারী চান তুমি একটি মারসিনারি এয়ার কোরের নেতৃত্ব দাও। কাজটা খুবই বড় টেক্স, এ-কাজে তুমি আর তোমার লোকরাই যোগ্যতম।
দাঁড়ান ম্যাক···তার মানে আমাকে কি এই মহিলা চেঙ্গিস খানের কাছ থেকে অর্ডার নিতে হবে?
ঠিক তাই, ডার্লিং!

টেক্স বেনসন

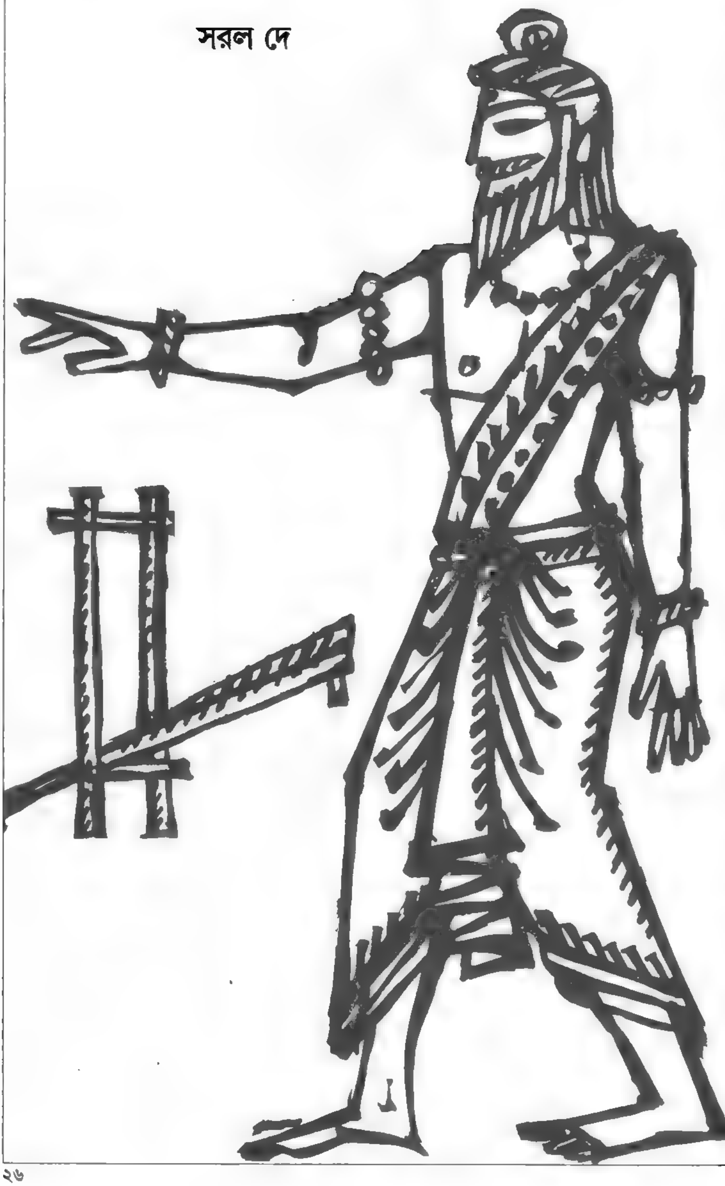
লেখা ও ছবি : চাক রবলিন



(এর পর আগামী সংখ্যায়)

ঢেঁকি-পুরাণ

সরল দে



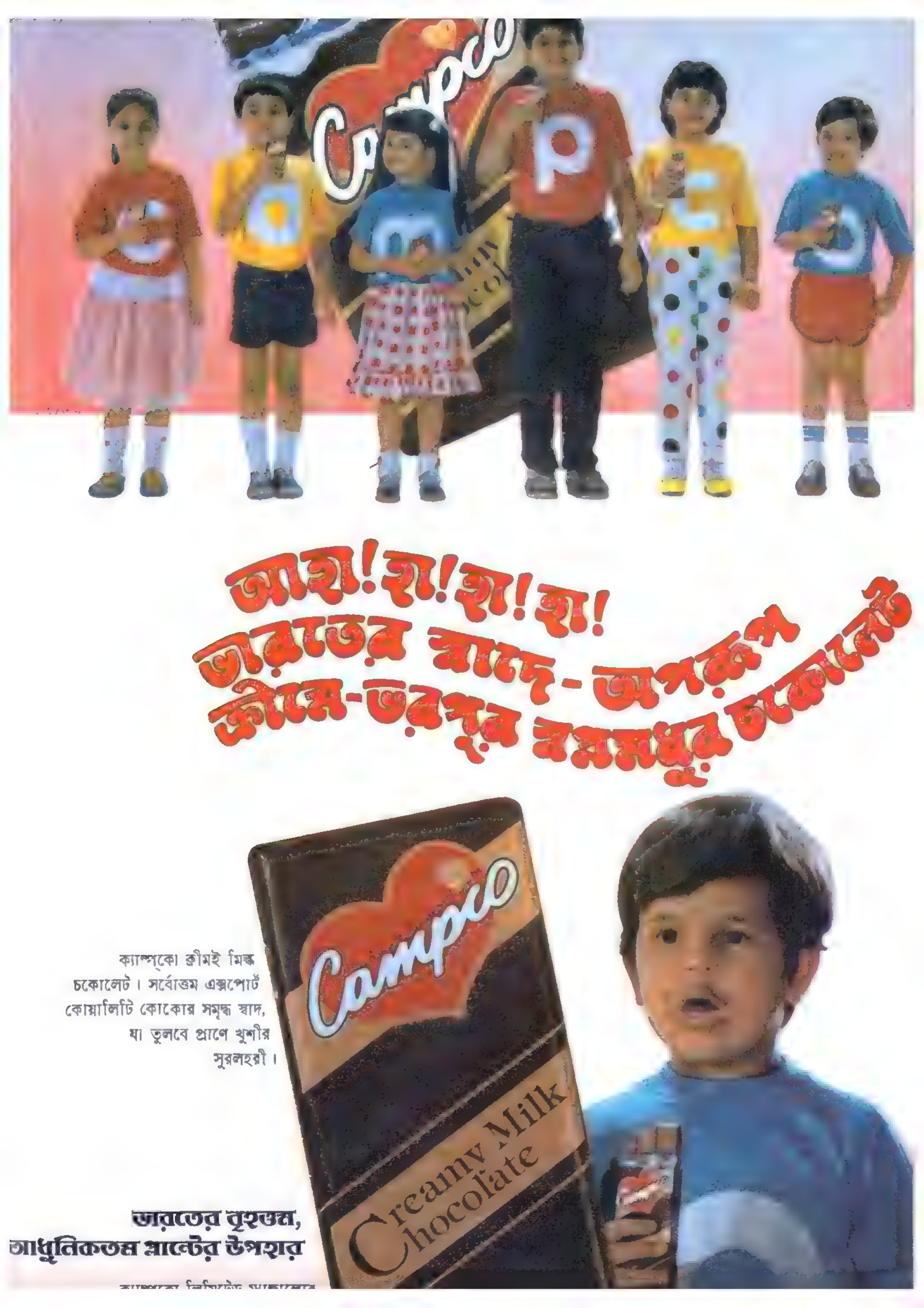
এক যে ঢেঁকি খুব সাবেকি,
মর্ত্যলোকে করত সে কী ?
ভাঙত সে ধান সকাল-দুপুর,
ধাপুর ধুপুর ধাপুর ধুপুর ।
কোন্ সে কালে, সত্য ত্রেতা
কিংবা দ্বাপর, বলবে কে তা !
নেই তা জানা নেই তা জানা,
কিন্তু জানি কাণ্ডখানা ।
ঢেঁকির ছিল দুঃখ অতি,
তার যে কেন হয় না গতি ।
খাচ্ছে ল্যাথি উপর্যুপুর,
ধাপুর ধুপুর ধাপুর ধুপুর ।

গুমরে-ওঠা সেই কাঁদুনি,
শুনতে পেলেন নারদমুনি ।
এলেন ঢেঁকিশালায় নেমে,
অমনি গেল কান্না থেমে ।
নারদমুনি যা-হন তা -হন,
পেলেন খাসা ঢেঁকি-বাহন ।
তারপরে কী, তারপরে কী ?
আজব পুরান উল্টে দেখি ।
ঢেঁকির আবার দহন-দাহন,
স্বর্গে গিয়ে কাহন কাহন
ধান সে ভানে সকাল দুপুর,
ধাপুর ধুপুর ধাপুর ধুপুর ।

বলেন মুনি যষ্টি তুলে,
'স্বভাব কি আর যায় রে ধুলে ?'
বললে ঢেঁকি, 'করুন ক্ষমা,
নইলে ঠুকুন মকর্দমা ।'
গরম তেলে বেগুন পড়ে,
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল নড়ে ।
রক্তচোখে ক্রুদ্ধ মুনি,
দিলেন অভিশাপ তখুনি ।
'পাপিষ্ঠ রে, একপলকে
ফের যা চলে মর্ত্যলোকে ।
কিন্তু কলির সন্ধেবেলা
ওড়াউড়ির বুঝবি ঠ্যালা ।
এখন ভাবা যায় না যা আজ,
হবি কলের উড়োজাহাজ ।'
তারপরে কী, সবাই জানে ।
হাততালি দাও এই এখানে ।

দেয় গোঁজামিল কে অফুরান,
সাঙ্গ হল ঢেঁকিপুরাণ ॥

ছবি কৃষ্ণেন্দু চাকী


আহা! হা! হা! হা!
ভারতের স্বাদে-অপরূপ
ক্রীমে-ভরপুর রসমধুর চকোলেট
ক্যাম্প্‌কো ক্রীমই মিল্ক চকোলেট। সর্বোত্তম এক্সপোর্ট কোয়ালিটি কোকোর সমৃদ্ধ স্বাদ, যা তুলবে প্রাণে খুশীর সুরলহরী।
ভারতের বৃহত্তম,
আধুনিকতম প্লান্টের উপহার
Campco
Creamy Milk Chocolate

উত্তর মেরু সাগরের নারওয়াল

বাণী চট্টোপাধ্যায়



তা [illegible]

ঠাণ্ডার ছোঁওয়া পাই, তখন সে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, যেখানে বরফেরই রাজত্ব। সেই চির-শীতের দেশে শীতের প্রকোপ যখন আরও বেড়ে যায়, বরফের রাজত্ব আরও বিস্তৃত হয়, সমুদ্রের জল ঢেকে যায় বরফে, তখন তারই মধ্যে সে সাঁতার দিয়ে ফেরে।

ঠিক তিমি বলতে আমরা যা বুঝি নারওয়াল তা নয়। আকারেও তিমির চেয়ে অনেক ছোট, তবে তিমি জাতীয় প্রাণীই বটে। জন্মের সময় লম্বায় পাঁচ ফুটের মতো, বাড়তে-বাড়তে পুরুষ নারওয়াল ১৫ ফুট পর্যন্ত হয়, তখন তার ওজন হয় দু' টনের মতো।

কাজেই আকারে তাকে তিমির তুলনায় ছোটখাটোই বলতে হয়, কিন্তু তার এমন একটি জিনিস আছে, যা তিমি কেন, অন্য কোনও সামুদ্রিক প্রাণীরই নেই।

এই যে নারওয়ালের ছবি দেখছ, তাতে নিশ্চয় লক্ষ করেছ, তার সামনের দিক থেকে লম্বা, সরু-মতো কী যেন একটা বেরিয়ে এসেছে। গণ্ডারের খড়্গ যেমন হয়, কতকটা সেই রকম, যদিও তার চেয়ে অনেক লম্বা। তার আগাটা কেমন ছুঁচলো দেখছ তো? সাধারণত পুরুষ নারওয়ালের এই বস্তুটি থাকে। কিন্তু কী জিনিস এটা?

এটি আসলে তার একটি দাঁত। তার দুটি দাঁতের একটি এই রকম লম্বা হয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধলে, এই দাঁতটিকে সে উঁচু করে ধরে, আর তা দিয়ে ঘায়েল করবার চেষ্টা করে প্রতিপক্ষকে। অস্ত্র হিসেবে এটি সামান্য নয়।

অস্ত্র হিসেবে এটি ব্যবহার করা ছাড়াও, সে এটিকে কখনও-কখনও আস্ফালন করে নিজের এলাকায় আধিপত্য জাহির করবার জন্যে। তোমরা হয়তো জানো অনেক রকমের প্রাণী আছে, যারা এক-একটা এলাকা নিজের-নিজের অধিকারভুক্ত বলে ধরে নেয়, সেখানে অন্য আর একজন এসে তার অধিকারে ভাগ বসায়, কিংবা তার সঙ্গে রেষারেষি করে, সে মোটেই তা বরদাস্ত করতে রাজি নয়। নারওয়াল যেন তার ১০ ফুট লম্বা দাঁতটি উঁচিয়ে অন্য নারওয়ালদের জানাচ্ছে, 'সাবধান, এ আমার এলাকা, এখানে নাক গলাতে গেলে বিপদে পড়বে।'

উপকথায় একজাতীয় কাল্পনিক প্রাণীর কথা পাওয়া যায়, ঘোড়ার মতো, কিন্তু তার কপালের ওপর খাড়া একটি শৃঙ্গ। তার নাম ইউনিকর্ন। এমনও হতে পারে, এই ইউনিকর্নের কল্পনাটা এসেছে এর থেকেই।

প্রাণী-বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, এই দাঁত তাদের লড়াইয়ে কাজে লাগে। একবার



নারওয়ালের দু'টি দাঁতের একটি এরকম লম্বা হয়ে যায়

একটি স্ত্রী-নারওয়ালের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, এই রকম দাঁতের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। প্রাণী-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই স্ত্রী-নারওয়ালটি কার সঙ্গিনী হবে, তা নিয়েই হয়তো দুটি পুরুষ নারওয়ালে লড়াই লেগেছিল, আর সেই লড়াইয়ের সময়েই হঠাৎ স্ত্রীটির চোট লেগে যায়।

আবার মানুষেরও কাজে লাগে এই দাঁত। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বড় আকারের একটি দাঁত প্রায় কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। এখন অবশ্য আর অত দাম পাওয়া যায় না, কারণ এখন ইউরোপের অনেক দেশে এই দাঁত আমদানি নিষিদ্ধ। আগে লোকে বিশ্বাস করত, ওষুধ হিসেবে এই দাঁতের নাকি অনেক গুণ, এতে নাকি বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে, আর নানা রকমের অসুখও সারায়।

সুদূর উত্তরের মেরুসাগরে সাঁতার দিয়ে বেড়ায় নারওয়াল, খায় মেরু অঞ্চলের কড্ মাছ, তা ছাড়া গ্রিনল্যান্ডের হ্যালিবাট মাছ, কুচো চিংড়ি।

আর সেই নারওয়ালকে খায় মানুষ। ব্যাফিন দ্বীপের লোকেরা পছন্দ করে তার অতি সুস্বাদু চামড়া, আর গ্রিনল্যান্ডের অধিবাসীরা তার মাংস খেতে ভালবাসে।

মানুষে শিকার করে এখন পর্যন্ত অবশ্য নারওয়ালকে ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারেনি। তবে উত্তর মেরু অঞ্চলের 'উন্নয়ন', অর্থাৎ কাজ-কারবার ও লোকের বসতি যে-হারে এগোচ্ছে তাতে তার বিপদের দিন ঘনিয়ে আসতে খুব দেরি নাও হতে পারে।

ছবি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর সৌজন্যে

নেই-মানুষের গল্প

লীলা মজুমদার



তোমরা নিশ্চয় জানো যে, সরকারি তদন্ত বিভাগের চেয়ে প্রাইভেট টিকটিকি আপিসের অনেক সময়ই ঢের বেশি সাফল্য দেখা যায়, তার একমাত্র কারণ তাদের গোপনীয়তা। সরকারি সংস্থাগুলোতে কে কী পদে, কবে থেকে বহাল হয়েছে, কত মাইনে পায়, বয়স কত, ইত্যাদি খবর খাতায় তো লেখা থাকেই, দরকার হলে কাগজেও ছাপা হয়। কিন্তু প্রাইভেট আপিসে দু'তিনজন ভালমানুষ-চেহারার কর্মী ছাড়া, খাতায় কারও নাম ওঠে না, এঁরা নাকি ধরাবাঁধা কোনও মাইনেও পান না, কী একটা শতকরা হিসাবে নগদ পান এবং তাতে বেশ খুশিই থাকেন বলে মনে হয়। আসল কাজ করে নেই-মানুষরা। ঘেমো কাপড়চোপড়, চোর-ছ্যাঁচড়ের মতো চেহারা, ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকে, গলির ভেতরে নোংরা চায়ের দোকানে ছেঁড়া খামে ভরা হপ্তায়-হপ্তায় শতখানেক টাকা পায়। কেউ-বা মাধ্যমিক পাশ করেছে, কেউ তা-ও করেনি। দুষ্কৃতকারী ধরে দেওয়া একটা অভ্যাসের মতো হয়ে গেছে, তবে অন্য ভাল কাজ পেলে সঙ্গে-সঙ্গে খসে পড়ার সম্ভাবনা আছে। ওদের কোনও কাজের ভার দিলে এই ঝুঁকিটা নিতেই হয়। তেমনই আবার সুবিধাও আছে কম নয়। কাজ করতে করতে দৈবাৎ যদি সত্যি করেই নেই হয়ে গেল, তা হলেও কোনও তদন্ত হয় না। বড় সায়েবকে অযথা পাঁচশোটা বাজে প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না।

তা আমাদের গল্পের শুরুতেই কলকাতার একটা পুরনো গোয়েন্দা আপিস থেকে দুজন টিকটিকিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে অতিশয় গোপনীয়ভাবে এক জায়গায় পাঠানো হয়েছিল। এই কাজে অনেকখানি বিপদের ঝুঁকি ছিল। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল, তারাই হল সবচাইতে ভাল গোয়েন্দা যারা দুষ্কৃতকারীদের মনের গলিঘুঁজি সব চেয়ে ভাল জানে। এককালে নিজেরাই হয়তো দুষ্কৃতকারী ছিল। তাদের চাইতে ভাল গোয়েন্দা আর কোথায় পাওয়া যাবে? অন্তত এদের দেখে তো তাই মনে হয়। সে যাই হোক, ওই গোয়েন্দা-আপিসটা আসলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাতেই দেখতে দেখতে এত নাম করে ফেলেছিল। এবারকার তদন্তের উদ্দেশ্যও হল একটা বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু দেশদ্রোহী দুর্বৃত্ত যাদের জনগণের শত্রুও বলা যায়, তাদের গোপন ঘাঁটি খুঁজে দেওয়া। কাজটা শুনতে যত সহজ, করতে ততটা নয়। সে যাই হোক, গুপ্ত টিকটিকিদের দিয়ে কাজে বহাল হওয়ার সময়ই সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল যে, কোনও কাজে তারা আপত্তি করবে না। এরা দুজনেই খুব দক্ষ, খুব ধূর্ত, কিন্তু খুব সাহসী নয়। তবে একদিক দিয়ে সুবিধা ছিল যে, ওরা একটিমাত্র জিনিসকেই ভয় পেত এবং সেটি হল ভূত। সুখের বিষয়, ভূতকে সব সময় ভূত বলে টের পাওয়া যায় না, তাই ওরা একবার এক আইনভঙ্গকারীকে খুঁজতে-খুঁজতে একজন সন্দেহজনক চেহারার লোকের পিছন পিছন কালীঘাটের অলিগলিতে ঘণ্টাখানেক ঘুরেছিল, কারণ ভালমানুষরা তো আর আপাদমস্তক সাদা কাপড় জড়িয়ে পথে হাঁটে না। তারপর লোকটা হঠাৎ একটা মোড় ঘুরল আর সঙ্গে-সঙ্গে কানে এল খ্যা-খ্যা-খ্যা করে বিকট হাসি। ততক্ষণে মোড়ে পৌঁছে ওদেরও মনে হল, লোকটা ধোঁয়া হয়ে উপে গেল। বলা বাহুল্য ওরা আর সেখানে দাঁড়ায়নি; সঙ্গে-সঙ্গে পিছু ফিরে দে-দৌড়। দম বন্ধ হয়ে আসছিল, বুক টিপটিপ করছিল। লাল কেবিনে আধ ভাঁড় করে চা না খেলেই নয়।

ওদের ডাক নাম লালু-ভুলু। অন্য পরিচয়ও আছে। যথেষ্ট টাকাকড়ি জমলেই চাকরি থেকে সত্যি-সত্যি নেই হয়ে অন্য জীবনটার মধ্যে টুপ করে ডুবে যাবে। ভাবতেও আরাম লাগে। এ-কাজটা সারতে পারলেই একটা মোটা সরকারি বখশিশ পাওয়া যাবে। তারপর আর ওদের পায় কে! মনে কেমন একটা বেপরোয়া ভাব এসে গেল। ভুলুর কোঁকে খোঁচা দিয়ে লালু বলল, "কী এমন শক্ত কাজ তাই বল্? একটা দুষ্টু লোককে খুঁজে দেওয়া, এই তো?"

ভুলু বলল, "যা বলেছিস্। তার চাইতে একটা সাধু লোক খুঁজে বের করা ঢের বেশি শক্ত!"

লালু বলল, "ওরে রামু, মনে বড় ফুর্তি এল। আরও দুটো হাপ-কাপ দে রে, এই ভাঁড়েতেই ঢেলে দে। তোদের ক্ষতি করতে চাইনে। আমরা বিদেশ যাচ্ছি কিনা।"

বিদেশ মানে ওই যাকে বিদেশই বলা যায়। মানে কলকাতার বাইরে। তার সঙ্গে শহরের এমন আকাশ পাতাল তফাত যে, তাকে বিদেশ ছাড়া কিছু বলা যায় না। ভুলু-লালু কেবিন থেকে বেরিয়েই গা মোড়ামুড়ি দিয়ে বলল, "দখ্‌নে চল্, অন্য সব জায়গা স্যারের পেয়ারের লোকরা চষে ফেলেছে। ডায়মন্ডহারবারে, ফ্রেজারগঞ্জে স্যারের শ্বশুরবাড়ি, মামার বাড়ি। ওখানে নয়। আরও দূরে। যেখানে মাঝারি রেলও যায় না, ফেরি-জাহাজের গতায়াতও নেই।" এ-সব কথা কলকাতার তক্তাঘাটের কাছে একটা নির্জন জায়গায় বসে হচ্ছিল।

লালু আশ্চর্য হয়ে বলল, "সে তো অস্ট্রেলিয়া।" ওর বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় দেখে ভুলু বোবা বনে গেল। রেগে বলল, "বঙ্গোপসাগরে দ্বীপ নেই? লোক থাকে না? আন্দামান নিকোবর অবধি যেতে হবে না। একবার পিসিমাকে নিয়ে গঙ্গাসাগরে গেছিলাম। সেখানে পৌঁছে একটা লোকের দূরবিন দিয়ে দেখেছিলাম দূর সাগরের চেহারা। বিশ্বাস কর আর নাই কর উন্মুক্ত সাগর বলে কিছু নেই। সর্বাঙ্গে কালো কালো ফুটকি! সেগুলো দ্বীপ না তো কী?"

কোন্ সময়ে একটা ফরসা চিমড়ে লোক ওদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল, ওরা টের পায়নি। নাকে একটা ঘেমো গন্ধ আসতেই ফিরে দেখে সে ওদের কথা হাঁ করে গিলছিল। এবার পাশে বসে পড়ে বলল, "অবিশ্যি দ্বীপই যে তা বলা যায় না। হাঙর কি বড় শুশুকের পাল, কিংবা নৌকোও হতে পারে। হ্যাঁ, দ্বীপও হতে পারে বইকী।"

ওরা হাঁ করে ওর দিকে চেয়েই রইল, মুখ বন্ধ করতে পর্যন্ত ভুলে গেল। লোকটা কাষ্ঠহেসে বলল, "আমাকে পুলিশের গুপ্তচর বলে ভুল কোরো না। লুঙ্গি-পরা দেখেও ভুল বুঝো না, আমি আসলে একজন গোঁড়া বামুন-পণ্ডিত। সত্যি কথা বলতে কী, আমার মুখে বাংলার চাইতে 'সমস্কিত'ই বেশি সহজে আসে। কিছু মনে কোরো না ভাইসব।" এই বলে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে কে জানে কাকে উদ্দেশ্য করে সুর করে বলতে লাগল, "ওনা মাসিটিং গুরুজিটিটিং তেরা স্মরণমে কেভি নয়া নয়া ঢং।" বলে ভক্তিভরে কাকে যেন বারবার নমো করতে লাগল।

তাই দেখে ওরাও কপালে হাত তুলে বলল, "নমো নমো।" 'সমস্কিত' না জানাতে তার বেশি বলতে পারল না। আর সমস্কিত কেন, ছাপার বই যদি-বা কিছুটা রপ্ত হয়, টানা হাতের লেখা বাংলা পড়তেই জিভ বেরিয়ে যায়। তার জন্য কাজের কোনও অসুবিধা হয় না, কারণ আপিস-সংক্রান্ত কোনও কথা, তা সে হাজার জরুরি খবর হোক না কেন, সাদায়-কালোয় কাগজে নামানো একদম বারণ। স্যারও কখনও এক অক্ষর হাতে কলমে লেখেন না। সব কথা মুখে মুখে, এমনকী কখনও শুধু ইশারায় হয়। কথায় বলে, সাবধানের মার নেই। এ-ও তাই। তবু ওই যা বললাম, এতে কাজের কোনও ক্ষতি হয় না, বরং নিরাপত্তা বাড়ে।

অচেনা লোকটি এবার ওদের দিকে চেয়ে বলল, "আমি বলছিলাম কি, একসঙ্গে কাজ করলে হয় না? তোমরা বোধহয় বঙ্গোপসাগরের দ্বীপ ইত্যাদি বিষয়ে কৌতূহলী? কোথায়, কী হয়, কে আছে, তা

জানতে চাও। হয়তো বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করছ ? তা বেশ তো, আমিও তোমাদের সাহায্য করব।"

এতক্ষণে ভাষা ফিরে পেয়ে লালু বলল, "কেউ কারও জন্য মিনি-মাগনা কিছু করে না।"

লোকটা বলল, "চ্ চ্ চ্ ! চ্ চ্ চ্ ! অমনি সন্দেহ জাগল বুঝি ? মিনিমাগনা কেউ কিছু করে নাকি ? ব্যাপার হল তোমরাও কেমন কে জানে হয়তো ফেরারি আসামি হলেই বা ঠেকাচ্ছে কে ..." ভুলু হাঁহাঁ করে উঠতেই সে বলল, "আহা, চটবার কী আছে ? বলছিলাম কি, তোমরাও যেমন কিঞ্চিৎ গোপনীয়তা অবলম্বন করে এগোচ্ছ, আমিও তাই করছি। তোমাদের বোধহয় দ্বীপ পরিদর্শন করবার কোনও যানবাহনের বন্দোবস্ত হয়নি ?"

ওরা দু'জনে চুপ। দ্বীপ খুঁজবার সুযোগ পেলে তো বর্তে যায়। লোকটা বলল, "ব্যাপার হল, আমি সমস্থিত পণ্ডিত হলেও, ফেরারি আসামিও বলতে পারো এক দিক দিয়ে। থানার লোকে আমার গন্ধ পেলে সটাং ফাটকে ! না, না, মুখ চাওয়াচাওয়ির কিছু নয়। হয়েছিল কি, আমার নিজের নৌকো আছে, তাতে করে চাই কি, যবদ্বীপে পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়। কিন্তু পুরনো মাঝি দুটোর হম্বিতম্বি কতদিন সওয়া যায়। লোক লাগিয়ে আচ্ছা করে ব্যাটাদের পেটাবার বন্দোবস্ত করেছি। এক্ষুনি কলকাতা বন্দর থেকে নিজেকে বহুদূরে তফাত করতে না পারলে ওম্ দ্বীপে পিতাঠাকুরের অ্যাসিস্টিনি করা শিকেয় উঠল ! নৌকো চালাতে জানো ?"

ওরা লাফিয়ে উঠল, "তা আর জানিনে ! বলে আমাদের পূর্বপুরুষরা নিত্যি মসলাদ্বীপে নৌকো করে যাওয়া-আসা করত না ?" এমনি করেই দু-চার মিনিটে এক-একটা লোকের কেন, এক-একটা গোটা দেশের ভাগ্য ফিরে যায়। চিমড়ে ফরসা লোকটার সঙ্গে নিমেষের মধ্যে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। গঙ্গার ধারে যারা পায়চারি করছিল, তারা দূর থেকে দেখল, ঝুপড়ি গাছতলায় ছায়া-ছায়া কারা যেন এই ছিল এই নেই। 'রাম, রাম' বলে তারা আবার ফেরার পথ ধরল।

॥ ২ ॥

সমুদ্রের মধ্যিখানে সেই দ্বীপ। খুব একটা দুর্গম স্থানেও নয়। অন্য দু-একটা বসবাসের অনুপযুক্ত দ্বীপের মাঝখানের নিবে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির মাথায় চড়ে তাকালে, অনেক দূরে যেখানে আকাশের ঘন নীল ফিকে হয়ে এসে সাগরের গাঢ় নীলের সঙ্গে মিশে যায়, সেদিকে তাকিয়ে চেষ্টা করলে, যাদের খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এমন সব জোয়ান মাঝিরা দেখতে পায় আকাশের আর সাগরের সীমারেখায় সরু একটা গাঢ় ছায়া। বুড়োরা দেখতেও পায় না, বিশ্বাসও করে না। আকাট মুখ্যু সব, নিজেদের বংশের নাম পর্যন্ত বলতে পারে না। জোয়ানদের কথা শুনে, বাপ-ঠাকুর্দাদের কী হাসি। "ওই গানওয়ালার কথা শুনে তোদের কাল হয়েছে ! কে না জানে ওইখানে সাগরের ঢেউ পৌঁছলেই কিনারা পেয়ে গিয়ে পৃথিবীর গা থেকে ঝরনার মতো সব জল ঝরে পড়ে। বড়ভুঁইয়ের লোকরা ওকেই বলে আকাশগঙ্গা। গানওলা বলছিল শুনিসনি ?"

ছেলে-ছোকরারা এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে বলে, "কিন্তু আমাদের স্কুলের মাস্টার অন্যরকম বলে।"

"কী, বলেটা কী ?"

"পৃথিবীটা নাকি গোল, কিনারাটিনারা নেই।"

বুড়োদের কী হাসি, "তাই বইকী। পষ্ট দেখছি আকাশটাই গোল, পৃথিবী নয়। তোদের লাথি খেলার একটা গোলার ওপর জল ঢেলেই দ্যাখ না কী হয়। কিনারা দিয়ে ঝরে না পড়লে, এতদিনে বর্ষার জলে দুনিয়া ভেসে যেত না ?"

ছেলেদের মাস্টারের ওপর বড় ভক্তি, তারা বলে, "মাস্টার বলেছে, ঠিক এই জায়গা থেকে বেরিয়ে যদি ক্রমাগত পুবে কিংবা পশ্চিমে যাওয়া যায়, তা হলে এইখানেই ফিরে আসব। তবে ধ্রুবতারার দিকে চোখ রেখে ঠিক দিকে যেতে হবে।"

"হুঁ, পৌঁছলি আর কি ! মধ্যিখানে মানুষখেগোদের দ্বীপ আছে না ? ডুবন্ত পাহাড় আছে না ? ঘূর্ণিজল আছে না ? ঘূর্ণি হাওয়াও আছে। জলের ওপর থেকে নৌকোসুদ্ধু মানুষ টেনে তুলে নেয়। মাঝে-মাঝে বড় বান ডাকলে, এই যেখানে দাঁড়িয়ে লম্বা-লম্বা কথা বলছিস, সে-সব দ্বীপও ডুবে যায়।

ছোকরারা তবু বলে, "এগুলো ঠিক অন্য দ্বীপের মতো নয়, মাস্টার বলেছে। এ হল আগুন-পাহাড়ের চুড়ো। তাই তেমন কেউ বাস করে না। যেমন মাথা তুলে উঠেছিল, তেমনি ডুবও দিতে পারে। এখানকার পাহাড়চুড়ো দিয়ে এক সময় ধোঁয়া আর আগুন আর গলন্ত পাথর বের হত ; বিষাক্ত হাওয়া ছড়াত ; চারদিক কাঁপত ; সমুদ্রের জল তোলপাড় হত। ক্রমে-ক্রমে ওর বুকের আগুন নিবে গেছে।"

সবচাইতে যে বুড়ো, একমাত্র সেই মাঝিই বলল, "একেবারে নেবেনি হয়তো। নিঝুম রাতে কখনও-কখনও তীরের কাছে আমাদের গাঁ থেকেও গুড়গুড় শব্দ শুনতে পাই !"

তাই শুনে ছেলে-বুড়ো হেসেই কুটোপাটি, "ওতো তুমি পরকালের ডাক শোনো দাদু। বয়স তো হল চার কুড়ি দশ। শরীর শুকিয়ে পাকা দড়ি। নেহাত তুমি সঙ্গে থাকলে নৌকো কখনও বেপথে যাবে না, তাই তোমাকে সঙ্গে আনা। নইলে সদাই ভয়ে-ভয়ে থাকি, কখন তোমার কী হয়।"

বুড়ো হাসল, "শুধু সে জন্যেই নয় রে, বাছা। ঝড়ের মধ্যে আর কে হাল ধরে ঠিক পথে নৌকো চালাবে বল ? আর তেমন কিছু হলেই বা ঠেকাচ্ছে কে ? প্রায় একশো বছর হতে চলল, গঙ্গার মোহনায় সে কী ঝড় ! তারই মধ্যে নৌকোয় আমার জন্ম হয়েছিল। ঝড়কে ভয় করে না মাঝিদের ছেলে। তবে ওই কালো ছায়াটে বড় অমঙ্গুলে, কারণ ওর চারদিকে ঘূর্ণিজল। ওটা কখনও ডোবে না, ওর থেকে ধোঁয়াও ওঠে না। নাকি প্রেতরা থাকে। তাই কেউ যায় না ওদিকে। তোমাদের মাছ ধরাও হল, দিনও শেষ হয়ে আসছে, চলো, এবার ফেরা যাক।" দখনে বাতাসে ভর করে, পাল তুলে দিয়ে, সাগরের জয়গান গাইতে গাইতে তীরের কাছে নিজেদের নিরাপদ আস্তানায় ওরা ফিরে গেল। খালি চম্পক আর বকুল দুই ভাইয়ের মন পড়ে থাকল ওই সুদূরের ঘূর্ণিঘেরা ছাইরঙের দাগটার ওপর। নাম দুটো যতই শুনতে মিষ্টি হোক না কেন, ওই ছেলে দুটোই সবচাইতে দুর্দান্ত, অবাধ্য, বেপরোয়া। কিন্তু ডানা-ভাঙা পাখির, জলে-ভেজা বেড়াল বাচ্চার, চোখ খুবলোনো কুকুরছানার বন্ধুও ওরাই। বাপ-মা কোন কালে নিখোঁজ হয়েছে, তবে জেলের ছেলে কখনও পথে পড়ে থাকে না। এরা দেখতেও বড় সুন্দর। জেলের ছেলের অমন রং হয় না। দু'বেলা মুখে দুটো ভাত গুঁজে দিলে দেখতে দেখতে নলনল করে বাড়ে। দুধের দাঁত পড়ার আগেই শিঙি মাছের মতো কিলবিল করে সাঁতার কাটে। শোনা যায় বড়-বড় জাহাজের নাবিকরা নাকি সাঁতার জানে না ; জলে পলে'ই হয়ে গেল ! অমনি ওলনদড়িটের মতো টুপ করে ডুবে মরে, যদি না জেলের ছেলেরা কাছে থাকে। তারা সঙ্গে-সঙ্গে ডুব দিয়ে তুলে আনে। পেটে জল ঢুকে দম বন্ধ হয়ে এলে কী করতে হয় তাও তাদের জানা থাকে। ডাক্তার-বদ্যি করার পয়সা কোথায় পাবে ?

নিতান্ত মুখ্যু নয় ছেলে-ছোকরারা। বুড়োদাদু একবার শখের

সওয়ারি নিয়ে তার নৌকো ভাসিয়ে অনেক দূর গেছিল। তা সওয়ারিদের পাণ্ডা যখন শুনল এরা লিখতে-পড়তে জানে না, তখন বুড়োদাদুকে বলেছিল, "তোমাদের গাঁয়ে পাঠশালা করে দেব ?"

বুড়োদাদু বুক চিতিয়ে বলল, "একজন ভালমানুষ মাস্টার পাঠিয়ে দিও, তবেই সবচেয়ে ভাল হবে।" সে আজ সত্তর বছর আগের কথা। সেই ইস্তক জেলেগাঁয়ে একজন মাস্টার কেন, এখন দু'জন মাস্টার আছে। গাঁয়ের লোকে তার জন্যে চালাঘর করে দিয়েছে। মজবুত নিচু চালাঘরটি গুড়ি মেরে যেন বসে থাকে, মাথার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেলেও ক্ষতি হয় না। ওই প্রথম মাস্টারই তার পড়ুয়াদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে আজকাল নতুন মাস্টার তৈরি করে। তারা শহরে গিয়ে পাশ দিয়ে আসে। জেলের ছেলেরা খেটে খায়, কারও হাত থেকে ভিক্ষে নেয় না। সময় হলে অনেকেই গভীর জলে দেহ রাখে। মরদেহ পোড়াবার কষ্টও কাউকে দেয় না। একবার একজন যাত্রী তাই শুনে বলেছিল, "মাছ-কাঠুয়াতে খায় যদি ?"

এরা বলেছিল, "তা খাবে না ? আমরাও তো হাজারে হাজারে মাছ-কাঠুয়া ধরে খাই।" এইরকম সব মানুষ ওরা। ওদের মধ্যে সবচাইতে বেপরোয়া দুরন্ত হল ওই চাঁপা আর বকুল।ওরা পরিষ্কার রাতে চালাঘরের দাওয়ায় চাটাই পেতে শুত। সেদিন বকু হঠাৎ বলে বসল, "ওই দ্বীপটার ঢালু গায়ে মসলাগাছ হয়, মনে পড়ছে।"

সকলের কী উৎসাহ, "কী মসলা রে ? চাটমসলা বুঝি ? ইশ্, ভেবেও জিবে জল আসছে।"

চম্পু বলল, "দারচিনি গাছে এলাচলতা লবঙ্গলতা বেয়ে ওঠে মনে হচ্ছে।"

শ্রোতাদের চক্ষু চড়কগাছ, "অ্যাঁ, তাই নাকি ? লতা নাকি ? বলিস কী রে ! তবে যে শুনি ওসব নাকি আজকাল তৈরিই হয় না। চুন-সুপুরি দিয়ে লোকে পান খায়।"

বকু বলল, "চুনে দাঁত নষ্ট হয়।"

বুড়োদাদুর মেয়ে ঠানদিদিও বাইরে এসে বসে ছিল। সে বলল, "হুঃ ! দাঁত খারাপ হয় না আরও কিছু ! আমার তো সব দাঁত নড়ে গিয়ে তাম্বুর পড়েও গেল। কই, একটাও তো খারাপ হল না। তা ছাড়া এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি সবই গাছে হয়, দেবতা তৈরি করেন। তবে বড্ড দাম বলে এখন আর চোখে দেখা যায় না। যা না, সেই দ্বীপ থেকে তুলে এনে শহরের বাজারে দোকান দে। বড়লোক হয়ে যাবি। আর শীতে-বর্ষায়, ঝড়ে-জলে-তুফানে সাগর পাড়ি দিতে হবে না।"

ওরা এ-ওর মুখ চেয়ে বলল, "তবে আর বেঁচে থেকে কী লাভ ?"

দল থেকে কোন সময় চম্পক বকুল উঠে গিয়েছিল, কেউ লক্ষই করেনি। খোলা আকাশের তলায় বালির উপর বেঁটে ঝাউগাছের নীচে চাটাই পেতে শুয়ে চম্পু বলল, "মিষ্টি জলের ঝরনা আছে ওখানে। বাঁশের চোঙে করে নীচে নামায়। সেই জল সবাই খায়। তার স্বাদ মনে পড়ছে।"

বকু বলল, "হয়তো স্বপ্নে দেখেছি।"

চম্পু হাসল, "দু'জনেই ?"

এই সময় বুড়োদাদু উঠে এসে ওদের পাশে বসে বলল, "মনে হয় তোদের ক'টা কথা বলার সময় হয়েছে। ভাল করে আমার কথা শোন্।"

তারপর বুড়োদাদু রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "কখনও তোদের মনে হয়নি মানুষ তো আর ব্যাঙের ছাতা নয় যে, আপনা



থেকেই হেথা-হোথা গজাবে! একদিন সকালে দুটো ছোট্ট ছেলে এ ওকে জড়াজড়ি করে পথে পড়ে থাকলেই হয়ে গেল কি না! সাগরজলে ভেসে এলে বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতিস্ না? তবে আর বাঁচতে হত না। চার-পাঁচটে দাঁত সবে উঠেছে। কিন্তু দুজনার গলায় কালো সুতোয় বাঁধা দুটি স্ফটিকের পুঁতি। পরনে কিচ্ছু নেই। জানিস তো, সত্যিকার স্ফটিকে ন্যাকড়া জড়িয়ে তাতে আগুন ধরালেও আগুন জ্বলে না। সত্যিকার জোরালো মানুষও তাই। তার ওপর গায়ের রং তোদের ফরসা ছিল। তাই দেখে লোকের কী ভয়! ছেলে দুটো চাঁদ থেকে নেমে আসেনি তো? যদি চাঁদের শাপ লাগে, তাই সবাই মিলে কত যত্নে তোদের পালল। মাস্টারের কাছে পড়তে দিল। মাস্টার বলে, তোরাই ওর সেরা পড়ুয়া। একবার যে-কথাটা কানে ঢুকল, তার আর ভোলাভুলি নেই! তার থেকেই একশো কথা। মাস্টার পর্যন্ত হাঁপিয়ে ওঠে। উত্তর দিতে গিয়ে পুঁথিপত্তর ঘাঁটতে হয়। ছেলে দুটোও যত শেখে মাস্টার নিজেও তত শেখে।"

একটু থেমে বুড়োদাদু বলে, "কিন্তু এত দুরন্ত দুর্দান্ত কেন? ডর নেই, ভয় নেই। দেবতা মানিস তো?"

বকু বলল, "মানতে পারি, যদি উত্তরদিকের ওই তারাটার মতো পথ দেখায়। ওটার নাম জানো বুড়োদাদু?"

বুড়োদাদু হকচকিয়ে মাথা নাড়ে।

চম্পু বলে, "ওর নাম ধ্রুবতারা। ওর নড়চড় নেই। সর্বদা উত্তর দিক দেখায়। সূর্যকে দিয়ে তো বিশ্বাস নেই। চাঁদকে আরও কম।"

মাথা নেড়ে বুড়োদাদু উঠে পড়ে, "তবে এটুকু জানি চাঁদের টানে জোয়ারের ঢেউ বাড়ে-কমে। মুখ্যু মানুষের সেই যথেষ্ট। দেবতা মানিস আর না-ই মানিস, সে তোদের ভালই করবে।"

॥ ৩ ॥

সমুদ্রের মাঝে ওই একটি দ্বীপ। মাঝে বলতে ঠিক মধ্যিখানে নয়। গোল পৃথিবীর উপর সমুদ্রগুলো একটার সঙ্গে একটা জোড়া। তাদের মধ্যিখান বলে কিছু নেই। তা না থাকলেও, এমন বহু দ্বীপ আছে যেখানে পৌঁছতে পৃথিবীর সবচাইতে কাছের দেশ থেকে হয়তো স্টিমারে চেপেও বেশ ক'দিন লাগে। স্টিমার এ-সব দ্বীপের অনেকগুলোর তীরের নাগালই পায় না। হয়তো চারদিকে পাথর আর প্রবাল আর বালির চড়া। দূরবিন দিয়েই দেখা যায় যে, প্রাণ ও জাহাজের নিরাপত্তা তুচ্ছ করে গিয়েও কোনও লাভ নেই। হয়তো বা দ্বীপ বলতে একটা ডুবন্ত আগ্নেয়গিরির চুড়ো। তাতে না আছে গাছপালা, না জীবজন্তু। এমনকী,সামুদ্রিক পাখিরাও আগুন-পাহাড়ের মুখ থেকে গন্ধকের গন্ধ পেয়ে, একটু বিশ্রাম করবার জন্যেও দু'দণ্ড বসে না। কিন্তু এসব সন্দেহজনক জায়গা ছাড়াও বহু ছোট-ছোট পাথুরে দ্বীপ আছে, যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে পাখিরা বিশ্রাম করেছে। তাদের ময়লা জমে-জমে ত্রিশ-চল্লিশ মিটার উঁচু হয়ে উঠেছে। আজকাল বিজ্ঞানের যুগে কত দুঃসাহসী ব্যবসাদার সে-সব দ্বীপের মালিকানা যে সরকারের হাতে তার কাছ থেকে লাইছেন নিয়ে কপিকল দিয়ে মাল-জাহাজ বোঝাই করে যে-যার নিজের দেশে ফিরে গিয়ে বড়লোক বনে গেছে। তাই দিয়ে ওষুধ হয়, সার হয়, কে জানে হয়তো বোমা তৈরিতেও লাগানো যায়। মোট কথা, ফলাও ব্যবসা চলে। দ্বীপগুলোর নাম আছে; মানচিত্রে অবস্থান দেওয়া আছে। অনেক সময়ই বাটপাড়ির ভয়ে কিছু সশস্ত্র জাহাজও টহলদারি করে।

আমি যে দ্বীপের কথা বলছি, এ সেরকম নয়। কোনও ম্যাপেও এর নামগন্ধ নেই। গঙ্গার মোহনায় জেলেদের গাঁয়ের কাছে বড় একটা ঢিবিমতো জায়গা আছে। সেখানে চড়েও কিচ্ছু বোঝা যায় না। দিগন্তটা বড় বেশি চিকচিক চকচক করে। গাঁয়ের মেয়েরা নিশ্চিন্ত থাকে।

ওই দ্বীপ থেকেও ছেলে-ছোকরারা পরিষ্কার দিনে চেয়ে চেয়ে দেখেছে, যেখানে নীল আকাশ আর নীল সাগর মিশেছে, সেখানে সরু একটা গাঢ় ছাই রঙের লম্বা দাগ। ওই নাকি অগম্য স্থানের ডাঙার ছায়া। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনটা আনচান করে। না জানি সেখানে কত রাজ্যের আশ্চর্য জিনিস আছে। তাই দেখবার জন্য প্রাণ আঁকুপাকু। এখানে চারদিকে গোল হয়ে, মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে, আকাশটা একটা নীল বাটির মতো ওদের চাপা দিয়ে রেখেছে। উফ্ হাঁপ ধরে যায়। দমবন্ধ হয়ে আসে। সবাই জানে, এসবের বাইরে বিশাল সাগর ওদের ঘিরে আছে। সেটা পার হয়ে কিছু দেখে আসার জো নেই। অমনি রে-রে-রে-রে করে বুড়োরা তেড়ে আসবে। নিজেরা যে লুকিয়ে গিয়ে দেখে আসবে, তাই বা কী করে হয়? যেদিকে তাকায় সেদিকেই সাগর জল ফুলেফেঁপে ঘূর্ণি পাকিয়ে কোনও ভেলা বা নৌকোর পথ বন্ধ করেছে। তারপর দ্বীপের চারদিকে পাথরের মালা। তার ভিতরে স্থির জল। সেখানে ওরা মাছ ধরে, বড়-বড় চিংড়ি, কাঁকড়া ধরে, কচ্ছপ পালে। এ-সবই ধরতে মজা, খেতে মিষ্টি। পেট ভরে, কিন্তু মন ভরে না। মন সদাই পালাই পালাই করে। বুড়োরা বোঝে না।

বাইরে থেকে সব নিত্যকার মতো ঠাণ্ডা শান্ত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে গুমরোতে থাকে। তাও কম বলা হল। ছেলে-ছোকরাদের নাটের গুরু রাকেশের মনটা টগবগ করে এমনি ফুটতে থাকে যে, বাইরে থেকে বোঝা যায়। বুড়ো সর্দারের যেমন ভাবনা, তেমনি রাগ, "একেই বলে সুখে থাকতে ভুতে কিলোয়। দুঃখ কাকে বলে জানল না তো, তাই অত বুকের পাটা। এখানে তোদের কোন্ অভাবটা আছে শুনি? ছাগলে দুধ দিচ্ছে, হাঁস-মুরগি ডিম দিচ্ছে। গাছ ভরা মিষ্টি ফল আপনা থেকেই থোলো-থোলো হয়ে আছে। মাটিতে যা লাগাবে তাতেই সোনা ফলে। কার্পাস গাছের তুলো দিয়ে মেয়েরা সুতো কাটছে, কাপড় বুনছে। মাঘ মাসেও বেশি শীত হয় না, জষ্ঠি মাসেও তেমন গরম নেই; বাতাসের স্রোত এমন ভাবে বয় যে, যেটুকু বৃষ্টি দরকার তার বেশিও হয় না, কমও হয় না। কোনও কষ্ট নেই, শক্ত অসুখ কারও প্রায় হয়-ই না। ব্যথা-বেদনা যা একটু-আধটু হয় তাও নিজেদের দোষে; দুদিনে সেরেও যায়, তখন আরও ভাল লাগে। নালিশটা তোদের কী নিয়ে ভেবে পাইনে।"

কানু বলল, "নালিশ তো কেউ করেনি।"

সর্দার চটে গেল, "নালিশ নেই তো সদাই সাগরপারে চোখ ফেরাস্ কেন তোরা।"

"দেখি।"

"দেখবার আছেটা কী শুনি? সেই জল, সেই ঢেউ, তার মাথায় ফেনা..."

রাকেশ বলল, "এ-জায়গা বড় ছোট, বড় চাপা।"

সর্দারের মুখ লাল হয়ে উঠল, "তাই বুঝি? শরীরগুলো আঁটে বুঝি?"

রাকেশ বলল, "শরীর আঁটে মন আঁটে না। এখানে আসার আগে আমাদের অতিবুড়ো ঠাকুর্দারা কোথা থেকে এসেছিলেন? এখানে পুরনো কিচ্ছু নেই কেন?"

সর্দার একেবারে চুপ করে গেল। মুখটা অদ্ভুত রকম সাদা মনে হল। সঙ্গে-সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে চলেও গেল। কী যে করবে, তার কূল-কিনারা করতে পারছিল না সে।

বুড়ো-সর্দার নিজের ঘরের দাওয়ায় গিয়ে ভাবতে বসল। বাপ-ঠাকুর্দারা অনেক পাপের, অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে এসে আগুনে জ্বলে পুড়ে খাঁটি জিনিসটি পেয়েছিল; নিদেন তাই

ভেবেছিল। এখানে সবাই সমান, নিজেরাই গাঁওবুড়োদের ঠিক করে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধি আর শক্তি যার, সে-ই হল বুড়ো-সর্দার। সুখের বিষয় সোনা-রুপো টাকাকড়ির চল নেই এখানে। জিনিস অদলবদল আছে, পয়সা দিয়ে বেচাকেনা নেই। লোভের জিনিসই নেই কিছু, তা লোভ আসবে কী করে ?

গাঁওবুড়োরা ব্যাপার শুনে অবাক। "তা ওরা চায়টা কী ? অভাব কাকে বলে তাই জানে না।" কোনও সময়ে ঠানদিদিমাও দাওয়ায় এসে বসে ছিল, যদিও এখানকার মেয়েরা সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না। এমনিতে রোজকার চাহিদা রোজ মেটাতে তাদের সময় কেটে যায়। এবার কিন্তু সে কিছু না বলেও পারল না, "আরে ওই অভাব কাকে বলে না জানাটাই ওদের সবচাইতে বড় অভাব, তাও বোঝো না ?"

গিন্নির কথা শুনে বুড়ো-সর্দার পড়ে যায় আর কি। "অ্যাঁ, সুখে অরুচি হয়ে গেছে বুঝি ? এখন একটু কষ্ট করার সাধ হয়েছে ? তাই হাঁ করে চেয়ে থাকা ! বলিহারি যাই।" বড় মাস্টারও ছিল সেখানে। সে তো থাকবেই, তার মতো পরামর্শ দেবে কে ? তিন পুরুষ ধরে গাছের ছালে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো আগাগোড়া তার পড়া। তার কিছু জানতে বাকি নেই। আর শুধু তা-ই নয়, সে নিজেও অনেক লিখেছে।

মাস্টার বলল, "আসলে আমরা কুয়োর ব্যাঙ হয়ে গেছি। ছেলেপুলেগুলোকে কষ্ট করতেও শেখাতে পারিনি।" গাঁওবুড়োরা চটে লাল ! "বোকা হতে পারি, কিন্তু পঙ্গু তো আর নই। ব্যাটাচ্ছেলেদের আচ্ছা করে বিতোলেই অমনি কষ্ট কাকে বলে, সঙ্গে-সঙ্গে সে জ্ঞান লাভ হবে। এ তোমার ওই পুঁথিপত্রের কম্ম নয়।"

এইখানে বুড়ো-সর্দার হাত-পা এলিয়ে মুচ্ছো যাওয়াতে, সেদিনকার মতো সভা ভঙ্গ হল। বুড়োরা তার সেবাতে লেগে গেল আর গায়ে-পায়ে যাদের জোর বেশি, তারা গুটিকতক কঞ্চি তুলে নিয়ে ছেলেগুলোর সন্ধানে বেরোল।

যেমন ভেবেছিল, তারা একটা উঁচু জায়গা বেছে সারি-সারি দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। ওদের দেখেই মাথা ফিরিয়ে অন্যরকম কথা বলল, "ঈশান কোণে তাকিয়ে দ্যাখো, চারদিক কালো করে ঝড় আসছে। এমন ঝড় আমাদের জীবনকালে দেখিনি, আগেও কখনও হয়েছিল বলে শুনিনি।" এতক্ষণে বুড়োদের সকলের খেয়াল হল যে, চারদিক থমথম করছে, গাছের একটা পাতাও নড়ছে না, কেমন যেন গুমোট গরম। কারও মুখে কথা নেই। খালি মাস্টার বলল, "পুথিতে পড়েছি প্রায় একশো কুড়ি বছর আগেও একবার হয়েছিল। তখনই আমাদের পূর্বপুরুষরা দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল। এ-জায়গা ঝোড়ো হাওয়ার যাত্রাপথের বাইরে। কিন্তু নোনা জলের ঢেউয়ের নাগালের বাইরে নয়। তবে আমাদের ওম্ পাহাড়ের গুহাগুলো সদাই শুকনো থাকে। ভিতরে একটা মিষ্টি জলের ঝরনাও আছে। ওইখানেই আমাদের পুথিপত্র তাই নিরাপদে থাকে। যাও, গাঁয়ের সকলকে সেখানে ডেকে আনো।"

॥ ৪ ॥

দেখতে দেখতে গাঁ খালি করে মেয়ে-পুরুষ, ছেলেবুড়ো তাদের পোষা পশুপাখি নিয়ে চ্যাপ্টা পাহাড়ে জড়ো হল। একটা-দুটো গুহা নয়, পাহাড় যেন মৌচাক। এর আগেও ওরা এখানে এসে উঠেছে, আবার ঝড় থামলে নেমেও গেছে। ওই বুড়ো যেমন বলেছিল ঝোড়ো হাওয়া এখানে জোরে লাগে না, কিন্তু নোনাজল ফুলে-ফেঁপে বাইরের খালটা ভরে ফেলে। আরও উঁচু ঢেউ এলে, চাই কি, উঁচু পাড়ি ডুবিয়ে খেত খামারের ক্ষতি করতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত এতটা হয়নি।

ওইসব ঢেউগুলো অনেকটা নরম হয়ে বড় ডাঙার কূলেও আছড়ে পড়ে। শুধু আছড়ে পড়ে না, টাল সামলাতে না পেরে, উজানে ঠেলে, অনেক দূর পর্যন্ত জানান দেয়। ওম্ দ্বীপের মতো এদেশ তো আর নব্বুই বছর ধরে থেমে থাকেনি। সে-সব জায়গায় আগেও নদীর ধারে বাতিঘর ছিল, তাতে বড় বড় তেলের বাতি জ্বেলে সরকারি বিভাগ ঝড়ের সঙ্কেত দিত। সমুদ্রতীরে নদীর মোহানাতেও বাতিঘর ছিল। আজ পর্যন্ত তাদের দেখা যায়। লোকে তাদের নিয়ে নানান অদ্ভুত গল্প বলে ; ভয় পায়। পরে বেতারেও সে-খবর চারদিকে ছড়ায় ; খবরের কাগজে ছাপে। আবার হঠাৎ-হঠাৎ এমন এক-একটা ঘূর্ণিঝড়ের আগমন হয়, কেউ কিছু বুঝবার আগেই ঘাড়ে এসে পড়ে। আর জানান দিলেও কালের গতি আর ষাঁড়াষাঁড়ির বান ঠেকাচ্ছে কে ? তবে দ্বীপের লোকদের অত জানবার কথা নয়।

সেদিন সন্ধ্যায় ওই লালু-ভুলু আর ফরসা লোকটা যখন কলকাতার তক্তাঘাটের কাছে নদীপারের পথ থেকে টুপ করে নেমে সান্ধ্যভ্রমণকারীদের চমকে দিয়ে জলের কিনারায় দাঁড়াল ওরা দেখল আকাশ পরিষ্কার, চাঁদের আলো ফুটফুট করছে, নদীর তীরে সারি-সারি নৌকো বাঁধা। এ-সব হল গিয়ে মাছ ধরার নৌকো, যাত্রী পারাপারের নয়। লালু-ভুলু আশ্চর্য হয়ে ফরসা লোকটার দিকে তাকাল, "এই নৌকো করে সাগরপারে যাবে, দাদা ? এর দৌড় তো বড়জোর নদী-মোহানার জেলেদের গাঁ পর্যন্ত। তাতেই রাত কাবার হয়ে যাবে। আর-কিছু ভাবো।"

লোকটা বলল, "খেপেছ ? একটু হাঁটলে পা তো আর ক্ষয়ে যাবে না। নির্জনে পৌঁছলে দেখবে অন্য ব্যবস্থা আছে।"

লালু-ভুলু অত কাঁচা ছেলে নয়। তা হলে আর টিকটিকিগিরি করতে হত না। প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো তাদের অভ্যাস। গোয়েন্দা-কোম্পানির সার্থক নেই-মানুষ ওরা, একটা বার্থ-সার্টিফিকেট পর্যন্ত নেই। মা-বাপের পাত্তা তো নেইই। আশা করি সকলে জানো যে, জন্মালেই সরকারি আপিসে নামধাম পিতৃপরিচয় রেজিস্টার করতে হয়। তা হলেই হয়েছিল ! অমনি পেছনে পুলিশ লাগত না ? নেই-মানুষদেরও ও-সব বড়মানুষি করলে চলে না। ওই যা বললাম, প্রাণ হাতে করে চলাফেরা।

খট করে দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফরসা লোকটা তো অবাক ! "আবার কী হল ? আমি তো দেখছি এখানেই রাত কাবার করে দেবে। আরে বাবা, অত ভয় কিসের ? সাধারণ চোর-ডাকাত নই আমি। তার চেয়ে বড় শিকারের পেছনে আছি। চল, চল, পা চালিয়ে। নাকি সার্চ করে দেখবে ?"

লালু-ভুলু কাষ্ঠ হাসল, "আমাদের আছেটা কী, যে ভয় পাব ? ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। তবে কিনা প্রাণটা পরম ধন, তাই তোমার নামটা আর পেশাটা কী জানতে পারলেই পা বাড়াব।"

লোকটা ইদিক-উদিক তাকিয়ে বলল, "আমি একটা নেই-মানুষ। দাদা বলে ডেকেছ সেই তো বেশ। আমার পেছনে পুলিশ লেগেছে, তাই পেলিয়ে বেড়াচ্ছি। তা ছাড়া বড় লাভের আশাও আছে। আসবে, না আসবে না ?"

ওরা বলল, "চলো, দাদা।"

যাবে না তো আবার কি ?

ছিল একটা নৌকো আর-একটু আগে, ঝোপের মধ্যে তোলা। একটু অন্য ধরনের নৌকো, কেমন গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। খুব ছোটও নয়। ফরসা লোকটা বলল, "ওটা ঠেলে জলে নামাও দিকিনি।"

নিজে হাত লাগাল না। ওরা আশ্চর্য হচ্ছে দেখে একটু লজ্জা

পেয়ে বলল, "ডান হাতটার কনুই থেকে হাঙরে খেয়েছিল। এটা প্লাস্টিকের তৈরি।" বলে কেমন চুপ মেরে গেল। ওরা সহজেই নৌকোটাকে নামিয়ে, দাঁড় খুঁজতে লাগল।

"ও দাদা, এ কিসের মেশিন? মটরবোট নাকি? তবেই খেয়েছে! ফটফট করে নোটিস দিতে-দিতে এগোবে। সঙ্গে-সঙ্গে নদী-পুলিশ পেছনে লাগবে, কী সব্বনাশ এ কি তাদেরই চিহ্ন দেওয়া! শেষটা চোর বলে ধরবে না তো? আমরা এর মধ্যে নেই।"

ফরসা লোকটা ব্যস্ত হয়ে উঠল, "আহা, এই সাহস নিয়ে তোরা সাগরে পাড়ি জমাবি? ওটা আমার সাইন। নিজের তৈরি নকশা। অকেজো ডুবো-নৌকো নিজের খরচায় যে তোলে তার হয়। আমি ডুবুরির কাজ জানি। নইলে হাঙর আমার নাগাল পেল কী করে? কাজ করতে হলে প্রাণ হাতে নিয়ে করতে হয়। নইলে যা গিয়ে ঠাকুমা'র খাটের তলায় সেঁদো!"

ওরা যে-যার জায়গায় বসে পড়ে বলল, "কথায় কথায় অত চটো কেন? ভালমানুষ কি তা করে?"

লোকটা বলল, "ভালমানুষদের আমি ঘেন্না করি। নইলে তোমাদের সঙ্গ ধরি? সিটের তলায় দাঁড় আছে। মিছিমিছি তেল খরচ করা নয়। বাড়তি টিনও নিয়েছি, কিন্তু অনেক দূর যেতে হবে। অনেক-অনেক দূর, সবার নাগালের বাইরে। মটর চালাবার দরকার হলে আমিই চালাব, এই এক হাতেই। আর কথা নয়।"

জলের একঘেয়ে ছলাত-ছলাত শব্দে জোয়ারের সঙ্গে লড়তে-লড়তে ওদের এগোনো। ফরসা লোকটা হাল ধরে থাকল। তার ক্লান্তি নেই, ঘুম নেই। তারপর যেই ভাটা লাগল,তরতর করে স্রোতের সঙ্গে নৌকো ভেসে চলল। তখন ওদের ঝিম ধরতে লাগল। ফরসা-দাদা ডেকে বলল, "ওভাবে ঢুললে কখন জলে-পলে ঠেকাচ্ছে কে? এ-নৌকোতে একফোঁটা জল ওঠে না। তলাকার ওই দড়িদড়াতে মাথা রেখে একটু ঘুমিয়েই নে না। আমি সামাল দিচ্ছি। কাল আবার বড় পরীক্ষা আছে।"

শোওয়া আর ঘুম। এমনি করে রাত কাবার। পাড়ির সঙ্গে একসময় ধাক্কা লাগাতে দুজনে উঠে বসল। পুব দিক ফিকে হয়ে গেছে। পাখিরা ডাকছে। ওদের কী দুঃখ। "ইশ্‌! সোঁদরবনের দেখা পেলাম না। শুনেছি বাঘে গঙ্গাস্নান করে।"

ফরসা লোকটা বলল, "কী ঘুম রে বাবা! মটরটা চালালেও জাগলিনে। অবিশ্যি ছাইলেন্‌ছার লাগানো আছে। এ-বন একেবারে নিরামিষ। যা গে, সব কাজ সেরে আয়। তারপর জলযোগ করতে হবে না? স্যাঙাতরাও এ এসে পড়বে।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে নদীর ধারে ঘাসের ওপর ফুরফুরে হাওয়ায় বসে রুটি-মাখন, ডিম-সিদ্ধ, চিড়ের মোয়া আর ফ্লাস্ক থেকে ঢালা ঠাণ্ডা চা খেয়ে ওদের প্রাণ জুড়োল। সেই ফাঁকে ফরসা মানুষটা ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিল।

এমন সময় দূর থেকে একটা দোয়েল পাখির শিসের মতো শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দাদার ঘুম ছুটে গেল। সে-ও উঠে দাঁড়িয়ে ঠিক তেমনি সুরে শিস দিল। এবার ঝোপঝাপ সরিয়ে দুজন সুন্দরমতো ছেলে এসে উপস্থিত হল। ওরা দুজনেই অমনি সজাগ। এভাবে মনের মতলব যার তার কান করা তো বুদ্ধির কাজ মনে হচ্ছে না। যদি সঙ্গ ধরে। হলও তাই। দাদা বলল, "ওহে লালু-ভুলু, এরা হল চম্পু-বকু। ভয় নেই। আমাদের দলের লোক। পাঁচজন না হলে বড় বোট সামাল দিতে পারব না। বলছে নাকি ঝড়ের সঙ্কেত দিয়েছে। তবে সে এখনও অনেক দূরে আর কোন পথে যাবে, তার ঠিক নেই। কোথায় রেখেছিস্‌ সেটাকে?"

বাবা! চম্পু-বকুর গায়ে কী মাস্‌ল্‌। যেন দুটো ষণ্ডা পালোয়ান, মঞ্চে দাঁড়ালেই হাততালিতে কানে তালা লাগবে। ফরসা-দাদা গর্ব করে বলল, ওরা দুজন নাকি ডুবুরির কাজ শিখে সার্টিফিকেট পেয়েছে। সমুদ্রের একটা বিশেষ জায়গা থেকে মুক্তোর ঝিনুক পর্যন্ত তুলেছে। এমন করে দাদা কথা বলছিল যে, ওদের পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল। যেন ওরই বাপ-ঠাকুর্দার বাহাদুরি! ঠিক যেন ওদের মনের কথা বুঝতে পেরে, ফরসা লোকটা একটু হেসে বলল, "ওদের গাঁয়ে আমি মাঝে-মাঝে যাওয়া-আসা করি কিনা, আর নিজেও এসব করেছি এককালে, তাই ওদের ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্তটা করতে পেরেছিলাম..."

যেন করতে পেরে কেতাত্থ হয়েছে! ওরা কিন্তু কথাগুলো একটুও গায়ে মাখল না, "আরে রাখো, খুড়ো। শিখতে পেরে আমরা বর্তে গেছি। কী খাওয়াবে বের করো।"

ওই ঠাণ্ডা চা রুটি মাখন ডিম-সেদ্ধ খেয়েও ওরা আহ্লাদে আটখানা।

"বলেছিলে যে ঝোলা গুড় দিয়ে বাসী লুচি খাওয়াবে খুড়ো?" ফরসা লোকটা এখন অন্য মানুষ। হেসে বলল, "মাঝসমুদ্রে তাই দিয়ে নাস্তা হবে। আর দেরি নয়। এবার রওনা দেওয়া যাক।"

॥ ৫ ॥

চম্পু-বকু একটা মাছ ধরার নৌকোতে জাল, ছিপ ইত্যাদি এনেছিল। এমনকী, খালি টিনে কেঁচো, পিঁপড়ের ডিম ইত্যাদিও ছিল। ওদের মুখ দেখে ফরসা-দাদা বলল, "আহা, দল বেঁধে মাছ ধরতে যাওয়া হচ্ছে আর তার সরঞ্জাম নেব না? তোমরা দেখছি বুদ্ধিতে বালখিল্য মুনিদেরও হার মানিয়েছ।" শুনে লালু-ভুলু মনে একটু দুঃখ পেল। তাদের রূপগুণ, টাকাকড়ি, বংশগৌরব না থাকলেও, ধারালো বুদ্ধির একটু গর্ব ছিল। নইলে স্যারই বা ওই অত বেকার যুবকের মধ্যিখান থেকে ওদেরই বেছে নেবেন কেন? হ্যাঁ, তবে এটা বলা যায় উনি খোলাখুলিভাবেই বলে দিয়েছিলেন যে, মেলা বিদ্যেদিগ্‌গজ ভদ্র চৌকশ লোক তিনি চান না। তাঁর দরকার সাহসী এবং চতুর আর সবার উপর চোরছ্যাঁচড় টাইপের চেহারার লোক, যাদের দেখে বরং একটু ন্যালাখ্যাপা, আনাড়ি প্যাটার্নের মনে হবে। এসব গুণ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে একশো উমেদার, যারা অবিশ্যি কেউ কাউকে দেখেনি, তাদের মধ্যে ওদেরই বা বাছাই করে নিলেন কেন? এখানে বলা উচিত, ওদের মনে যে এত কথা ঝড়ের মতো বইছিল, মুখ দেখে তার বোঝার জো ছিল না। একেই বলে নেই-মানুষ।

চম্পুরা তাদের নৌকোতে আর ফরসা-দাদার সঙ্গে লালু-ভুলু তাদের বোটে আড়াআড়িভাবে নদী পার হয়ে, একটা জংলামতো জায়গায় ঝোপঝাড়ের আড়ালে নৌকো লাগাল। দাদা একবার বলেছিল, "তোদের জেলে-গাঁ থেকে কিছু শুকনো খাবারদাবার কিনে নিলে ভাল হত না? আমার নৌকোতে বেশি কিছু নেই। ট্যাংকি ভরে জলও তো নিতে হবে। ওই বেলে দ্বীপগুলোতে যদি বা জল থাকেও, তা সে নোনা লাগে।"

ওরা বলল, "আমাদের গাঁয়ে লুকিয়ে একটা পান কেনাও যা, ঢাক বাজিয়ে ঢ্যাঁড়া পিটোনোও তাই। গোপন বলে কিছু নেই, সবার কথা সবাই জানে। জানোই তো রোজ ভোরে একটা ইংরেজি খবরের কাগজ আর একটা বাংলা কাগজ আসে। বড়মাস্টার কেনেন। আর সন্ধ্যার মধ্যে তার সব খবর সকলের জানা হয়ে যায়। মায় বিজ্ঞাপনের তালিকা পর্যন্ত। তাইতেই তো ।"

এইখানে খুড়ো ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে বলল, "বেশ, বোম্বেটেদের গাঁ থেকেই যা দরকার নেওয়া যাবে। কী রে, তোরা বুঝি ওই নাম শুনেই ঘাবড়ে যাচ্ছিস? আরে, নামেই বোম্বেটে। তিনশো

বছর আগে হয়তো সত্যি সত্যি তাদের আস্তানা ছিল, এখন খুব মাছ আর মুরগির ফলাও ব্যবসা। বোম্বেটেদের বংশধররা পোষ মেনে গেছে। সাবধান না হলে একটু ঠকায়, এই যা।"

চম্পু-বকুও হেসে বলল, "জেতের ধারা, কী করবে?"

লালু-ভুলু বোকা সেজে রইল। একটা কিছুর জন্য যে অপেক্ষা করা হচ্ছে, এটুকু তাদের মালুম দিচ্ছিল, তা বোকাই হোক আর যাই হোক।

তখনও খুব একটা বেলা হয়নি, একটা বেশ বড় বোট ফট্‌ফট্‌ করতে করতে তীরের কাছে নোঙর ফেলল। বোঝা গেল, এখানে জল তত গভীর নয়। বোটটা যাবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছিল। একটা নামকরা কোম্পানির বোট। গভীর জলে মাছধরার জন্য ভাড়া খাটে। ছ'সাতজন লোক সহজেই ধরে যায়। বোটের চালকের সঙ্গে খুড়োর যে দু'চারটে কথা হল, তাতে বোঝা গেল, এইরকম কয়েকটা বোট রাজ্য সরকারের গভীর জলে মাছ ধরার প্রকল্পের কাজে লাগানো হয়েছিল। সেও একজন কর্মী ছিল। দুঃখের বিষয় অমন ভাল প্রকল্পটা চলেনি, ওদেরও অস্থায়ী চাকরি খতম হয়েছিল। কিন্তু বড়ই মনের মতো কাজ। কতরকম চাঞ্চল্যকর ঘটনা, অদ্ভুত অভাবনীয় দৃশ্য, আবার ক'দিন বাদেই ঘরে ফেরার সুখ। এমন না হলে জীবন উপভোগ করা না ছাই! বলেই চকচকে চোখে বলল, "তা আপনাদেরও মাছ ধরার শখ, কোম্পানির ম্যানেজার বললেন। আমরা স্যার ওনাদের বারোমেসে চাকরে নই। যাকে বলে ফালতু কর্মী, খুচরো খাটি। নেবেন নাকি সঙ্গে? বোট চালানো আর মেরামত বিষয়ে জানতে কিছু বাকি নেই। হাতের তেলোর মতো ভারতমহাসাগর চিনি। শস্তায় যাব স্যার, থাকা-খাওয়া আর ট্রিপ নিরাপদে শেষ হলে একশোটি টাকা। সার্টিফিকেট আছে, দেখাতে পারি। জামিরালি কাউকে কখনও ঠকায় না। যেই শুনেছি একটু দূরে যাবার ইচ্ছা, পরানটা আনচান করে উঠল। ফ্রেজারগঞ্জে বাড়ি স্যার, রক্তের মধ্যে সমুদ্রের হাওয়া। কী বলেন? এঁয়ারা তো আমাকে চেনেন।" বলে চম্পু ও বকুর দিকে চাইল।

কী আর বলব, ওই অত বড় মানুষটা বেড়ালছানার মতো করুণ মুখ করে তাকিয়ে রইল।

চম্পু-বকু বলল, "খুড়ো, জমিরচাচার কাছে আমাদের হাতেখড়ি। ও সিরেফ একটি রত্ন। বোটের কাজের, মাছ ধরা বিদ্যের বিষয় জানে নিত্য খোলে। জেলেদের গাঁ থেকে দূর দিগন্তের দিকে তাকানো যায় না, জলের ওপর রোদ চিকচিক করে, চোখে ধাঁধা লেগে যায়। চোখ বুজলেই মনে হয় ওই বুঝি বড় বড় জলজন্তু মাথা তুলল। জেলেরা জানে বড় জলজন্তু কখনও ডাঙার এত কাছে আসে না। যতটা জলে বেমালুম ডুব দিতে পারে, সেই অবধি ওদের দৌড়। কম জলে ভরসা পায় না। মোহানার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত জল বেশি গভীর নয়, তাই কত সময় চড়া পড়ে নতুন দ্বীপ জেগে ওঠে। সে-সব বড়ই অস্থায়ী, তার তুলায় ভিত নেই। হয়তো বড়-বড় নদী যুগের পর যুগ ধরে রাশি রাশি বালি ঢেলেছে, সেই সমস্ত জমে জমে ঢিবি হয়ে না এমন কিছু নেই। আমরা হলাম মামুলি আনাড়ি নাবিক, আর ও হল পাকাপোক্ত। তুমি যাই বলো, তোমার দৌড় আমাদের জানা আছে। মনে নেই সেবার !"

চোখ পাকিয়ে খুড়ো বলল, "চোপ!"

লালু-ভুলুর দুঃখ লাগল, আহা, মানুষটার প্লাস্টিকের হাত! তাই শুনে খুড়োসুদ্ধু ফিক্‌ করে হেসে ফেলল। "প্লাস্টিক না আরও কিছু!"

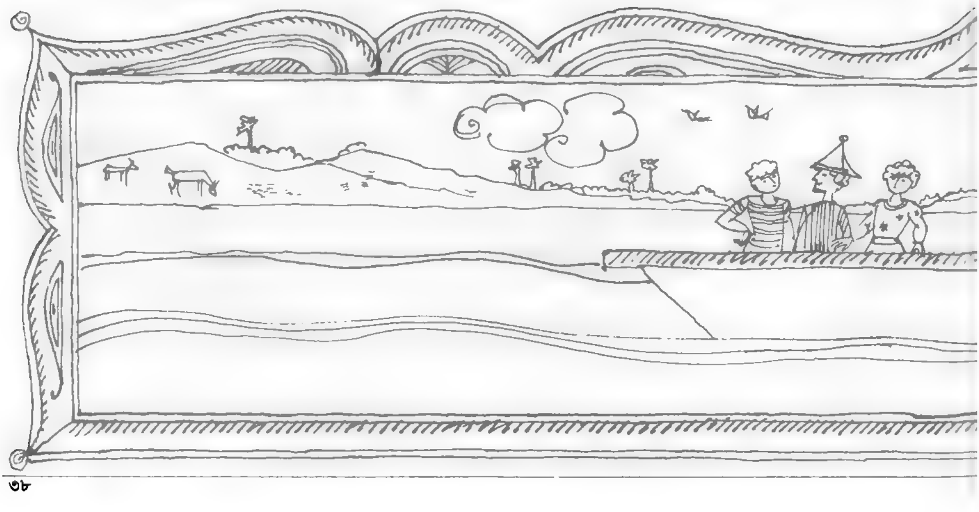
খুড়ো মুচকি হেসে লালু-ভুলুর পিঠ চাপড়ে বলল, "কিছু মনে করিসনে ভাই, ওই একটু রোমাঞ্চ করি। দেবতা যা চেহারা দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছে, কবে না লোকে ছুঁচো বলে ভুল করে!"

লালু-ভুলু গলে গেল, "না, না, তাতে কী হয়েছে দাদা? আমাদের তো খ্যাঁকশেয়াল বলে অনেকে ডাকে।"

খুড়ো খানিক ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা, আমাদের ওইসব ডাকে বলে দোষও দেওয়া যায় না ভাই। আয়নায় তো দেখি। তবে আমাদের ব্যবসায় ওইটাই মূলধন, কী বলিস?"

খুব হাসল তিনজনে।

ততক্ষণে বাকি তিনজন বোটের আগাগোড়া পর্যবেক্ষণ করে; জল, রসদ, ওষুধপত্র, মেরামতি দ্রব্যাদি, লাইফবেল্টের অবস্থা, দূরবিন, সার্চলাইট, অন্যান্য যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র (বাদে গুলি বন্দুক, কারণ মাছ ধরার পারমিটে সে-সব বে-আইনি বলে লেখা) কাপড়চোপড়। দুটো ডুবুরির সাজ, অর্থাৎ মুখোশ, হাঁসে-পা, হাওয়ার নল ইত্যাদি বোটেই মজুত থাকে। বোধহয় মেছোরা কেউ উৎসাহের চোটে কিংবা মাছের টানে গভীর জলে পলে তাকে যাতে তোলা যায়। খুড়োর আর



জমিরআলির দুজনারই এ-কাজ জানা। চম্পু-বকুও নেহাত মুখ্যু নয়। লালু-ভুলু মুখ চুন করে সব শুনছে দেখে তাদের খারাপ লাগল। পিঠ চাপড়ে বলল, "খুড়ো বলেছে, চামচিকে-শরীরে তোমাদের সিংহের বিক্রম। সেইটেই বড় কথা।"

আর দেরি নয়। জমিরালির শাগরেদরা ছোট বোট আর যার-যা পাওনা নিয়ে কোম্পানিতে ফিরে গেল আর গভীর জলে মাছ ধরার পার্টি কেমন বোটের মাথায় তেরঙ্গা পতাকা উড়িয়ে সাগরযাত্রা করল, তাই দেখতে বালির ওপর লোকে লোকারণ্য। যেন মেলা বসেছে।

যারা ভিড় করে নৌ-যাত্রা দেখছিল, তাদের মধ্যে কিছু তীর্থযাত্রী আর ভ্রমণকারী থাকলেও, বেশির ভাগই স্থানীয় লোক। তাদের প্রায় সকলেরই নির্ভর হল জলের ওপর। একরকম বলা চলে সমুদ্রই ওদের খাওয়ায়-পরায়। তাই সমুদ্রকে ওরা ভয়-ভক্তি করে, ভালও বাসে। রোজ প্রথম ধরা মাছটি জলে ছেড়ে দেয়; প্রতি বছর প্রথম ফসলের একমুঠি সুগন্ধি চাল, প্রথম পাকা ফলটি জলে উৎসর্গ করে। ঢেউয়ের সঙ্গে সে ফল ফিরে আসে, মাছে খায়, পাখিতে খায়। তার চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে?

ভাটার টানে বোট তরতর করে এগিয়ে চলে; ফুরফুর করে দখনে হাওয়া বয়; পতপত করে নিশানটা ওড়ে। জমিরালি চালকের সিটে বসে থাকে। খিচুড়ি, মাছ ভাজা খেয়ে ওরা রওনা হয়েছিল। খুদে ক্যাবিনে নীচে দুটি বেঞ্চিতে দুজন, তার ওপরের তাকে সাবধানে দুজন, মোট চারজন শুয়ে থাকতে পারে। রাজ্যের ঘুম লালু-ভুলুর আর খুড়োর চোখে চেপে বসল। ভুলু খচমচ করে ওপরের বাংকে লম্বা হল। আঃ, কী আরাম! কাঠের খুদে মই বেয়ে চম্পু এসে ওদের তিনটে বড়ি খাওয়াল। ওরা কি খেতে চায়! "খাও, নইলে বড় জলে আর একটু এগোলেই ঢেউয়ের মাথায় বোট চড়ে নাচবে আর অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবার চেষ্টা করবে। দেখলে না ঝড়ের সঙ্কেত দিয়েছে।"

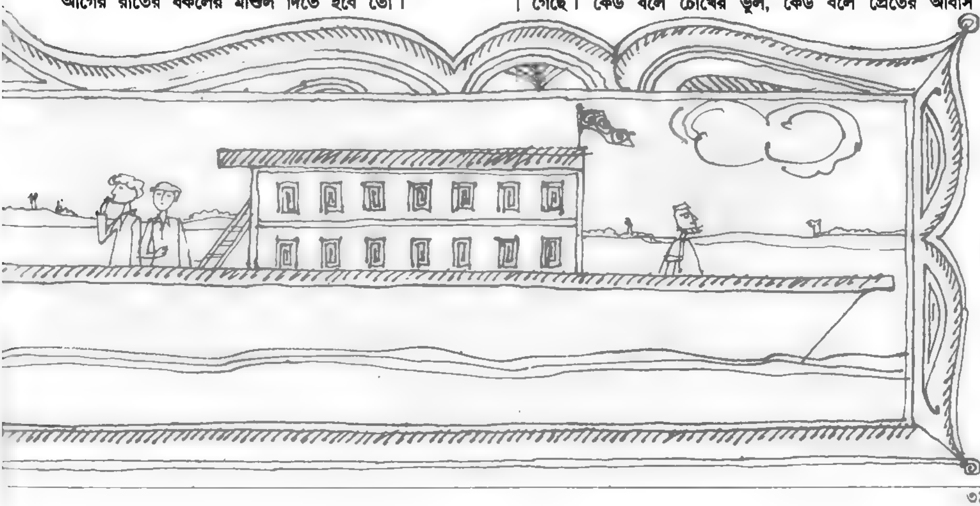
খুড়ো বলল, "সে তো রোজই দেয়। ঝড় তো হয় না।"

"ঘূর্ণিঝড়ের দিক পালটায় কি না, তাই অমন হয়। আজ দেখে এলাম ব্যারোমিটার একটু করে নামছে।" সে আবার কী চিজ কে জানে। আকাশ তো রোদে ভরে আছে। তারপরেই গভীর ঘুম। আগের রাতের ধকলের মাশুল দিতে হবে তো।

॥ ৬ ॥

এ-সব দিকে চম্পু-বকু মাছধরার নৌকোর সঙ্গে শতবার এলেও এর নতুনত্ব যায় না। ডাঙার মানুষরা সাগরকে বলে একঘেয়ে, দেখবার কিছু নেই। কিন্তু জলের ছেলেদের কাছে এর হাজার রূপ আছে। লোকে বলে দ্বীপ। তাই নিয়ে দেশে দেশে ঝগড়াবিবাদও হয়। হয়তো লম্বা লম্বা ঘাস হল, নলখাগড়া জন্মাল। জনাকয়েক লোক রোগা রোগা গোরু ছাগল নিয়ে চরাতে এল; রাতে থাকার জন্য চালাঘর তৈরি হল। কাঠকুটো ভেসে পাড়ে লাগল ও তাই জমা করে রাখা হল, উনুন ধরাতে কাজে লাগল। জলে ভেজা কাঠ যত শুকনো হয়, ডাঙার কাঁচা কাঠ ততটা শুকোতে সময় নেয়।

জাতে সব জেলে, মাছ ধরাই ব্যবসা। দড়ি টাঙিয়ে দেয় সারি-সারি, শুঁটকি মাছ হয়। ভাল করে শুকোলে ঘাসে জড়িয়ে মাছ ধরার নৌকোয় গাঁয়ে পাঠিয়ে দেয়। জেলে বউরা তাই দিয়েই অমৃত রাঁধে। লালু-ভুলুর কাছে খুড়ো এ-সব গল্প করল। তবে আজকের অভিযান এ-সব চড়া ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে, যেখানে সত্যিকার ডুবো-পাহাড়ের চুড়ো জল থেকে মাথাটুকু তুলে দ্বীপ সেজে থাকে। হঠাৎ হয়তো দেখা গেল চুড়ো দিয়ে ধোঁয়া দেখা যাবে; তার মানে বুকে আগুন জ্বলছে। কে জানে একশো বছর পরে একদিন হয়তো চুড়োর মাথা ফেটে গলন্ত পাথর বেরিয়ে আসবে। ততদিনে দ্বীপে লোকে বসবাস শুরু করেছে; ফুল-ফলের নন্দনকানন তৈরি হয়েছে। গুড়গুড় শব্দ শুনেই কে কোন্ দিকে পালায় তার ঠিক নেই। তবে এ-সব আগুন দ্বীপ-মোহানার এত কাছে আছে বলে শোনা যায়নি। এখানে ছোট ছোট বালি আর পাথরের পাহাড়ে দ্বীপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তবে বাসের অযোগ্য। তারই একটা থেকে দূর দিগন্তের সেই গাঢ় ছাই রঙের ছায়া দেখা যায়, খুড়ো সে-গল্প লালু-ভুলুর কাছে করে ভেবেছিল বুঝি চমক লাগিয়ে দেবে। দুনিয়াতে আজকাল অজানা বলতে আর কতটুকুই বা বাকি আছে? উত্তরমেরু - দক্ষিণমেরুর মধ্যিখানে পর্যন্ত পা বাড়িয়েছে। তবু এটা একটা রহস্যই থেকে গেছে। কেউ বলে চোখের ভুল, কেউ বলে প্রেতের আবাস



বদমায়েস মলে স্বর্গে না গিয়ে ওইখানে যায়।

এ-কথা শুনে চম্পু হেসে বলল, "নরকে দুষ্টু লোকদের বড্ড বেশি ভিড় কিনা, তাই আর জায়গা কুলোচ্ছে না।"

বকু হঠাৎ বলে বসল, "তাই বুঝি ? নরকে মসলাগাছ হয় ? ও দিক থেকে বাতাস বইলে তার সুগন্ধ নাকে আসে ?"

এ-কথা শুনে খুড়ো হঠাৎ বেজায় চমকে উঠে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। এই সময় জমিরচাচা একটু গম্ভীর মুখে এসে বলল, "যদিও এ-সব জায়গা সাধারণত ঝড়ের পথে পড়ে না, তবু ব্যারোমিটার এত নেমেছে যে, সন্ধ্যাবেলায় আর এগুনো বুদ্ধির কাজ হবে বলে মনে হয় না। তিন-চার দিনের রসদ আছে, এই দ্বীপে একটা ছোট ঝরনা আছে, ট্যাংক ভরে জল নেওয়া যাবে। না-হয় কাল সকালে গিয়েই দেখা যাবে ওটা স্রেফ মরীচিকা কি না। নইলে ঝড়ে পড়লে তল পাব না, কূল পাব না। জানতে পারি ওইখানে যাবার কোনও কারণ ঘটেছে কি না ? কোম্পানির স্যার বলছিলেন, তাঁর মনে হয় না এ আপনাদের শখের যাত্রা। সরকারের হাত আছে এর পেছনে। আপত্তি না থাকলে অবিশ্যি বলবেন না। আমরাও স্যার দেশভক্ত প্রজা ; দেশের জন্য যেটুকু করতে পারি তাতেই আমরা কেতাথ।"

জমিরালির ছাড়া আরও চার জোড়া কৌতূহলী চোখ রোগা ফরসা খুড়োর মুখের ওপর নিবদ্ধ। খুড়ো তো মহা অপ্রস্তুত। খানিক উসখুস করে বলল, "এ তো মহা গেরো। এমন তো হতে পারে, আমরা সেকালের বোম্বেটের গুপ্তধনের হদিস পেয়ে খুঁজতে এসেছি।"

চম্পু বলল, "না, হতে পারে না। কোথায় হদিস পেলে ?"

খুড়ো বলল, "আহা, এমন তো হতে পারে আমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের লোহার পেটির গোপন খোপে এক টুকরো তুলট কাগজে লেখা ছিল।"

"না হতে পারে না। তুমিই একশোবার বলেছ তোমার পূর্বপুরুষদের ঠিকানা জানো না। ছেলেধরারা তোমাকে ধরে এনে অনাথ আশ্রমের সামনে ফেলে গেছল।"

বকু বলল, "তা ছাড়া সেকালে তুলট কাগজ হত না। হলেও এতদিনে পচে যেত।"

তখন খুড়ো বিরক্ত হয়ে বলল, "এরা দেখি ছিনে জোঁকের বাড়া। আরে বাবা, তবে শোন্। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে অবধি এসব অঞ্চল নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। ব্রিটিশরা নাবিকের জাত, দুর্গম দ্বীপ-দ্বীপান্তরে ভেসে কী আনন্দ পেত দেবতা জানেন। বেশির ভাগ দ্বীপে থাকার জো নেই। কোথাও-বা কয়েক বার আদিম নিবাসী, কেউ কেউ মানুষ খায়। মোট কথা এ-সব নিয়ে কোনও ভাবনা করার ছিল না। লাভের গন্ধ না পেলে ওরা তাই নিয়ে সময় নষ্ট করত না। একটার চারদিকে আবার সমুদ্রের স্রোত ফিরেছে, কিংবা যে কারণেই হোক, তার চারদিক বেড়ে ত্রিশ-চল্লিশটা মারাত্মক ঘূর্ণিজল। ছোট দ্বীপ, উঁচু পাথুরে পাড়ি, বসবাসের চিহ্ন দেখা যায় না। খাতায় এটুকু লেখা আছে।

"কিন্তু ইদানীং সরকারের নিরাপত্তা বিভাগের গোপন তদন্ত ডিপার্টমেন্টে কিছু রিপোর্ট এসেছে যে, ওই দ্বীপের উপর দিয়ে একটা পথভ্রষ্ট হেলিকপ্টরের চালক বলছে সন্ধেবেলায় নাকি ছোট ছোট আলো জ্বলতে দেখেছে। হয়তো বাসিন্দা আছে ওখানে। তাদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে একটা বিশেষ সংবাদসংস্থা আমাকে পাঠিয়েছে। এবার হল তো ?"

ওদের যদি কিছু বক্তব্য থাকত সে আর বলার সুযোগ হল না। বাইরে ততক্ষণে একটা শোরগোল উঠেছে। গুমগুম শব্দ। বোট দোল খেতে শুরু করেছে। বাইরে এসে দ্যাখে জল অস্বাভাবিক রকম বেড়েছে, বোট ভেসে গেলেই তো হয়ে গেল ! ঠেলাঠেলি করে সবাই মিলে বোটটাকে বালির তালের উপর যতটা সম্ভব তুলে ফেলে, গাছগাছলা পাথরের খোঁচার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলে, নিজেরা পাথরের চুড়োয় কোনওমতে বেয়ে উঠে আশ্রয় নিল। বৃষ্টি নেই, এত হাওয়ার জোরও নয় যে, উড়িয়ে জলে ফেলবে। কিন্তু জলের স্রোত বেড়েই চলেছে যেন কিসের টানে, দূরের সেই গাঢ় ছায়ার দিকে। এখন অবিশ্যি সে সমস্তও আকাশ আব সাগরের সঙ্গে লেপে-পুঁছে একাকার। তার চেয়েও ভয়াবহ অদ্ভুত একটা গুমগুম শব্দ। লালু-ভুলু খুড়োর প্রত্যেকটি কথা মনের পটে লিখে নিচ্ছিল। এই জন্যেই তাদের আশা। ওই রহস্যময় দ্বীপ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আর খুড়োও কিনা সেই তালেই আছে। তবে কি তবে কি

এদিকে ভয়ে আর আবহাওয়ার থমথমে ভাবে, ওদের হাত পা অবশ হয়ে আসছিল। জলও ফুলে-ফুঁসে গর্জন করে একটানা স্রোতে সেই ছায়াটার দিকে বয়ে চলল। দ্বীপের এখন শুটুকু ভেসেছিল। ওরা তাতে আঁকড়ে ছিল আর নৌকোটা একটু নীচে ক্রমাগত পাথরে আছাড় খাচ্ছিল।

॥ ৭ ॥

সারা দিনটা ওইভাবেই কাটল। থমথমে আকাশ, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস, দূরে একটা গোঁ-গোঁ শব্দ। অনেক দূরে যে প্রলয়কাণ্ড ঘটছে, তাতে কারও মনে সন্দেহ নেই। সমুদ্রের জল যতই ফুলে-ফেঁপে উঠুক, দ্বীপের চারদিকের ওই স্থির জলের গভীরতা বাড়ে না। তার বাইরের উঁচু পাথুরে পাড়ি ডিঙিয়ে আজ পর্যন্ত বানের জল ওই খালের জলের নাগাল পায়নি। সে যেমন মিষ্টি, তেমনি মিষ্টি। অন্তত সবাই তো তাই বলে।

বাইরে যত তাণ্ডবই চলুক না কেন, নিচু পাহাড়ের গায়ে ছাগলগুলো চরতে লাগল, ছেলেমেয়েরা দৌড়ঝাঁপ খেলতে লাগল আর গিন্নিরা যে কতবার গাঁয়ে নেমে যে যার বাড়ির কাজ সেরে এল, তার ঠিক নেই। এমনকী, ঘরে-ঘরে উনুন জ্বলল ; দুপুরের রাঁধাবাড়াও হল ; তারপর হাঁড়ি-সরায় খাবার বেঁধে নিয়ে পাহাড়ের গুহার সামনে খাওয়াদাওয়া সারাও হল। ঝরনা থেকে জল তুলে বাসন মাজাও হল। কোথাও কিছু নেই, তবু কী জানি কেন মনের মধ্যে সাবধানের ঘন্টা বাজছিল, তাই জিনিসপত্র আর কেউ নীচে নামাল না। বরং যাতে গুহার মধ্যে রাত কাটাতে পারে, তাই যে-যার বালিশ চাদরও বগলে করে নিয়ে এল।

তবু আকাশ-বাতাসের কোনও পরিবর্তন নেই। গাঁওবুড়োদের সর্দার সকলকে নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মেঘে-ঢাকা আকাশের দিকে চেয়ে, এতদিন তাদের সুখে রাখার জন্য দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাল, আর ভবিষ্যতের জন্য দয়া ভিক্ষা করল। বুড়োরা অনেকে বলাবলি করছিল যে, ওই শেষের কথাগুলো না বললেই চলত। দেবতাকে কি তার কাজ শেখাবার দরকার আছে ? আজ পর্যন্ত তো সে কোনও বিপদের জানান দেয়নি। এই অবধি শুনে, বড় মাস্টার আর থাকতে না পেরে বলল, "এক যদি তিনমাস আগের সেই মস্ত কালো পাখিটাকে আগুনের নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে আর গর্জন করতে করতে, উড়ে যাওয়াকে বিপদের সংকেত বলা হয়। অবিশ্যি অনেকদিন আগেও আমার বাবার আমলে একটা ওইরকম কালো পাখিকে আকাশের অনেক উঁচুতে উড়ে যেতে দেখা গিয়েছিল বলে শোনা যায়। তার কোনও কুফল ঘটেনি। সবটাই বানানো গল্পও হতে পারে। বাবাই এইরকম লিখে গেছে।"

ছেলে-ছোকরারা ভারী মজা পেল। ওই যে বুড়োদাদুর কাছে শোনা আরব-সদাগরদের গল্প সে তো আরও রোমাঞ্চকর। "ইশ্, এ-দ্বীপটা বড় ছোট, বড় চাপা। সকালে বেরিয়ে তীর-বরাবর ঘুরে রাতের মধ্যে ফিরে আসা যায়! অথচ এর চারদিকে সাতটা মহাসাগর আছে। সাতটা মহাদেশ আছে।" বলা বাহুল্য, শেষের কথাগুলো বলেছিল জোয়ানদের সর্দার, বুড়ো-সর্দারের দুরন্ত নাতি রাকেশ। গাঁওবুড়োরা চমকে উঠেছিল, "তুমি অত জানলে কী করে? এসব তো তোমার জানার কথা নয়। মাস্টার ..."

রাকেশ বলল, "আমি যদি আমার সুবিধামতো সময়ে এসে পুথিপত্র দেখে যাই, মাস্টারের কী দোষ?"

মাস্টার খালি বলল, "তোকে অক্ষর চেনাল কে?"

"পৃথিবীর প্রথম মানুষকে যে শিখিয়েছিল।"

"তা হলে হয়তো দলের সবাই পড়তে জানে।"

"জানেই তো।" একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সর্দার বলল, "তাই এত অশান্তি।"

খালি মাস্টার খুশি হল।

বুড়ো-সর্দার বলল, "মনে অশান্তি তো, দুনিয়া অশান্ত হবে না?"

রাকেশের মাথা গরম হয়ে উঠেছিল, "কী যে বলো, দাদু! তুমিই বলো, বনের পাখি পায়ে বেড়ি বা খাঁচায় ভরা অন্যায়, আবার নিজেই আমাদের চোখ বেঁধে খাঁচায় ভরে রাখতে চাও?" কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মাস্টার বলল, "সব দিন যে একভাবে যায় না, সাগরের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ পাবে।"

বাস্তবিক কখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, কারও লক্ষ ছিল না। নিজেদের তুচ্ছ তর্কাতর্কিতে ডুবে গিয়েছিল। হঠাৎ কানে এল সমুদ্রের বোল বদলেছে। শোঁ-শোঁর বদলে কেমন গুমগুম করছে আর সেই আধো-অন্ধকারে যা দেখা যাচ্ছে, এরা জীবন কালে তা কখনও দ্যাখেনি। মিষ্টি জলের বাইরে, উঁচু পাড়ির মাথা টপকে সমুদ্রের ফেনা ছিটোচ্ছে! কারও মুখে কথাটি নেই। শেষটা অনেক কষ্টে, যেন অনেক দূর থেকে, কাঁপা-কাঁপা গলায় বুড়ো-সর্দার বলল, "আমাদেরই দোষ। অহঙ্কারের বশে ভেবেছিলাম, সময়কে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। পাপ ঢুকবার পথই রাখব না, তো সে ঢুকবে কী করে।"

তার গলা বন্ধ হয়ে এল। মাস্টার বলল, "দাদা, আমি বলি?"

ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছিল, "কখনও যা হয়নি, এবার তা হতে চলেছে! এ-দ্বীপও ভেসে যাবে, আমরা সবাই ডুবে মরব।"

মাস্টার হঠাৎ গর্জন করে উঠল, "চোপ্!" অমনি সব চুপ। নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করার অভ্যাস নেই তাদের।

মাস্টার বলল, "অত ভয় কিসের? এই ওম্ পাহাড় কখনও জলে ডোবে না, নীচে যত জলই জমুক না কেন। ওর মিষ্টি জলের ঝরনাও কখনও শুকোয় না। তাই যদি হত এমন সব বুড়ো বটগাছ এতকাল ছায়া দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, মানুষকে, পাখিকে বাঁচাত না। তা ছাড়া সাগরের ঢেউ যদি কোনও কালে পাথরের বেড়া না ডিঙোবে, তো আমরা এখানে এলাম কী করে? মুখে বাংলা ভাষা নিয়েই ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইনি নিশ্চয়? চারদিকের ঘূর্ণিজলের ফাঁক দিয়ে কোনও জেলে-নৌকোও গলে আসতে পারে না। যে-যার জায়গা বেছে নির্ভয়ে বোসো। একশো কুড়ি বছরের আগেকার গল্প শোনো।

"উত্তরে ওই যে মাঝে-মাঝে যেন মাঝ-আকাশে একটা কালো ছায়া ভেসে থাকে, ওইখানে আমাদের দেশ।"

এইখানে শ্রোতাদের কেউ কেউ কেঁদে উঠল, "তবে কি এই সুন্দর দ্বীপটা আমাদের দেশ নয়?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাও, এটাও। এও তারই টুকরো। দেশটা বিশাল, ভারতবর্ষ তার নাম। আমাদের অঞ্চলটা হল বাংলা, আমরা বাঙালি, বাংলাভাষায় কথা বলি। কী করে তিন পুরুষ আগে এখানে এসে পড়লাম, সে অনেক কথা। তখন ব্রিটিশ বলে বিদেশীরা আমাদের দেশ কেড়ে নিয়ে রাজত্ব করত। সেবার দেশের লোক খেপে গিয়ে বিদ্রোহ করেছিল। তা অস্ত্রশস্ত্র নেই, সেপাই-সান্ত্রী নেই, পারবে কেন? যারা বেশি দুর্ধর্ষ তাদের বন্দী করে মাঝ-সমুদ্রে আন্দামান দ্বীপের কয়েদখানায় পাঠানো হত। সেখানে অনেক ঠ্যাঙাড়ে, জোচ্চোর খুনেও বন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল।

"হঠাৎ একসঙ্গে এত বেশি নতুন কয়েদি আসাতে বড়ই জায়গা কম পড়েছিল। যতদিন না অন্য ব্যবস্থা হয়, ততদিন এদের একটা পুরনো খালি মালবাহী জাহাজের খোলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

"সেই সময় এইরকম নিদারুণ ভয়ংকর ঝড় উঠে, আকাশ, সাগর তোলপাড় করে, নোঙর ছিঁড়ে ঢেউয়ের মাথায় খোলামকুচির মতো অত বড় মালবাহী জাহাজটাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল। যদি মাল বোঝাই থাকত, তা হলে হয়তো বাতাসের মুখে পালকের মতো উড়ে এত দূরে পৌঁছতে পারত না। যদি জলের গভীরতা কম থাকত, তা হলেও কোনকালে কোনও ডুবো দ্বীপে আছড়ে টুকরো টুকরো হত। সেই পূর্বপুরুষ লিখেছিল যে, ডেকের ওপর যে-সব সায়েব পাহারাদার ইত্যাদি ছিল, ঝড়ের প্রথম ঝাপটাতেই তাদের ঝেঁটিয়ে জলে ফেলল। সাত দিন, সাত রাত সে ঝড় চলেছিল। ঘূর্ণিজলও ঢুকে গেছিল। তারই মধ্যে এতটা জল পেরিয়ে আমাদের এই ওম্ দ্বীপের পাথুরে দেওয়ালে আছড়ে পড়ে ওই জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং আশ্চর্যের বিষয় সঙ্গে সঙ্গে ঝড়েরও যেন দম ফুরিয়ে গেল। ক্রমে জল নেমে গেল। যারা বেঁচে ছিল, একে একে তাদের জ্ঞান ফিরলে, তারা দেখে ৭২৫ জন কয়েদির মধ্যে ২৫০ জন বেঁচে আছে। তাদের মধ্যে ১০০ জন মেয়ে এবং তাদের অধিকাংশ ছিল আইন ভঙ্গকারী এবং বিদেশী কিন্তু লেখক বলছে পাঠকরা বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, সেই ভয়ংকর সাত দিনে সকলের মন থেকে সব দুর্বুদ্ধি চিরকালের মতো মুছে গিয়েছিল। ওই লেখক আমার ঠাকুরদা'র বাবা।"

॥ ৮ ॥

গল্প শেষ করে চারদিকে তাকিয়ে মাস্টার দেখল, শ্রোতাদের তিন ভাগ স্তম্ভিত হয়ে হাঁ করে বসে আছে, বাকিদের অনেকে হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেঁদে ভাসাচ্ছে। খালি রাকেশের দল এক দৃষ্টিতে মাস্টারের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। একফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি, চারদিক খটখটে শুকনো। সমুদ্রের গর্জন থেমে গেছে। সে হয়তো আরও তিন পুরুষের মতো ঘুম দেবে। কিন্তু ওম্ দ্বীপের দুরন্ত ছেলেদের ঘুম চিরকালের মতো ছুটে গেছে। ওরা বড় বটগাছের তলায় যে-যার শুয়ে পড়ল। মন বলছিল ভোর থেকে কাজে লাগতে হবে।

শোওয়া আর ঘুম। এক ঘুমেই রাত কাবার। ভোরে উঠে দেখে আকাশ ঘন নীল; পুবে সূর্য বেশ খানিকটা উঠে গেছে; সমুদ্রের জল আবার তার চেনা রূপ ধরেছে। কিন্তু ও কী? ওরা কি ঠিক দেখছে, নাকি গল্পের জাদু চোখে লেগে আছে? মনে হচ্ছে, যেন সমুদ্রের ধারের উঁচু পাড়ির উপর গোটাছয়েক সাদা সাদা কী পড়ে আছে! সে কি মানুষ, না ছাগল, না জলজন্তু? জ্যান্ত, না মরা? একজন যেন একটা হাত নাড়ল মনে হল। আর দেখতে হল না। দুদ্দাড় করে নিচু পাহাড়ের ঘাসে ঢাকা ঢাল বেয়ে ছেলের দল খালের ধারে এসে দাঁড়াল। মানুষই বটে।

ডাঙার ওপর বারো মাস চব্বিশ ঘণ্টা তলা-চ্যাপটা নৌকো বাঁধা থাকত। গাছের গুঁড়ি কুঁদে করা, দরকারমতো কাঠের গোঁজা

লাগানো। বলা বাহুল্য, এ-দ্বীপে ধাতব জিনিস তৈরি হয় না। তবে কিছু ছোট বড় লোহার বাসন, যন্ত্রপাতি, পেরেক, খোন্তা যত্ন করে রাখা ছিল। সম্ভবত আদি-আগন্তুকদের জাহাজের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন।

দেখতে দেখতে কাঠের শিশিতে, কৌটোতে নানা কোবরেজি আর ভাল ভাল টোট্‌কা ওষুধপত্র, তাঁতে-বোনা কাপড়ের ব্যান্ডেজ, বেতের ঝুড়িতে গুছিয়ে নিয়ে মেয়ের দলও এসে পৌঁছল। ওম্ দ্বীপে পুরুষদের-মেয়েদের কাজের ভাগাভাগি থাকলেও, মানে সবাই সমান। গায়ের জোরেও কেউ কম যায় না।

নৌকো ঠেলে জলে নামিয়ে ওপারে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। আগন্তুকদের বোটের কিছু ভাঙা টুকরো জলে ভাসছে, কিন্তু তারা নিজেরা বেঁচে আছে কি না, হঠাৎ দেখলে বোঝা যাচ্ছিল না। রক্তশূন্য সাদা মুখ, ঠাণ্ডা হাত পা, ভিজে সপসপে নীল গেঞ্জি-প্যান্টলুন পরা ; প্রাণের খুব একটা সাড়া নেই। মুখে কোনও কথা না বলে ধরাধরি করে এক-একজনকে এক-একটা নৌকোয় তুলে এপারে এনে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিতে না দিতে, গাঁওবুড়োরাও এসে পৌঁছল। তাদের মধ্যে বুড়োডাক্তারও ছিল। কিছু পাশ-করা কেউকেটা নয়, তবে সেই পুরনো জাহাজের সায়েব ডাক্তারের বংশধর বটে। সে তার বিদ্যের যতটা পারে তার ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছিল।

এখন আর কে সায়েব-ডাক্তারের, কে বাঙালি রাজদ্রোহীর, কে অজ্ঞাতকুলশীল খুনে-বাটপাড়ের বংশধর বোঝার জো নেই। চার পুরুষে সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। জাতি, কুল বলে কিছু নেই, সবাই সমান। সবাই বাংলা বলে।

তাই পাশ করাই হোক, চাই নাই হোক, গত সোয়া-শো বছর ধরে এই ডাক্তাররাই বাপের পর ছেলে দ্বীপের রুগিদের ভাঙা হাড় জোড়া দিয়েছে, ফিটের রোগ ভাল করেছে। বংশপরম্পরায় কোবরেজি করে এ ; তাদের হাতের ছোঁয়া লাগলেই নাকি কাঁকড়াবিছের চিমটির বিষ দূর হয়। অবিশ্যি সেই সঙ্গে কিছু পাতা কি শিকড় বেটেও লাগাতে হয়। রোগ সারানো কি চাট্টিখানিক কথা। বিষাক্ত সাপ নেই, হিংস্র জানোয়ার বলতে এক যদি রাগী পাতিহাঁস কি বদমেজাজি দিশি বেড়ালকে বোঝায়। এদের খাঁচাও নাকি সেই জাহাজের কাঠকুটোর সঙ্গে ভেসে এসেছিল। তবে যথেষ্ট খেতে পেলে এরাও রাগেটাগে না। কোবরেজ ওদেরও বড়ি খাওয়ায়।

কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম। মোট কথা, ডাক্তারের বাড়ির দুজন, কোবরেজরা তিন ভাই, সবাই আহতদের চিকিৎসা করতে এসেছিল। তাদের কথায় সকলের পায়ে গরম সেঁক দেওয়া হল। তার ফলেই হোক, কি দাঁত ফাঁক করিয়ে সামান্য পানীয় ঢালার ফলেই হোক, সকলেরই নাড়ি যেন একটু ধুকপুক করে উঠল। পাহাড়ের ঢালে যে মিষ্টি আঙুরলতা আপনি হয়ে থাকে, একটু যত্ন করে তার রস থেকে এই পানীয় তৈরি হয়। যেমন সুগন্ধ, তেমনি মিষ্টি। বড় ডাক্তার বলে এর এক ফোঁটা মুখে পড়লে মৃত্যুপথযাত্রীরাও মত বদলে ফিরে এসে, দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। সেই ওষুধ এদের গলায় ঢালা হল। কী আর বলব, সঙ্গে সঙ্গে নাড়ির জোরও বাড়ল। তখন ডাক্তার বলল, "যা গোড়ায় করা উচিত ছিল, এবার তাই করা হোক। ভিজে পোশাক ছাড়িয়ে শুকনো কাপড় পরানো হোক। বেশি নাড়াচাড়া কোরো না কিন্তু ; হাড়গোড় ভেঙে থাকতে পারে, বুকে-পেটে চোট লেগে থাকতে পারে। জামাগুলো এমনিতেই ছেঁড়াখোঁড়া, ওগুলো বরং কেটে খুলে ফেলো।"

তাই করা হল। ঘাসের ওপর পাশাপাশি শোওয়া ছ'টা মানুষের জামা খুলে ফেলতেই, তাদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়েস, সবচাইতে ফরসা, আর সবচাইতে রোগা যে, বুড়ো সর্দার তার গলায় কালো সুতোয় বাঁধা ফটিকের পুঁতিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে, তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কেঁদে বলল, "ওরে বাবা, তুই সত্যি ফিরে এসেছিস !" এই বলে একেবারে মুচ্ছো ! তখন অন্যদের সঙ্গে তারও চিকিৎসা করা ছাড়া গতি ছিল না। তবে গলায় ওইরকম কালো সুতোয় ফটিকের পুঁতি বাঁধা আরও দুজনের ছিল। সবচাইতে বয়স কম, সবচাইতে রূপ বেশি তাদের। চিকিৎসা চলতে লাগল, কিন্তু তারই মধ্যে দর্শকরা আশ্চর্য হয়ে এ-ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। ওরকম কালো সুতোয় ফটিকের পুঁতি গলায় পরে তো শুধু সর্দারের বাড়ির ছেলেমেয়েরা। পূর্বপুরুষের দান নাকি !

গাঁওবুড়োরা আর গিন্নিরা কেমন যেন থুম মেরে গিয়েছিল, যেন কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। কথায় বলে বাতাসের আগায় খবর ছড়ায়। একটু বাদেই উঠি-পড়ি করে রাকেশের মা আর ঠাকুমা ছুটে এসে, কাঠের পুতুলের মতো রুগিদের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বুড়োডাক্তার একবার মুখ তুলে তাদের দিকে চেয়ে বলল, "কচ্ছপের জান আর নাবিকের প্রাণ, দুই-ই সমান। শরীরের ওপর দিয়ে বড় বেশি ধকল গিয়েছে, নইলে মারাত্মক কোনও জখমের চিহ্ন দেখছি না। হ্যাঁ, তবে হাড়গোড় কিছু ভেঙেছে বটে। তাও গুরুতর কিছু নয়, বানের জল ভাসিয়ে এনে পাথরের ওপর ফেলে দেবে, তবু কিছু হবে না, এমন তো আশা করা যায় না।"

কে যেন বলল, "ওই বানই এদের ঘূর্ণিজল পারও করে দিয়েছে।"

বড় মাস্টার বলল, "ওসব রাখো, গলায় ফটিক বাঁধা দেখেও কি এই তিনজনকে চিনতে পারোনি ?"

এক গাঁওবুড়ো বলল, "অসম্ভবকে চেনা শক্ত।"

"অসম্ভব নয় তা হলে।"

চিনেছিল বুড়োরা সবাই। ওই হল সর্দারের আদুরে ছোট ছেলে চাঁদ। সতেরো বছর আগে যে বড় ভাইয়ের ওপর রাগারাগি করে, দেড় বছরের দুটি যমজ ভাইপোসুদ্ধ এক পূর্ণিমার রাতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তারা যে বেঁচে নেই, এ-কথা তখন সকলেই শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল। এক মাস তাদের জন্য সবাই শোক করেছিল। এ সব ঘটেছিল রাকেশের দলের জন্মের দু'বছর আগে। তাদের কিছু বলা হয়নি। রাকেশের মা-বাবাকে এর পর কেউ বড় একটা হাসতে দেখেনি। সবাই জানত এ-দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যাবার পথ নেই।

॥ ৯ ॥

আধুনিক জগৎ থেকে সোয়া-শো বছরের বেশি সময়, বিচ্ছিন্ন হলেও ওম্ দ্বীপের ডাক্তার কোবরেজদের ছোট একটা আস্তানা ছিল, তাকে খড়ে ছাওয়া খুদে একটা হাসপাতালও বলা যায়। ছিমছাম জায়গাটি, সামনে পিছনে ছোট-ছোট ফুলগাছের, শাক-সবজির বাগান ছিল। নিজেদের কুয়ো ছিল। তার জলে একটু ওষুধ-ওষুধ গন্ধ। লোকে বলত ওই জল খেলেই অর্ধেক রুগি সেরে ওঠে, এমনই তার গুণ। খোলামেলা লম্বা লম্বা দুটি ঘর, আলো-হাওয়ায় ভরা। ডালপালার খাটুলিতে তুলে যখন রুগিদের সেখানকার নেয়ারের ছ'টি খাটে পাশাপাশি এনে শোয়ানো হল, তখনই ওইসব প্রাথমিক চিকিৎসার ফল দেখা যেতে লাগল।

পালা করে মেয়েরা সকলের সেবা করবে, ওখানকার এই নিয়ম। বুড়ো-সর্দার আর তার বড় ছেলেকে সারাদিন বারান্দা থেকে নড়ানো গেল না। অনাবশ্যক কারও ভিতরে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। রাকেশ ব্যাপারটা সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে নিয়েছিল। তার গলাতেও ফটিকের পুঁতি বাঁধা থাকত। আজই কী মনে হওয়াতে সেটি খুলে রেখেছিল। ওই ছেলেরা দুজন তবে কি ওরই দাদা ? কী খাসা শরীর বানিয়েছে ! দেখে হিংসে হয়। মা, ঠাকুমা ঘরে ডিউটি দিচ্ছে। দাদারা ভাল হলে,

ওদের কাছে তালিম দিতে হবে। দুপুরে গাঁওবুড়োদের হুকুমে পাহাড় থেকে গেরস্থালি নামিয়ে, যে যার সংসারে আবার গুছিয়ে বসল। ছেলের দল জাল ফেলে খালের জল থেকে বোটের ভাঙা কাঠ-কুটো, কিছু বাসনপত্র, একটা কিসের তেল-ভরা টিন আর-একটা ছোট্ট স্টিলের বাক্স তুলে আনল। তা ছাড়া একটা ছেঁড়া রঙিন নিশানও ছিল। সন্ধেবেলা রাকেশের দল একরকম জোর করে বুড়ো-সর্দারকে ঘরে নিয়ে গেল। মা, বাবা, ঠাকুমা নাকি হাসপাতালেই শোবে।

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। এখানকার পরিষ্কার হাওয়া, পুষ্টিকর খাওয়া, ছাগলের দুধ, সেকেলে ওষুধপত্র, দক্ষ আদর-যত্ন আর অযাচিত, অপ্রত্যাশিত ভালবাসা পেয়ে অনাহূত আগন্তুকরা যতখানি আশা করা যায়, তার চেয়েও অনেক তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে এসে, দাওয়ার ওপর সারি সারি পা ঝুলিয়ে, হাসি-হাসি মুখ করে বসল। তাদের সামনেই চ্যাপ্টা পাহাড়, ঢালু গায়ে কত সুন্দর গাছ, কোনওটাতে আঙুরলতা, আর কোনওটাতে কিসের লতা বেয়ে উঠেছে। নাকে আসছে মিষ্টি গন্ধ। চম্পু আর বকু অমনি মাথা ঘুরিয়ে সেই লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা সুন্দর মানুষটির দিকে তাকাল। সেও সরে এসে ওদের মাঝখানে বসে বলল, "ওরে, আমাকে মা বলে ডাকিস। আমি সত্যি তোদের মা। আর ওই যে তোদের বাবা ; বুড়োমানুষ দুজন তোদের ঠাকুর্দা, ঠাকুমা। তোদের সঙ্গে চাঁদ এসেছে, সে যে তোদের কাকা তা তো জানিসই।" এই বলে মা, খুড়োকে দেখিয়ে দিল।

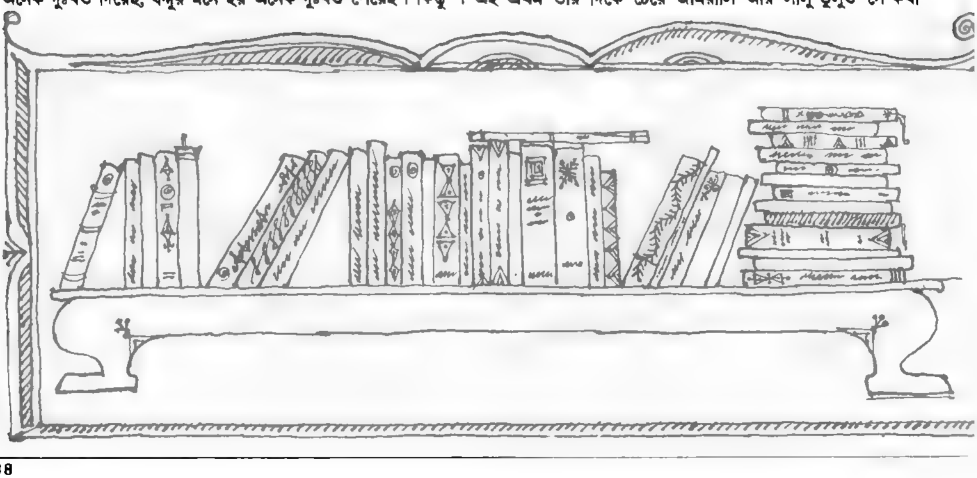
ওরা এমন চমকে উঠল যে, কী বলব। খুড়ো বলে ডাকে, তাই বলে সত্যি খুড়ো ? তাই ওদের নিয়ে এত ভাবে। ওর নাম যে চাঁদ, তা পর্যন্ত কোনওদিন বলেনি। মা আরও বলল, "যখন তোদের মুখে ভাল করে কথা ফোটেনি, তখন তোদের বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে, তোদের দুজনকে নিয়ে কী করে যে ওম্ দ্বীপ থেকে চাঁদ পালিয়ে গেছিল, আজ অবধি কেউ জানে না। আমরা জানতাম ঝড়ের ওপর চড়ে এখানে পৌঁছনো যায়। কিন্তু বেরোবার পথ কোথায় চাঁদ ছাড়া কেউ জানে না।"

কথাগুলো বোধহয় বুড়ো-সর্দারের কানেও গিয়ে পৌঁছেছিল। সে চাঁদের পাশেই বসে ছিল ; এবার তার পিঠে হাত রেখে বলল, "বাবা, তোমার বয়স এখন সাঁইত্রিশ বছর হয়েছে। সারাজীবন সবাইকে অনেক দুঃখও দিয়েছ, যদ্দূর মনে হয় অনেক দুঃখও পেয়েছ। কিন্তু একটা ভাল কাজ করেছ তাই তোমার সব দোষ কেটে গেছে। ভাইপো দুটোকে বড় ভাল করে মানুষ করেছ। আমাদের রাকেশ হতভাগা যদি তার অর্ধেকও হয়, সে-ই ঢের।"

খুড়োর দুটো পাঁজরা ভেঙেছিল, তখনও শক্ত করে বাঁধা ছিল। দু'দিন বাদে নাকি খোলা হবে। কিন্তু তাকে দেখে চেনে কার সাধ্য ? সে চিমড়ে চেহারা, মিটমিটে ভাব আর নেই। সতেরো বছর পরে আবার আদর-যত্ন পেয়ে তার রং খুলেছে, রূপ খুলেছে, বুকের ছাতি দ্বিগুণ হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে মাথায়ও যেন আরও উঁচু হয়েছে। সে একবার শ্রোতাদের দিকে তাকাল। পাহাড়ের গায়ে, মসলা গাছের ছায়ায় সব থরে থরে বসে পড়েছে। সেই ২৫০ জন আগন্তুক বেড়ে বেড়ে এখন হাজারের ওপরে দাঁড়িয়েছে। তারা ছিল নানান্ দেশের, নানান্ চেহারার, নানান্ ভাষাভাষী। এরা সবাই ফরসা, সবাই সুন্দর, সবাই বাংলায় কথা বলে, সবাই নিজেদের বাঙালি বলে। তার কারণ সবাই ওই ২৫০ জনের মধ্যে ১৭৫ জনই ভারতের নানা জায়গার লোক, বেশির ভাগ বাঙালি। আর প্রায় সবাই অল্পবিস্তর শিক্ষিত। এখানে সবাই সমান, সবাই সবাইকে 'তুমি' বলে। 'আপনি' শব্দের চল নেই। ওরা বলেছিল, 'দেবতাকেই বলি 'তুমি', আর মানুষকে বলব 'আপনি', ছিঃ !'

এ-সমস্ত কথা অবিশ্যি চাঁদই বলেছিল। ওম্ দ্বীপের লোকদের বাইরের জগতের বিষয়ে, যথেষ্ট কৌতূহল থাকলেও, সতেরো বছর আগেকার ঘটনাগুলো নিয়ে এতকাল এত জল্পনাকল্পনা চলেছিল যে, সেটি শোনার কারও ধৈর্য ধরছিল না। যত বোকা সেজেই থাকুক না কেন, চাঁদের আসলে অসাধারণ বুদ্ধি ছিল। তবে ওই বড় বেশি আদর পেয়ে পেয়ে, শেষটা এতটুকু বাধা সইতে পারত না। নিজের কথা ছাড়া কারও বিষয়ে ভাবতেও পারত না। সেই থেকেই ওর দুঃখের দিনের শুরু। এ-সব সে নিজেই বলল। আরও বলল, গিয়ে অবধি তার ফিরে আসার জন্য মন কাতর। ভাইপো দুটোর এতটুকু কষ্ট সইতে পারত না। নিজে চাকরি করে, খরচ দিয়ে, ওদের জেলে-গাঁয়ের সেরা ছেলে করে তুলেছে। সে-কথা পরে হবে।

সতেরো বছর আগে নিজের স্বার্থ ছাড়া সে কিছু ভাবত না। এমনকী, ভাইপো দুটোকে নিয়ে বাড়িসুদ্ধ সবাই নাচানাচি করে, দেখেও ওর গা জ্বলে যেত। রূপে-গুণে সে-ও কিছু কম যেত না। এই প্রথম তার দিকে চেয়ে জমিরালি আর লালু-ভুলুও সে-কথা



বুঝতে পারল। এখানে তারাও সকলের কাছে যে আদর-যত্ন পাচ্ছে জীবনে কখনও পায়নি। ততক্ষণে চম্পু-বকু-রাকেশের মা ওদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কানে কানে বলেছে, 'ভুলো না, আমি তোমাদেরও মা। আর ওই তিনটে যাকে বলে ঝুরিভাঙা বুড়ো ছেলে ময়লা রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছছে! মা কাকে বলে ওরা কেউ জানে না।

চাঁদ বলল, "বাবা আমাকে বড় মাস্টারের হাতে সঁপে দিয়েছিল। কারণ আমার মন সদাই পালাই-পালাই করত। এত ছোট, এত চাপা, এ-দ্বীপের চারদিকে একদিনে ঘুরে আসা যায়। এখানে আমার মন আঁটে না।" এই অবধি শুনে রাকেশ, কানু, ভানু প্রভৃতি মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে নিল।

চাঁদ তা দেখেও দেখল না। সে বলে চলল, "বড় মাস্টার আমাকে ছোট মাস্টার, মানে এখানকার বড় মাস্টারের কাছে গছিয়ে দিল। আমার অত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার কম্ম নয়। ছোট মাস্টার আমাকে চ্যাপ্টা পাহাড়ের গুহাঘরের পুরনো পুথি ঝাড়তে লাগিয়ে দিল। দেখলাম অনেক পুথিতে অদ্ভুত সব ছবি আঁকা। এখন বুঝি সেগুলো ম্যাপ; তার মানে পৃথিবীর ওপরে কোথায় কোন দেশ, তারই ছবি। গাছের ছালে ছাই গুলে ফিকে করে সমুদ্র আর গিরিমাটি দিয়ে ডাঙা এঁকেছে। তাই দেখে দেখে শেষটা মনে হল এ এই ওম্‌ দ্বীপের ছবি। তার চারদিকে পাথরের দেওয়াল। তার বাইরে সাগর। তার মধ্যে ছোট ছোট অন্য দ্বীপ আর ওপর দিকটা জুড়ে গিরিমাটি দিয়ে বড় ডাঙা আঁকা। মনে হল যদি কোনওরকমে ওই ঘূর্ণিজলগুলো পার হওয়া যায়, তা হলে বড় ডাঙাতেও হয়তো পৌঁছনো যাবে।

"রাতে আমরা দু'জন গুহাঘরের সামনে দখনে হাওয়ায় ঘাসের ওপর শুতাম। আমার কুস্তি-লড়া শরীর, আমার সঙ্গে তো আর ছোট মাস্টার পারবে না। একরকম জোরজার করে তার কাছে লিখতে পড়তে শিখলাম। সে গোড়ায় একটু গাঁইগুঁই করেছিল বটে; তারপর বলেছিল, যে লেখাপড়া শিখতে চায়, তাকে বাধা দেওয়া অন্যায়, তাই আমাকে শেখাতে রাজি হয়েছিল। সবচাইতে পুরনো পুথিতে চলে যাবার কথা নেই। এখানে থাকার কথাই আছে। কারণ ওদের সকলের যাবজ্জীবনের কারাদণ্ড। কর্তৃপক্ষ টের পেলে চাই কি হয়তো ফাঁসিই দিয়ে দেবে। তার চাইতে এই সুখের স্বর্গে জীবন কাটানো ঢের ভাল। পাছে কারও যেতে ইচ্ছে করে, তাই বাইরের জগতের কথা তাদের ছেলেমেয়েদের জানতে দিলে চলবে না। মুখে মুখে বাছাই করা গল্প বললেই হবে। মূর্খদের মন পোষ মানানো অনেক সহজ। খাবেদাবে সুখে থাকবে।

"দুঃখের বিষয়, একদিন ওপরের তাকের পুথি নামিয়ে, মনে হল পাথরে যেন একটা খাঁজ। সেটা গায়ের জোরে ঠেলতেই সরে গেল। ভিতরের খোপে সারি সারি খালি পিপে আর একটা ছোট লোহার সিন্দুক।"

॥ ১০ ॥

বাকিটা আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতো শুনতে লাগে। চাঁদ বলে চলল, "গোপন খুপরিতে কাঠের পিপে আর সিন্দুক থাকা মানেই আগেও এ-দ্বীপে লোক এসেছে। এখন বুঝি এটা বোম্বেটেদের একটা গুপ্ত-আস্তানা ছিল। তা হলে এখান থেকে বেরোবারও উপায় আছে। দেখলাম খুপরিটা একটা সুড়ঙ্গের মতো। আর-একটু এগিয়ে দেখি পেছনের দেওয়ালেও ছোট একটা ঘাসে ঢাকা ঘুলঘুলি মতো আছে। জানোই তো, চ্যাপ্টা পাহাড়ের ওই উত্তর দিকটা খাড়া। কেউ উঠতেও চেষ্টা করে না। আসলে ছোট-ছোট ধাপ কাটা আছে। আমরা যখন দ্বীপ চক্কর দিই, খালের ধারের সরু পথটা ধরেই ঘুরে আসি। এবড়োখেবড়ো ধাপগুলো চোখে পড়ে না। ঘুলঘুলিও আড়াল করা।

সব যেমন-কে-তেমন গুছিয়ে রেখে, পুরনো পুথিগুলোকে দেওয়ালের ফাটল থেকে একটু পাশে সরিয়ে রেখে, ফাটলের পাথর টেনে রেখে, সেদিনকার কাজ শেষ করলাম। পরদিন ভোরে তলার রাস্তা দিয়ে ওই জায়গায় এসে মনে হল, খালের গভীরতা এখানে কম। নীচে চ্যাপ্টা পাথর ফেলা। এক হাঁটু জলের ওপর দিয়ে ওপারে গেলাম। সামনে যে ঘূর্ণিটা ছিল, সেটাও যেন একটু ছোট। একটা তক্তা পড়ে ছিল। সেটা তুলে জলে ফেলে দিলাম, অমনি ঘূর্ণির সঙ্গে পাক খেতে লাগল। পাক খায় আর বাইরের দিকে সরে। শেষটা একসময় ঘূর্ণির জলই তাকে ধরে ছুঁড়ে পাক খাওয়ার বাইরে ফেলে দিল। আমিও দ্বীপ থেকে বেরোবার পথ পেয়ে গেলাম। আরও দুটো কাঠ দিয়ে পরখ করলাম।



"কথায় কথা বাড়িয়ে কী হবে ? আমিও একদিন ভোরে যখন সবে আলো ফুটেছে, তখন চটের থলিতে ভাইপো দুটোকে ভরে বুকের সঙ্গে বেঁধে, চামড়ার বোতলে জল ভরে কোমরে ঝুলিয়ে, আমাদের একটা ছোট কাঠের নৌকোতে দড়ি দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে, শুধু হাত দুটো খালি রেখে, দাঁড় দুটি ঠিক আছে কি না দেখে নিয়ে, হাতের সাহায্যে ঘূর্ণির কিনারায় নৌকো বাঁধা খুঁটিদুটো টেনে তুলে নিলাম।

"জলে পড়েই পাক খেতে লাগলাম। হয়তো আমাদের ওজনের কারণে নৌকো উলটোয়নি। এমনিতেই সবাই বলত আমাদের নৌকো এমনভাবে তৈরি যে, কখনও উলটোয় না। তবু অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম মনে হয়। যখন জ্ঞান হল, আমরা এত দূরে ভেসে চলে এসেছি যে, ওম্ দ্বীপ কখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। সামনে দুটি ছোট ছোট জনমানুষহীন দ্বীপ। বোধ হল ভারী জলে ডুবে যায়। আমাদের নৌকো তারই একটাতে লেগেছিল। থলির মধ্যে বাচ্চাদুটোর কী অবস্থা হয়েছে ভেবেও বুক কেঁপে উঠল। টের পেলাম, তারা নড়াচড়া করছে। দড়িদড়া খুলে, নৌকো থেকে অতি কষ্টে বেরিয়ে এলাম। শরীরটা যেন অচল, নৌকো টেনে যে ডাঙায় তুলতে হবে, তাও মনে হল না। বাচ্চাদুটোকে বের করতেই, তারা খিলখিল করে হেসে উঠল। ওম্ দ্বীপের ছেলে হওয়া চাট্টিখানিক কথা নয়। জল খেতে দিলাম। ফলও এনেছিলাম। তাই খেয়ে ওরা মহাখুশি হয়ে বালির ওপর খেলা করতে লাগল। আর আমি ? আমার মাথার মধ্যে সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। দাদার ওপর রাগ করে,ওর ছেলেদের আনার কথা তো বটেই,কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না আমরা কে, কোথা থেকে আর কেন এসেছি। ঠিক সেই সময় যদি দুটো সরু লম্বা জেলে-নৌকো সেখানে এসে না পড়ত, তা হলে যে আমাদের কী অবস্থা হত, তা জানি না। নৌকোটাও যে কখন ভেসে গেছিল, তাও লক্ষ করিনি।

"জেলেরা আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল, তার কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। খালি বললাম, 'মনে নেই।' ওরা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এক বুড়ো-মাঝি বলল, 'একে বলে সাগরের ঘোর লাগা। পরে আস্তে-আস্তে সবই মনে পড়বে।' ওরা আমাদের বড়-ডাঙায় নদীর মোহানায় নামিয়ে দিয়ে গেল। বলল, ওরা বড্ড গরিব, কারও ভার নিতে পারবে না। পারলে অমন চাঁদপানা ছেলে পেলে আমরা কৃতার্থ হয়ে যেতাম। বরং মোহানার জেলে-গাঁ'তে দিয়ে এলে ভাল হয়। ওদের অবস্থা ভাল, ইস্কুল আছে।

লজ্জার কথা আর কী বলব, শেষ পর্যন্ত তাই করলাম। ভাল করেই জেলেরা ওদের মানুষ করেছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। আমি পাঁচ বছর খেয়ে-না-খেয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ালাম। এর মধ্যে হঠাৎ পুলিশের ফাটকে বসে আগেকার কথা মনে পড়ে গেছিল। ছাড়া পেলে পুলিশকর্তার পায়ে কেঁদে পড়লাম, আমি গোয়েন্দা হব। দুষ্কৃতকারীদের বিষয়ে আমার মতো কেউ জানত না। ওরা অনেক পরখ করে আমাকে দেখে কাজে বহাল করেছিল। আর আমাকে ফিরে তাকাতে হয়নি। এবার আসলে একটা সরকারি তদন্তে জাহাজ নিয়ে এখানে এসেছিলাম। তা ছাড়া বারো বছরের মনের হাহাকার জুড়োতেও বটে। আর একটা কথাও বলি। ছেলেদুটোর খরচ আমি বরাবর দিয়েছি, সর্বদা খোঁজখবর রেখেছি।"

বুড়ো-সর্দার বলল,"সব তো বুঝলাম বাবা চাঁদ, কিন্তু একবর্ণ ইংরিজি জানো না, সরকারি চাকরি পেলে কী করে ? নাকি শিখে নিয়েছিলে ?"

চাঁদ আকাশ থেকে পড়ল। এরা জানেও না ভারত স্বাধীন হয়েছে। সায়েবরা কবে চলে গেছে। তারপর সেইখানে দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্প সংক্ষেপে বলল। প্রায় ঘন্টা খানেক লাগল। গল্প শেষ হলে অনেকক্ষণ সবাই চুপ। তারপর বুড়ো-সর্দার বলল, "তা হলে আমাদের ঠাকুর্দাদের আন্দামানে দ্বীপান্তর বৃথা যায়নি। তারা যা চেয়েছিল এতদিনে তাই হয়েছে। তাতে তাদেরও খানিকটা কৃতিত্ব আছে বলা যায়। ওই ছেঁড়া নিশানটাই কি স্বাধীন ভারতের নিশান ? কই দেখি।" এই বলে সেইটে হাতে নিয়ে বুড়ো চাঁদকে বলল, "এটা ওম্ পাহাড়ের চুড়োয় লাগিও। কিন্তু আগে বলো, হঠাৎ কিসের তদন্ত ? সবাই তো জানে এ-দ্বীপে জনমানুষ থাকে না ; চারদিকে ঘূর্ণিজল, আসা-যাওয়ার পথ নেই। তবু কেন সন্দেহ ? কিসের সন্দেহ ? তবে কি··· সেই যে দুটো বিশাল পাখি গর্জন করতে করতে ওপর দিয়ে উড়ে গেছিল, সেগুলো সত্যিকার পাখি নয় ?"

তখন উড়োজাহাজের কথাও বলতে হল। তারা জনশূন্য দ্বীপে আলো দেখে সরকারের কাছে জানিয়েছিল। তার ফলে সরকারি তদন্ত। পাছে এখানে কোনও চোরাকারবারিদের, কি বিদেশী শত্রুদের আস্তানা গড়ে উঠে থাকে।

"কী করে আসা-যাওয়া করবে তারা ?"

"কেন, হেলিকপ্টার বা ছোট উড়োজাহাজ আমাদের খেলার মাঠে স্বচ্ছন্দে নামতে পারে।"

দু'হাতে মুখ ঢেকে বুড়ো-সর্দার বলল, "আমাদের স্বর্গরাজ্য তা হলে ভেঙে পড়বে ?"

রাকেশের দল বলল, "তা কেন ? চোখে ঠুলি বেঁধে বসে থাকাকে কি স্বর্গবাস বলা যায় ? এখানে স্কুল-কলেজ হলে কি খারাপ হবে ?"

গাঁওবুড়োদের কেউ কেউ বলল, "বিনি পয়সায় ও-সব হয় না, বাছা। আমাদের কারও একটা কানাকড়িও নেই।"

তাই শুনে চাঁদ খুব হাসল, বলল, "তা না থাকতে পারে, কিন্তু ওম দ্বীপের রাশি রাশি টাকাকড়ি রত্নমানিক আছে। সব অসৎ উপায়ে পাওয়া। তাই দিয়ে স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল সব হবে। ছ'জন তৈরি মাস্টারও পাওয়া যাবে।"

গাঁওবুড়ো বলল, "আধ বুড়ো হতে চললে, তবু মসকরা করার অভ্যাস গেল না। কোথায় পাব মাস্টার বলতেই হবে।"

চাঁদ বলল, "কেন, আমি তাদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আর ধনরত্ন ? তাও আছে। চলো আমার সঙ্গে। কারও কাঁধে ভর দিয়ে আমিও গুহাঘরে যাব।"

রাকেশ ছুটে এল। এই সতেরো বছরেও গুহাঘরের কোনও তফাত হয়নি। চাঁদ নীচে একটা টুলে বসল। রাকেশ তাকের ওপর চড়ে চাঁদের কথামতো পাথরের খাঁজে আঙুল দিয়ে চাপ দিতেই সেটি সরে গেল আর সবাই দেখল এক সারি পিপে আর ছোট একটি লোহার পেটি। সব পিপেই খালি ; শুধু দুটিতে সোনার মোহর ঠাসা আর পেটি ভরা গয়নাগাঁটি, রত্নমানিক ! ওম দ্বীপের সত্যিই ধনরত্নের অভাব ছিলও না, এখনও নেই। সে এখন বাংলার একটা গর্ব করবার মতো সম্পদ। সেকালের প্রায় নিরক্ষর পর্তুগিজ বোম্বেটেদের দয়ায় সেখানে একজনও নিরক্ষর বা বেকার নাগরিক নেই। ভাগ্যিস যাওয়া-আসা খুব সহজ নয়। তার পকেট বেতার-যন্ত্র দিয়ে চাঁদ সেইদিনই সরকারকে সব কথা জানিয়েছিল। আজকাল সংরক্ষিত অঞ্চল ওটি ; উড়োজাহাজে ছাড়া যাওয়া-আসা করা যায় না। কোনও মানচিত্রেও তার অবস্থান দেওয়া নেই। অনেকের মতে ও হল নেই-মানুষদের দেশ ; মনে-মনে পৌঁছতে না পারলে সেখানে যাবার জো নেই। তাই হবেও বা।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ইলেকট্রনিক রেটিনা

বেশ কয়েক বছর ধরে মানুষ তৈরির যাঁরা কারিগর, সেই 'হিউম্যান ইঞ্জিনিয়ার'রা নকল ইলেকট্রনিক চোখ তৈরির চেষ্টায় ছিলেন। সম্প্রতি জাপানের একটি গবেষক দল অত্যাধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ইলেকট্রনিক রেটিনা তৈরি করেছেন, যা সাধারণ চোখের মতোই 'দেখতে' সক্ষম। জাপানের 'শার্প কর্পোরেশন'-এর শোআই কাটাওকার বক্তব্য অনুযায়ী, এই নতুন যন্ত্রটিতে একটি বিশেষ ধরনের কম্পিউটার চিপ ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের চোখে 'রড' ও 'কোন' কোষ আছে। এদের সাহায্যেই বিভিন্ন রকম আলোয় আলোকিত জিনিস আমরা দেখতে পাই। ইলেকট্রনিক রেটিনার কম্পিউটার চিপটিতে ইলেকট্রনিক ফোটোসেন্সর-এর একটি স্তর রয়েছে যা 'রড' ও 'কোন' কোষের কাজ করে।

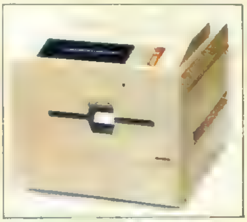
এছাড়া চিপটির অন্যান্য সিলিকন স্তরের মধ্যে রয়েছে স্মৃতিভাণ্ডার, লজিক গেট ইত্যাদি। আমাদের মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্র যে ধরনের কাজ করে ঠিক সেই রকম কাজগুলো করার জন্য চিপের ভেতরে রয়েছে একটি অতিসূক্ষ্ম কম্পিউটার।

এই রেটিনা যে মানুষের দেহে নকল চোখ হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে এমন কথা এখনও পর্যন্ত কেউ বলেননি। তবে সন্দেহ নেই, এই রেটিনা কোনও ইলেকট্রনিক রোবটকে 'চক্ষুদান' করতে পারবে সহজেই।



বোতাম ছুঁলেই জমা-খরচ

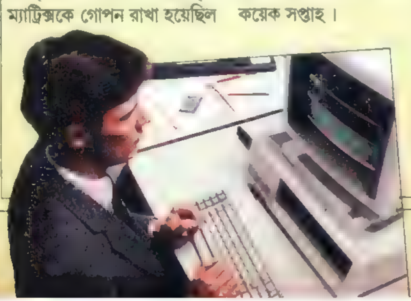
যন্ত্রটির নাম 'ট্রান্সডেটা ৯৭৭৯'। এর বোতাম টিপে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পরিচয় বা নম্বর জানালেই জমা-খরচের হিসেব বেরিয়ে আসবে সরু জানলা দিয়ে, অনেকটা ওজন নেবার যন্ত্রের মতো। এই যন্ত্রটি ব্যবহার করলে যে-কোনও ব্যাঙ্ক তার কর্মী-সংখ্যা অনেক কমিয়ে ফেলতে পারে। তা ছাড়া 'পাশ-বই' নামক বস্তুটিরও আর কোনও প্রয়োজন হবে না। এই যন্ত্র ব্যবহারের আরও একটা সুবিধে আছে। যদি এটিকে এমন একটি জায়গায় রাখা যায়, যাতে ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার পরেও গ্রাহকরা এর নাগাল পেতে পারেন, তা হলে অফিসের সময় থেকে ফাঁকফোকর খুঁজে নিয়ে কাউকে আর ব্যাঙ্কে দৌড়তে হবে না জমা-খরচের হিসেব পাওয়ার জন্য। উপরন্তু যন্ত্রটির ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশে এমন সতর্কতা নেওয়া আছে যে, একজন অ্যাকাউন্ট-হোল্ডারের হিসেব অন্য কেউ জানতে পারবে না। অবশ্য শুধু জমা-খরচের হিসেব কেন, তার সঙ্গে নানান আর্থিক লেনদেনের সাম্প্রতিক অবস্থাও গ্রাহক জেনে নিতে পারেন নতুন যন্ত্র ট্রান্সডেটা থেকে।



আর্থিক সমস্যা মেটাতে কম্পিউটার

না, অর্থাভাব মেটানো কম্পিউটারের কাজ নয়। তবে অর্থসংক্রান্ত নানা পরিকল্পনা ও সমস্যা সমাধানের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে কম্পিউটার প্রোগ্রাম 'মোব্‌লি ম্যাট্রিক্স'। এই বিশেষ প্রোগ্রাম বা সফ্‌টওয়্যারের স্রষ্টা 'আই· বি· এম·'-এর প্রাক্তন পরিচালক জু মোব্‌লি। এতদিন পর্যন্ত মোব্‌লি ম্যাট্রিক্সকে গোপন রাখা হয়েছিল ব্যবসায়িক কারণে। সম্প্রতি তাকে মুক্তি দিয়ে জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করে দেওয়া হয়েছে।

যে-কোনও কোম্পানির হর্তাকর্তাদের নানারকম জটিল আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেবে মোব্‌লি ম্যাট্রিক্স। আর এইসব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র তিন সেকেন্ড, যেখানে সাধারণভাবে এ-কাজে সময় লাগে অন্তত কয়েক সপ্তাহ।



যন্ত্রও কথা বুঝতে পারে

নয়াদিল্লির সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট সম্প্রতি একটি স্বয়ংক্রিয় কথা-চেনা যন্ত্র তৈরি করেছে। অ্যাকাউস্টিক প্যাটার্ন ম্যাচিং পদ্ধতিতে যন্ত্রটি কাজ করে। যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সামনে কথা বললে, যন্ত্র সেই কথা বিদ্যুৎ-সঙ্কেতে পরিণত করে নেয়। তারপর তার ভাণ্ডারে সঞ্চিত একই ধরনের বিদ্যুৎ-সঙ্কেতের সঙ্গে নতুন-পাওয়া সঙ্কেতগুলোর তুলনা করে। এই সমস্ত কাজই করা হয় মাইক্রোপ্রসেসরের সাহায্যে। তুলনামূলক বিচারের পর যন্ত্র তার টিভি-পর্দায় কথাগুলো নির্ভুলভাবে ফুটিয়ে তোলে। বিভিন্ন মানুষের বাচনভঙ্গির তারতম্য যাতে যন্ত্রকে অকেজো করতে না পারে তার জন্যও যন্ত্রটিতে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা করা আছে। বর্তমানে যন্ত্রটি পঞ্চাশটি ভিন্ন শব্দ নিয়ে কাজ করতে পারে। তার মধ্যে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলিও রয়েছে। যন্ত্রটির শব্দভাণ্ডার ও কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এখন পরীক্ষাগারে গবেষণা চলছে। এই ধরনের 'স্বর-যন্ত্র' মানুষের যে কত রকম কাজে লাগতে পারে, তা ভাবা যায় না। যেমন, রোবট নিয়ন্ত্রণ, কল-কারখানায় স্বর-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি চালনা, অন্ধদের লেখাপড়ার কাজে সাহায্য, স্বর-চালিত টেলিফোন ডায়াল পদ্ধতিতে ব্যবহার—এরকম আরও বহু কাজে এই যন্ত্র আগামী দিনের হাতিয়ার হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

অনুসন্ধানী



আড়াই পাউন্ড ওজনের মার্কিন ঘুড়ি। ১৯৭৫-এ আমেরিকার ন্যাশনাল স্কাই-ডাইভিং প্রতিযোগিতায় এই ঘুড়িটি দেখা গিয়েছিল

চিনে বিচিত্র সব ঘু



যায়। তারই একটি



নৌকোর পালের মতো ঘুড়ি



ঘুড়ি-বিশেষজ্ঞ ডেভিড পেলহাম-এর তৈরি

দেশবিদেশের ঘুড়ি

কার্তিক ঘোষ

শ্রাবণের মেঘ শরতের শিউলির কাছে ছুটি নিয়ে এই সময় কোথায় যেন চলে যেতে চায়। পাশের বাড়ির সমীর চুপিচুপি ডেকে নিয়েছে মোহরকে। সুতোয় মাঞ্জা দেওয়া শেষ। এবার শুধু লাটাই নিয়ে বেরিয়ে পড়া।

তুলো-পরা মেঘেরা হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছে এখন। সকালের রোদে কেমন যেন ছুটির আনন্দ। সমীরকেও এখন পড়ার ঘরে পাওয়া মুশকিল। হই-হই পড়ে গেছে ছাদে। ভো-কাট্টা বলে কেউ লাফিয়ে উঠলেই বেজে উঠছে কাঁসর-ঘণ্টা।

ঘুড়ির জন্যে ঘুমোয় কার সাধ্যি! ভর দুপুরেও জেগে থাকে পাড়া। তিন প্যাঁচেই মাছরাঙা ঘুড়িটার দফারফা। ও-পাড়ার ছেলেরা ছুটে আসছে এ-পাড়ায়। ঘুড়িটা ধরার জন্যে সমীরের হাতেও একটা আঁকশি। লাফাতে গিয়ে মোহরের ভাই হিরা আর-একটু হলে পড়ে যেত ছাদ থেকে।

ভো-কাট্টা একটা ঘুড়ির জন্যে কিনা এত কাণ্ড!

অবশ্য এই ঘুড়িরও বয়স কম হল না। যিশুখ্রিস্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই ঘুড়ির প্রচলন হয়েছে পৃথিবীতে। আদিম অধিবাসীরাও নাকি ঘুড়ি ওড়াতে জানতেন।

তবু ঘুড়ির আবিষ্কর্তাকে খুঁজে বের করা দারুণ মুশকিল। ইতিহাসের পাতা থেকে এক-এক সময় উঠে আসে এক-একটা নাম। বিচিত্র সে-সব সংবাদ। শোনা কথা ধরলেও শেষ হয় না সেই বাদানুবাদ

বিস্তর তর্ক বাধে ঘুড়ি নিয়ে। কোন্ দেশ যে প্রথম ঘুড়ি উড়িয়েছে পৃথিবীর আকাশে, তা নিয়েও মাঞ্জা কষা থামেনি। দাবিদার অনেক। চিন, জাপান আর গ্রিস সবাই বলে আমিই প্রথম।

পৃথিবীর প্রথম ঘুড়িটি নাকি তৈরি হয়েছিল

এবছরের এপ্রিলে চিনের উইফ্যাং শহরে ঘুড়ির উৎসব



চারশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে। দেশটার নাম গ্রিস। শহরটার নাম ট্যারান্টাস। আর প্রথম ঘুড়ি ওড়ানোর কৃতিত্বের দাবিদার হিসেবে তারা যাঁর নামটা পেশ করেছে, তিনি বিজ্ঞানী আরকিয়াটাস। তবে গ্রিসের আগেও চিনের নাম পাওয়া যায়। ছ'শো খ্রিস্টপূর্বাব্দে চিন নাকি প্রথম ঘুড়ি তৈরি করেছিল। অনেকেই জানে, চিনা সেনাপতি হানসিনের নাম। ঘুড়ির ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে।

এরোপ্লেন তৈরির আগে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিল মানুষ। মেঘের দেশে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে নিয়েই ঘুড়ি এসেছিল কল্পনায়। কে জানে, সোনালি ডানার চিলের সঙ্গেই ঘুড়ির নাম মিলিয়ে তার ইংরেজি নামটা Kite রাখা হয়েছে কি না!

তবে ঘুড়িকে নিয়ে যে-সব গল্প ছড়িয়ে আছে সেগুলোও কিন্তু দারুণ জমজমাট। চিন, জাপান ও তাইওয়ান-এর মতো দেশে ঘুড়ি ওড়ানো নিয়েই হয় মস্ত এক-একটা উৎসব। সেদিন আবার ছুটি থাকে সারা দেশে। মালয়েশিয়ার মানুষ ঘুড়িকে মনে করে পবিত্রতার প্রতীক। তাদের বিশ্বাস, ঘুড়ি হচ্ছে ভূত-প্রেতের ওঝা। কারণ, যে-সব বাড়ি থেকে ঘুড়ি ওড়ানো হয়, সেখানে নাকি সহজে ঘেঁষতে চায় না ভূতেরা। কোরিয়াতেও

◀ ঘুড়ির মেলা। ফোটো : রবিন বিশ্বাস



▲ সুখ ও সৌভাগ্যের প্রতীক জাপানের বেক্কাকো ঘুড়ি ▲ জাপানের পতঙ্গ ঘুড়ি



ঘুড়ি-ওড়ানো বেশ জনপ্রিয়।

আবার নিউজিল্যান্ডের আদিবাসীরা ভূত তাড়ানোর জন্যে ভারী মজার একরকম ঘুড়ি বানায়। তাদের নাম মাওরি। ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দের সঙ্গে তারা জুড়ে নিয়েছে একটা লৌকিক বিশ্বাস। তাদের ঘুড়ির মধ্যে থাকে নানারকম ছিদ্র। সেখানে বসানো থাকে ধাতব পাত। এমনভাবে সেইসব ধাতব পাত লাগানো হয় যে, ঘুড়ি ওড়ার সময় বাতাস এসে যেই না ছিদ্র দিয়ে ঢোকে, অমনি অদ্ভুত এক শব্দ বেরোয় তার থেকে। মাওরিদের বিশ্বাস, ঘুড়ির সেই আওয়াজ শুনে ভূতেরা পালাবে পাড়া ছেড়ে।

আমাদের এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যেও ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব হয় এক-এক সময়। ঘুড়ি নিয়েই গুজরাতে উতরান উৎসব হয় জানুয়ারি মাসে। আর আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায় বিশ্বকর্মা পুজোর দিন হয় ঘুড়ির উৎসব। সরস্বতী পুজোর দিনেও কোথাও কোথাও আকাশে চলে ঘুড়ির খেলা।

ঘুড়ির গায়ে যতই থাকুক লৌকিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের গন্ধ, ধর্মীয় উৎসবের ছাপ, ঘুড়ি-ওড়ানো যে উঁচু দরের একটা শিল্প, খেলাধুলোর অঙ্গ, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। বয়সে একটু বড় হলেও ঘুড়ি চিরকাল নবীন। সব বয়সেরই সমবয়সী সে, সবার সঙ্গে তার ভাব। ছোটদের সঙ্গে-সঙ্গে বড়রাও ঘুড়ির খুব বন্ধু।

কাজেই ঘুড়ির আবিষ্কর্তাকে ইতিহাসের পাতায় সঠিকভাবে কোথাও খুঁজে পাওয়া না গেলেও, কিছু এসে যায় না আমাদের। বিশ্ব জুড়ে তার বিবর্তনে স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চ্যানিউট, উইলিয়াম এ এডি, চার্লস পি মারউইন, স্যামুয়েল পি ল্যাংলি, ইংল্যান্ডের বেডেন পাওয়েল আর অস্ট্রেলিয়ার হারগ্রেভ। এই হারগ্রেভ সাহেবই বাক্স-ঘুড়ির আবিষ্কর্তা। ১৮৯৩ সালে তিনিই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার আকাশে উড়িয়েছিলেন বাক্স-ঘুড়ি। তাই সেই বাক্স-ঘুড়ির আর-একটা নাম হারগ্রেভ ঘুড়ি। বাক্সর ধাঁচে তৈরি হলেও, এর দু'মুখ খোলা থাকে। কলকাতার আকাশেও অনেকে উড়তে দেখেছে এমন ঘুড়ি। আমাদের দেশে দিল্লি আর লখনউয়ে বাক্স-ঘুড়ির প্রচলন আছে। কিন্তু লেজবিহীন ঘুড়ির আবিষ্কর্তা হচ্ছেন আমেরিকার উইলিয়াম এ এডি।

তবু ঘুড়ির পীঠস্থান বলতে চিন, জাপান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া আর কোরিয়ার কথাই সবাই বলি। ঘুড়ির বর্ণ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে গঠন



চিনের প্রাচীন পাখি-ঘুড়ি

বৈচিত্র্যের লোভনীয় প্রদর্শনী দেখতে হলেও হাজির হতে হবে ওই সব দেশে। কত রকমের যে ঘুড়ি তার ঠিক নেই। চিনেই আছে প্রায় তিনশো রকমের ঘুড়ি। মাছ, পাখি, ড্রাগন, পরি, মানুষ, প্রজাপতি, লণ্ঠন আর জাহাজ, ঘুড়ির যেন শেষ নেই। প্রজাপতি-ঘুড়িটার দিক থেকে যেন চোখ ফেরানো যায় না। উড়তে-উড়তে বদল করছে ডানার রং। কী মজার ঘুড়ি ওটা! আসলে প্রজাপতি-ঘুড়ির ডানা দুটোয় নানা রঙের কাগজ কুচিকুচি করে কেটে এমনভাবে জোড়া হয়েছে যে, ভাবলে অবাক হতে হয়। বাতাসে ডানা মেলে প্রজাপতি যেমন ওড়ে, তেমনি ওড়ে প্রজাপতি-ঘুড়ি। ডানার রং দেখে কে আর প্যাঁচ কষতে চাইবে শুনি!

আকারে সবচেয়ে বড় ঘুড়ির নাম ড্রাগন। সামনে থাকে মাথা। গোটা শরীরটা জুড়ে আঁটা থাকে ছোট-ছোট অনেক ঘুড়ি। প্রায় দশ ফুট দীর্ঘ ড্রাগন-ঘুড়িকে তাই ভয় পায় না কে! আছে লণ্ঠন-ঘুড়ি। কে জানে, নিশুত রাতে লণ্ঠন জ্বেলে যে ঘুড়ি আকাশে উড়ে যায়, সে কাকে আলো দেখায়! তবে কোরিয়ার এক সেনাপতি তাঁর সেনাদের মনে সাহস জোগানোর জন্যে লণ্ঠন বেঁধে যে প্রথম ঘুড়ি উড়িয়ে ছিলেন, এ-কথা গল্প নয়, সত্যি।

আবার এ-কথাও সত্যি, শুধু অবসর বিনোদনের জন্যই মানুষ ঘুড়ি ওড়ায়নি, একসময় ঘুড়ি ছিল বিজ্ঞানের বড় বন্ধুও। কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি খবরাখবর প্রচারে, ছবি তোলায়, আবহাওয়ার আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ইত্যাদি নির্ধারণে বার বার বিজ্ঞানের কাজে লেগেছে ঘুড়ি। মানুষই যেমন তাকে মহত্তর প্রচেষ্টায় সঙ্গী করে নিয়েছে যুগে-যুগে, তেমনি সম্মানিতও করেছে তার সাফল্যকে।

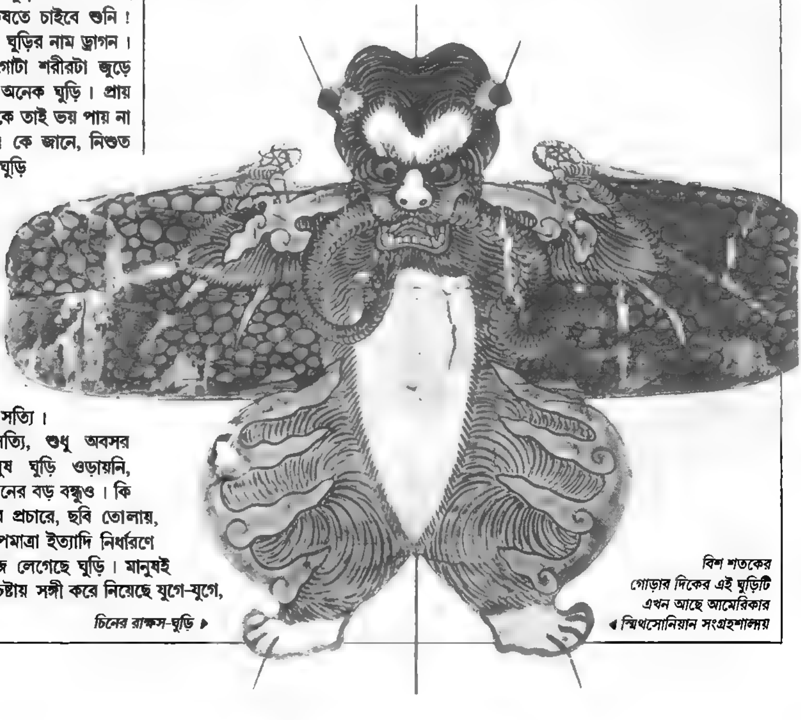
১৭৪৯ সালের কথা। বিজ্ঞানের বিজয়-রথের সারথি হল ঘুড়ি। স্কটল্যান্ডের দুই বিজ্ঞান-পড়ুয়া আলেকজান্ডার উইলসন আর টমাস মেলভিল তাপমাত্রা পরিমাপের কাজে উড়িয়ে দিলেন কয়েকটা ঘুড়ি। তবে আলাদা করে নয়, রেলগাড়ির কামরার মতো জুড়ে জুড়ে। প্রতিটি ঘুড়ির সঙ্গেই আটকানো রইল একটা করে থার্মোমিটার।

তারপর ঠিক তিনটে বছর গেল। ১৭৫২ সালের কথা। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন জব্বর এক পরীক্ষায় জিতে গেলেন ঘুড়ির সাহায্যে। সেদিন ছিল মেঘলা আকাশ। বাতাসে ঝড়ের সঙ্কেত। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেই ঘুড়ি নিয়ে উঠেছিলেন ছাদে। ভেবেছিলেন, ঘুড়ি উড়িয়ে একটু হালকা করে নেবেন মনটাকে। হঠাৎ কী খেয়াল হল, ঘুড়ির সুতোর সঙ্গে বেঁধে তাঁর ঘরের চাবিটাকেও পাঠালেন আকাশে একটু উড়ে আসার জন্যে। ব্যস, আর কে পায় তখন। আকাশের বিদ্যুৎ ফ্র্যাঙ্কলিনের চাবির মধ্যে দিয়ে ভিজে সুতোর সাহায্যে নেমে এল মাটিতে। রঙিন ঘুড়ির জন্যেই সেদিন বিজ্ঞানের এক রহস্য উন্মুক্ত হয়েছিল বেঞ্জামিনের মনে।



উনিশ শতকে চিনের হাইকোয়ান-এ ওড়ানো হত এরকম পাখি-ঘুড়ি

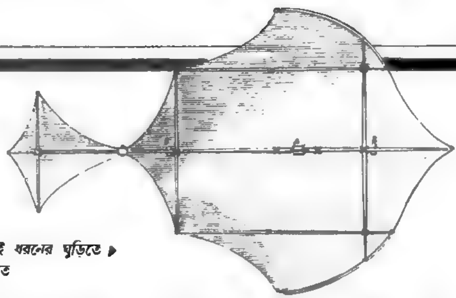
তার প্রায় দেড়শো বছর পরে ইংল্যান্ডের ডগলাস আর্কিবাল্ড এগিয়ে এলেন ঘুড়িকে সঙ্গী করে। ঘুড়ির সুতোয় তিনিও বেঁধে দিলেন একটি যন্ত্র, যার নাম অ্যানিমোমিটার। এর সাহায্যে বিভিন্ন উচ্চতায় মাপা যায় বাতাসের গতিবেগ। আমেরিকায় আবহাওয়া-অফিসে তো এক সময় এই ঘুড়ির সাহায্যেই বাতাস মাপা হত।



চিনের রাক্ষস-ঘুড়ি ▸

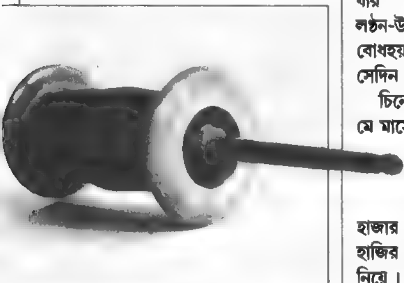
বিশ শতকের গোড়ার দিকের এই ঘুড়িটি এখন আছে আমেরিকার ◂ স্মিথসোনিয়ান সংগ্রহশালায়

যে বাক্স-ঘুড়ির কথা আগে বলেছি, যুদ্ধের সময় সেই ঘুড়িও বেশ কাজে লেগেছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এক সময় শত্রুপক্ষের গোপন শিবিরের দিকে নজরদারি চালাত এই বাক্স-ঘুড়িতে চেপে। জার্মানরাও তা বলে কম যায়নি! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তারাও বাক্স-ঘুড়ি ওড়াত সাবমেরিন থেকে। ঘুড়ির সঙ্গে রেডিও অ্যান্টেনা আটকে দিয়ে বেতার-সঙ্কেত পাঠাত সেনাশিবিরে। শুধু কি তাই! শত্রুপক্ষের গোপন দুর্গের ছবি তুলে আনত যে সব ক্যামেরা, সেগুলি সবই বাঁধা থাকত ঘুড়িতে। ১৮৯৮ সালের ঘটনা। আমেরিকা আর স্পেনের যুদ্ধে এইরকম ক্যামেরা-ঘুড়ির প্রচলন হয়েছিল অনেক। তিব্বতেও ছিল একসময় খাঁচার মতো একরকম ঘুড়ি। দুর্গম জায়গায় লোকজন বয়ে নিয়ে গিয়ে বন্ধুর মতো কাজ করত। ঘুড়ি ছিল যেন যানবাহন, পথের সঙ্গী।



গ্লাইডারের মতো ঘুড়ি। এই ধরনের ঘুড়িতে ▶ মানুষ আকাশে উড়তে পারত

লাটাই ▼



তা সেই ঘুড়ি নিয়েই তো কত দেশে কত উৎসব। কত অনুষ্ঠান। আগে চিনের কথা বলি। চিনারা তাদের নবম মাসের নবম দিনটাকেই বরাদ্দ করেছে ঘুড়ির জন্যে। সেদিনটি তাদের ঘুড়ি-দিবস। আবার প্রথম চান্দ্রমাসের পনেরো দিনের মাথায় পালন করা হয় আর-একটা উৎসব। লণ্ঠন-ঘুড়িই যার একমাত্র প্রতীক। তার নাম লণ্ঠন-উৎসব। তবে ঘুড়ি-দিবসের উৎসবটাই বোধহয় বেশি জমজমাট। ছেলে, বুড়ো সবাই সেদিন ঘুড়ি ওড়ায় আনন্দে।

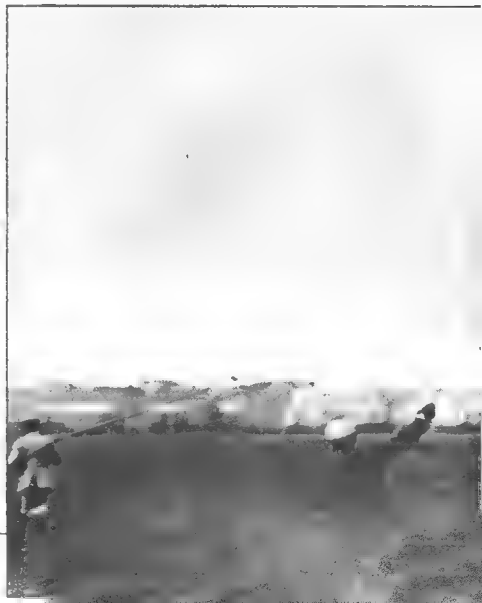
চিনের ঠিক পরেই আসে জাপান। মে মাসের পাঁচ তারিখে জাপানের শিশুদিবস। আর শিশুদিবস মানেই ইডো নদীর ধারে লড়াই জমবে ঘুড়ির। হাজার হাজার ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাড়ির বড়রাও হাজির হন তাঁদের নিজের হাতে তৈরি ঘুড়ি নিয়ে। বাড়ির ছেলে-পিছু একটা করে মাছরাঙা বা ঘুড়ি সেদিন বাড়ির সামনে টাঙানো থাকে বাঁশের ডগায়। তার মধ্যে দিয়েই প্রার্থনা করা হয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তা ছাড়া জাপানের নববর্ষের দিনেও ঘুড়ি ওড়ানো হয় আকাশে।

ঘুড়ির লড়াইয়ের কথা বলতে হলে, তাইল্যান্ডের কথাও বলতে হয়। অমন জোরদার ঘুড়ির লড়াই পৃথিবীতে আর কোথাও হয় কি না সন্দেহ। ফেব্রুয়ারি থেকে জুন—এই পাঁচ মাস টানা লিগ প্রতিযোগিতা হয় ঘুড়ির। পুরুষ-ঘুড়ির নাম চুলা। দেখতে ঠিক তারার মতো। সেই ঘুড়ির সঙ্গে লড়াই হয় স্ত্রী-ঘুড়ির তার নাম পকপাও। রুইতনের মতো চেহারা। পুরুষ-ঘুড়ি চওড়ায় প্রায় সাড়ে সাত ফুট। কিন্তু স্ত্রী-ঘুড়ি সাইজে তার অর্ধেক হলেও, যেমন লড়াকু, তেমনি দ্রুতগতি।

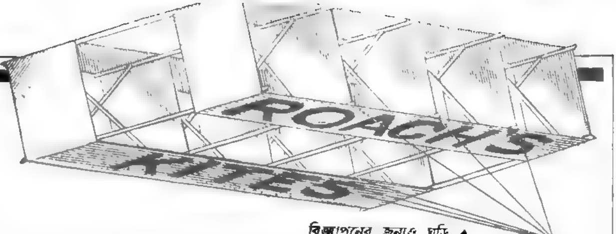
আমেরিকার অনেক শহরে ঘুড়ি ওড়ে বসন্ত উৎসব স্মরণ করার জন্যে। ঘুড়ির লড়াই দক্ষিণ আমেরিকার কোনও কোনও অঞ্চলে এখনও বেশ জমজমাট আছে।

ছুঁচলো মুখঅলা ঘুড়ি। ▼ ভারতে এক সময় এই ঘুড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল





জাপানের মতো ওখানেও আছে অনেক প্রতিষ্ঠান। যাদের কাজই হচ্ছে বিভিন্ন দেশের ঘুড়ি-সংক্রান্ত খবরাখবরের আদানপ্রদান করা। এক-এক সময় সেই নিয়ে কত শোরগোল পড়ে যায় ওসব দেশে।



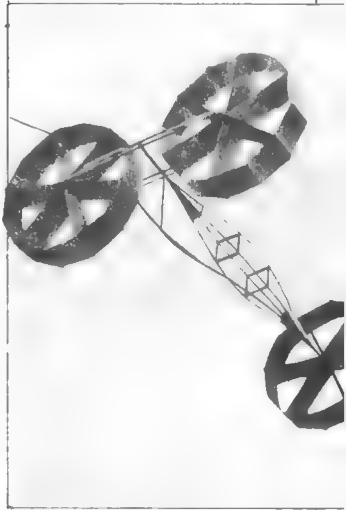
বিজ্ঞাপনের জন্যও ঘুড়ি ▲ ব্যবহার করা হয়। সেরকমই একটি ঘুড়ি

কিন্তু এ-দেশে? না, ঘুড়ির বয়স যতই হোক, ভারতবর্ষেও ঘুড়ি-ওড়ানো এখনও একটা উঁচুদরের শিল্প কিংবা খেলাধুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি। বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কাজে অবশ্য ঘুড়ির ব্যবহার শুরু হয়েছে। আমাদের দেশেই কানপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছে। বাতাসের যে শক্তি তাকে ঘুড়ির সাহায্যে কাজে লাগিয়ে জেনারেটর চলবে। তার থেকে যেটুকুই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হোক না কেন, তা হবে যেমন সহজলভ্য তেমনি শস্তা।

তবে আমাদের দেশে এই ঘুড়ির আবির্ভাব হয় ঠিক কবে, সে বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় না। কিন্তু সেই প্রথম শাহ আমলের সময় থেকেই যে ঘুড়ির প্যাঁচ খেলা শুরু হয়েছে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দিল্লির মুঘল আমলেই ঘুড়ি প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এ-দেশে। তখন থেকেই কতরকম নাম হয়েছে ঘুড়ির! তুক্কল, পতঙ্গ, কানকাওয়া আর চাংগ।

কিন্তু গুড্ডি? লখনউয়ের শেষ নবাববংশের সঙ্গে সেও এসেছিল একদিন এই কলকাতায়। তখন তো ইংরেজ শাসন করছে এ-দেশ। রাজ্যহারা নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ লখনউ থেকে এসে মেটিয়াবুরুজের বাগানবাড়িতে উঠেছেন। সিংহাসন না থাক, শখ-আহ্লাদ তো আছে। আত্মীয়-পরিজন, চাকর-নফর নিয়ে প্রায় পাঁচশো লোক এসেছে তাঁর সঙ্গে। আর এসেছে শখের পায়রা, কতরকম পাখি, শখের গুড্ডি। কতটা সত্যি কি না জানি না, সেই গুড্ডিই নাকি কলকাতার আদি ঘুড়ি। তবে উনিশ শতকের শেষ দিকে কলকাতার বাবুরা যখন দিন কাটাচ্ছেন পরম আলস্যে, তখন তাঁদের বিনোদনের বিষয় হয়ে উঠেছিল এই ঘুড়ি। ঘুড়ির প্যাঁচ খেলায় তখন বাবুয়ানির চূড়ান্ত। মাঞ্জাহীন সুতো। তা হোক। শুধু আঙুলের কায়দায় কত কেরামতি। ঘুড়ির গায়ে থাকত আর-এক আকর্ষণ। আর-এক অহঙ্কার। সে টাকার। পাঁচ টাকা, দশ টাকা থেকে একশো টাকার নোটও আটকানো থাকত বড়-বড় বাবুদের ঘুড়িতে।

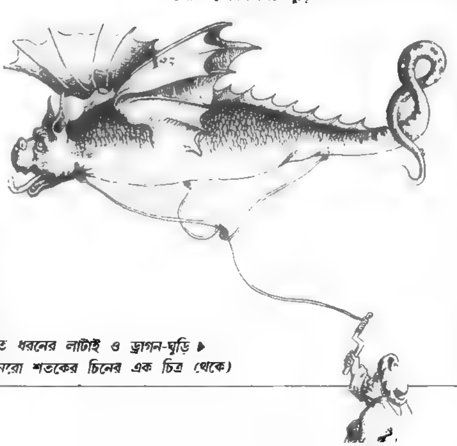
অন্য দেশের মতো কলকাতাতেও অবশ্য ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা হয় দু'একটি। প্রতি বছরই ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয় কাইট-ফাইটিং। এক-একটা গ্রুপ ভাগ করে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় এখানে। প্রতি গ্রুপে দু'জন থেকে ছ'জন পর্যন্ত থাকতে পারেন। মোট পনেরোটি প্যাঁচ খেলতে হয়। যে দল বিপক্ষ দলের তুলনায় বেশি ঘুড়ি কাটবে, মোট অন্তত আটটি প্যাঁচ কাটতে পারবে, বিজয়ী বলে ঘোষিত হবে সেই দল। লিগ এবং নক আউট প্রথায় খেলা হয়



বারোটি কোণ-বিশিষ্ট ঘুড়ি ▲



◀ মনুষ্যবাহী ঘুড়ি ক্যানভাস, তার ও শক্ত কাঠি দিয়ে প্যাট্রিক আলেকজান্ডার এই ঘুড়িটি তৈরি করেছিলেন ১৯০৯ সালে



অদ্ভুত ধরনের লাটাই ও ড্রাগন-ঘুড়ি ▶ (পনেরো শতকের চিনের এক চিত্র থেকে)

কলকাতার ময়দানে। লিগের ক্ষেত্রে যে দল বেশি পয়েন্টে এগিয়ে থাকে, সেই দলকেই লিগ বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। অবশ্য এক-একটা খেলায় প্যাঁচের হেরফের হয় এক-একরকম। নয়, এগারো অথবা তেরো। খেলা শুরুর আগেই জানিয়ে দেওয়া হয় ক'টা প্যাঁচ খেলা হবে। শুধু কলকাতার ঘুড়ি ওড়ানো কয়েকটা ক্লাবকে নিয়েই নয়, সর্বভারতীয় ঘুড়ি-ওড়ানোর প্রতিযোগিতাও হয়েছে কয়েকবার।

অতীতের দিকপাল ক্রিকেটার কার্তিক বসুকে কে না চেনে! কিন্তু অনেকেই জানেন না, ঘুড়ির বিষয়েও তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। আমহার্স্ট স্ট্রিটের সেই বিখ্যাত ঘুড়ির দোকান 'বোসেস কাইট' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। বহু ছেলেকে হাতে ধরে ঘুড়ি তৈরি, এমনকী মাঞ্জা দেওয়াও শিখিয়েছেন।

আমাদের এখানে আজকাল যে-সব ঘুড়ি উড়তে দেখা যায়, সেগুলো প্রায় একই রকম আছে অনেকদিন। সেই দুটো মাত্র কাঠি দিয়ে তৈরি। বর্গাকার ঘুড়ি। কেউ বলে ডায়মন্ড, কেউ বা পেটকাটা। ধাঁচটা ঠিক মালয়েশিয়ার ঘুড়ির মতো। মাঝে-মাঝে রঙের বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা হয়, কিন্তু আকারটা তেমন পালটায়নি।

ঘুড়ি-পাগল কলকাতারও একটা গল্প আছে দারুণ। ১৯১১ সালের কথা। ওই বছর শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান ক্লাব। মাঠ ছাপিয়ে জড়ো হয়েছিলেন প্রায় আশি হাজার ফুটবলপ্রিয় মানুষ। কিন্তু ভিড়ের চাপে ভেস্তে গিয়েছিল অনেক দর্শকের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা। ভাল করে খেলাই দেখা যাচ্ছিল না মাঠের। এই ঘুড়িই সেদিন সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল। উৎসাহী সমর্থকরা ঘুড়ি উড়িয়েই সেদিন বাইরের দর্শকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন খেলার ফলাফল।

ঘুড়ি নিয়ে যখন এত হইচই, তখন ঘুড়ি কী করে ওড়ে সেটাও জানা দরকার। আসলে ঘুড়ি যখন ওড়ে, তখন তার সঙ্গে থাকে তিনটে শক্তি। একটা শক্তি ঘুড়িকে তার নিজস্ব ওজনের জন্যে টানতে থাকে মাটির দিকে। আর-একটা শক্তি বাতাস। তার আবার দুটো শাকরেদ। একজন ঘুড়িটাকে ওপরে তুলতে চেষ্টা করে, আর-একটা অংশ সাহায্য করে ঘুড়িটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এইরকম যৌথ শক্তির চেষ্টায় কোনাকুনি ওপরে উঠতে থাকে ঘুড়িটা, আর সুতোয় লাগাম ধরে রাখে তার টান, সেটাই হল তিন নম্বর শক্তি। এই তিন শক্তির সাহায্যেই ঘুড়ি আকাশে ওড়ে তরতর করে।



সামুরাই আঁকা জাপানের সুপ্রাচীন সানজো ঘুড়ি

আমরা আবার অনেকেই একটা লেজ লাগিয়ে দিই ঘুড়ির। আসলে ভাল দেখাবার জন্যে নয়, ঘুড়ির ওড়াকে একটু সুস্থির করার জন্যেই আমরা এই ব্যবস্থা নিই, যদিও জানি, লেজ-লাগানো ঘুড়ি বেশি ভারী হয়ে পড়ে। আর ভারী হলেই বেশি ওপরে উঠতে পারে না। তবু লাট-খাওয়ানোর হাত থেকে ঘুড়িকে বাঁচাতে এটাই হচ্ছে সহজ রাস্তা।

ঘুড়ি নিয়ে বিশ্ব-রেকর্ডও হয়েছে কম নয়। ফ্লোরিডা শহরের ল্যান্ডারভিলে 'দা সানরাইজিং ক্লাব' একটানা ১৬৯ ঘণ্টা ঘুড়ি উড়িয়ে রেকর্ড করেছেন অনেক আগেই। ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে ৭ মে পর্যন্ত একটানা সাতদিন আকাশে ঘুড়ি উড়িয়েছিলেন তাঁরা।

আবার সবচেয়ে বড় ঘুড়িটি তৈরি হয়েছিল জাপানের নারুতো সিটিতে। ১৯৩৬ সালের ঘটনা। ঘুড়িটার ওজন হয়েছিল প্রায় সাড়ে ন'টন। আর কাগজ লেগেছিল মোট ৩,১০০ খানা।

২৮,০০০ ফুট উঁচুতেও ঘুড়ি উড়িয়েছিলেন এক অধ্যাপক। তাঁর নাম ফিলিপ কুনজ। সেই ঘটনার সাক্ষী ছিল উয়োমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে লারামি শহরের সবাই। ক্যালেন্ডারের পাতায় সেদিনটা ছিল ১৯৬৭ সালের ২৯ নভেম্বর।

এইরকম কত বিশ্বরেকর্ড, কত ইতিহাসের বর্ণময় অধ্যায়কে বারবার আলোকিত করেছে এই ঘুড়ি। কত মানুষের কল্পনার রঙে রঙিন তার অবয়ব। কত আনন্দ, কত উৎসবের সে প্রতীক। মানুষের সে কতকালের খেলার সঙ্গী।



মাছ ধরা হুইলের মতো ঘুড়ি ওড়ানোর হুইল

যুদ্ধের কাজে ঘুড়ি

সৌরভ বাগচী

ঘুড়ি নিয়ে পৃথিবীর নানান দেশে উৎসব, মজা ইত্যাদির যেন আর শেষ নেই। অথচ সেই ঘুড়িকে মানুষই আবার লাগিয়েছে যুদ্ধের কাজে। সামরিক কাজে ঘুড়ির ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। যতদূর জানা যায়, চিন দেশেই নাকি ঘুড়িকে প্রথম যুদ্ধের কাজে লাগানো হয়েছিল। সেটা ৯৬০-১২৭৯ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। ওই সময় শত্রু-শিবির এবং জাহাজ-ধ্বংসের জন্য ঘুড়িতে বিস্ফোরক বেঁধে ওড়ানো হত। নির্দিষ্ট উচ্চতায় উড়লেই ঘুড়িটিকে অভিজ্ঞ হাতের টানে গোঁত খাইয়ে নামিয়ে আনা হত প্রায় আধুনিক বম্বার বা ফাইটার বিমানেরই মতো। তারপর ঘুড়ির মাথায় লাগানো বিস্ফোরকের ফিউজে ধাক্কা লাগলেই ঘটে যেত সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড।

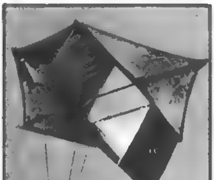
তবে এর আগেই ঘুড়িকে দিয়ে সঙ্কেত প্রেরণের কাজ করানো হয়েছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে একজন রাজা নাকি শত্রুপুরীতে বন্দী হয়েছিলেন। অনেকদিন অবরুদ্ধ থাকার পর তিনি বাধ্য হয়ে ঘুড়ি ওড়ালেন আকাশে। সেই ঘুড়িতে ছিল গোপন সঙ্কেত। তা দেখে সৈন্যরা এসে তাঁকে মুক্ত করেন।

সঙ্কেত-প্রেরণের এই ঘটনাই নাকি লর্ড বেডেন পাওয়েলকে ভাবিয়েছিল। বয় স্কাউট আন্দোলনের জনক লর্ড বেডেন পাওয়েলের নাম কে না শুনেছে। ঘুড়িকে দিয়ে যে আধুনিক সঙ্কেত পাঠানো যেতে পারে, এ-ভাবনাটা তাঁর মাথাতেই প্রথম এসেছিল। এই ভাবনার ভিত্তিতেই প্রথম মহাযুদ্ধে ঘুড়ির সাহায্যে প্রথম সঙ্কেত পাঠানো হয়েছিল। এ-জন্য বিশেষ বিশেষ রঙের ঘুড়ি ব্যবহার করা হত, অথবা ঘুড়ির মধ্যে কোনও সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখে আকাশে ওড়ানো হত। দূর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা তা দেখতে পেয়ে বুঝতে পারতেন তাঁদের সেনাপতির আদেশ।

সামরিক কাজে ঘুড়ির ব্যবহারে যুগান্তর এসেছিল ১৮৯৮ সালের স্প্যানিশ আমেরিকান যুদ্ধে। এ-যুদ্ধে ঘুড়িকে দিয়ে গোপন ফোটোগ্রাফারের কাজ করানো হয়েছিল। ঘুড়িতে লাগানো ক্যামেরার শাটার টেপা হয়েছিল বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে। তবে বিগত দুটি মহাযুদ্ধে ঘুড়িকে দারুণ একটা কাজে লাগানো হয়। আর সে-ব্যাপারে জার্মানি, ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকা কেউই পিছিয়ে ছিল না।

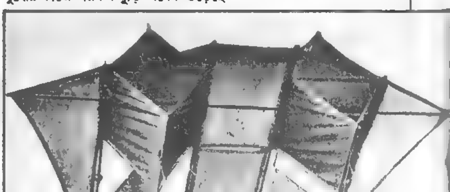
বিশ্বযুদ্ধের সময় যে-সব ঘুড়ি দিয়ে সঙ্কেত পাঠানো হত, সে-সব ঘুড়ির সুতোই ছিল রেডিওর এরিয়াল। ঘুড়ি যত উঁচুতে উঠবে রেডিওর বার্তাও পাঠানো যাবে তত দূরে। বেতারের আবিষ্কারক মার্কনি সাহেব-ই 'ঘুড়ি এরিয়াল'-এর প্রবর্তন করেছিলেন। তবে এ-সব ঘুড়ি কিন্তু ছিল সিল্ক বা জলনিরোধক কাপড় দিয়ে তৈরি। বৃষ্টিতে যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা। তবে ভিজে সুতো বা ঘুড়ি সব সময়েই বিপদ ডেকে আনতে পারে। আকাশে বিদ্যুৎ নেমে আসতে পারে ঘুড়ির সুতো বেয়ে। তখন শক্ লাগবার আশঙ্কা থাকে। সেজন্যে রবারের তৈরি জুতো বা দস্তানার প্রয়োজন হয়।

পুরনো তিব্বতি ঘুড়িতে মানুষ আকাশে উড়তে পারত। ঘুড়িকে প্রায় এ-ভাবেই কাজে লাগানো হয়েছিল যুদ্ধে। তিব্বতি বাক্স-ঘুড়ির তুলনায় উন্নত এ-ধরনের ঘুড়ি তৈরি করেছিলেন বিজ্ঞানী লরেন্স হারগ্রেভ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা এ-জাতীয় ঘুড়িতে আকাশে উড়ত। তখন সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ এখনকার মতো উন্নত ছিল না যে, তার ওপর বিমান অবতরণ করতে



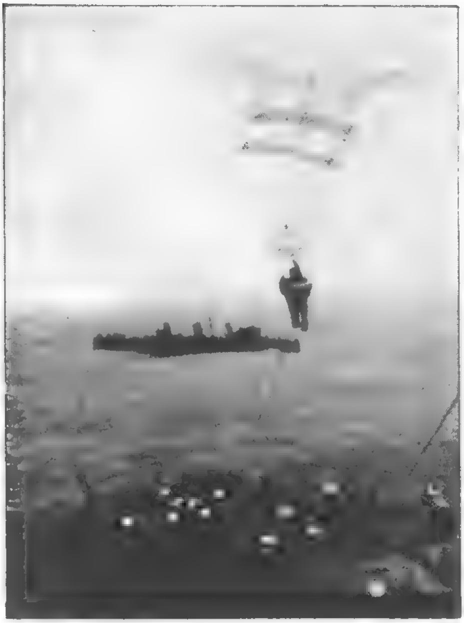
সঙ্কেত পাঠানোর ঘুড়ি। সেনা-উদ্ধারে এক সময় ফরাসিরা এই ঘুড়ি ওড়াত

যুদ্ধের কাজে এরকম ঘুড়ি অনেক উড়েছে





বাক্স-ঘুড়ি

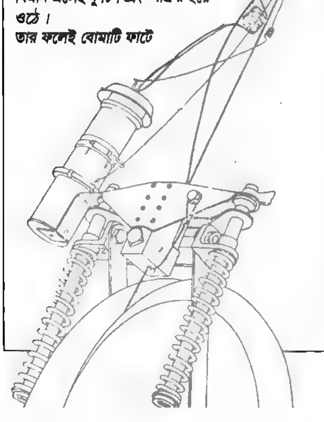


এ জাতীয় বাক্স-ঘুড়িতে যুদ্ধের সময় ডুবো জাহাজ থেকে জার্মান সৈন্য উড়ত।

পারে। তাই বিমানের কাজ মেটাত ঘুড়ি। অনেক উঁচুতে উড়ে দূর সমুদ্রের শত্রু-জাহাজের খবর এনে দিত ডুবোজাহাজের ক্যাপ্টেনকে।

ঘুড়ি আর-এক ভাবে যুদ্ধের কাজে করতে পারে। বিমান-ওড়াবার আগে আবহাওয়ার খোঁজখবর নেওয়া যায় ঘুড়ির সাহায্যে।

এ জাতীয় ঘুড়ি উড়িয়ে শত্রু-বিমান ঘায়েল করা হয়। ঘুড়ির সংস্পর্শে বিমান এলেই দু'টি স্প্রিং সক্রিয় হয়ে ওঠে। তার ফলেই বোমাটি ফাটে



আগে থেকেই ঘুড়ি জানিয়ে দিতে পারে বাতাসের চাপ।' বেগ এবং বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা। এ-সব তথ্য আগে সঠিকভাবে জানা থাকলে নিশ্চিন্তে উড়ে যেতে পারে বিমান-বহর। বীর-বিক্রমে হানা দিতে পারে শত্রু-পুরীতে। তেমনি শত্রুর বিমানকে ঘায়েল করতেও ঘুড়ির জুড়ি নেই। দেশের আকাশ-সীমানায় বিস্ফোরক পদার্থবাহী সারি সারি ঘুড়ি বিভিন্ন উচ্চতায় উড়িয়ে ব্যারেজ তৈরি করে রাখা যায়। এতে হানাদার বিমান বাধা পাবে। সামান্য একটা ঘুড়ি হারিয়ে দেবে বিমানকে।

আমেরিকার বিজ্ঞানী হ্যান সি স্যাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শত্রু-বিমানকে ভূপাতিত করার জন্য বিশেষ এক ধরনের ঘুড়ি তৈরি করেছিলেন। বড় বড় ব্যাটেলশিপ বা যুদ্ধ-জাহাজ থেকে এগুলো ওড়ানো হত। শত্রু-বিমান জাহাজ আক্রমণ করলেও, তারা কাছাকাছি আসতে পারত না। কারণ তাতে বিমানের প্রপেলারের সঙ্গে ঘুড়ি বা সুতো জড়িয়ে যাবার আশঙ্কা থাকত; যা ছিল বিমানের পক্ষে এক খুবই বিপজ্জনক। পল গার্বার নামে আর এক আমেরিকান ঘুড়িকে অন্য আর এক-ভাবে কাজে লাগান। আমেরিকান গোলন্দাজরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘুড়ি উড়িয়ে সেই উড়ন্ত ঘুড়ি লক্ষ করে নিশানা অভ্যাস করত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের সবচেয়ে গোপন অস্ত্র ছিল বেলুন-বোমা। তা ছিল জার্মানির ভি-টু নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের মতনই সাঙ্ঘাতিক। গ্যাস-ভর্তি বিরাট বেলুন হাজার কেজি বিস্ফোরক নিয়ে রওনা দিত। নির্দিষ্ট উচ্চতায় এবং দূরে যাবার পর তা নেমে আসত একেবারে শত্রু-সৈন্যের মাঝখানে। তারপর দূর থেকে সুইচ টিপে বিস্ফোরক পদার্থগুলো ফাটানো হত। সবাই বেলুনের কথাই জানে। কিন্তু অনেকেই জানে না যে, জাপান ঘুড়ি নিয়েও এরকম পরীক্ষা চালিয়েছিল। সে-পরীক্ষা সফল হয়নি। কারণ ঘুড়ি বেশি দূর যেতে পারে না। আর আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী প্রচুর বিস্ফোরক বয়ে নিয়ে যাওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। তাই জাপান ঘুড়ি ছেড়ে বেলুনকে বেছে নেয়। তবে মালয়ের জঙ্গলের যুদ্ধে জাপান যে বহুবার ঘুড়ির সাহায্যে তাদের সেনাদের কাছে সেনাপতির আদেশ পৌঁছে দিয়েছে, তার প্রমাণ আছে। যেখানে বিমান ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে ঘুড়িই কেল্লা মাত করেছে।

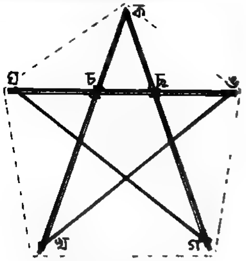
ঘরে বসেই বিচিত্র ঘুড়ি

চঞ্চল পাল

পৃথিবীতে একশোরও বেশি রকমের ঘুড়ি দেখতে পাওয়া যায়। বিচিত্র তাদের আকৃতি, কোনওটা বাক্সের মতো, কোনওটা দেখতে যেন তারা, কোনওটা আবার ড্রাগন, মাছ, সাপ, ঈগল বা রাক্ষসের মুখের মতো। তার ওপর কত রকমের রং-যে ওইসব ঘুড়ির ওপর লাগানো হয়, তা দেখে অবাক না হয়ে পারি না। এগুলোর কোনওটা তৈরি করা খুব শক্ত। কোনওটা-বা-যে কেউ অল্প সময়েই ঘরে বসে তৈরি করে নিতে পারে। আমাদের অতিপরিচিত চৌকো ঘুড়ির বাইরে বিচিত্র চারটি ঘুড়ি তৈরির কৌশল খুব সংক্ষেপে দেওয়া হল। এগুলি তৈরি করতে পারলে মজা যেমন বাড়বে, তেমনি বাড়বে উদ্ভাবনী-শক্তিও।

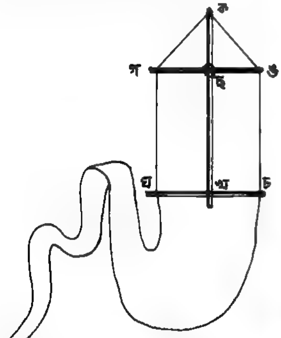
অতি পরিচিত চৌকো ঘুড়ি। নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা করা যায় না ? *ফোটো : তাপস বসু*





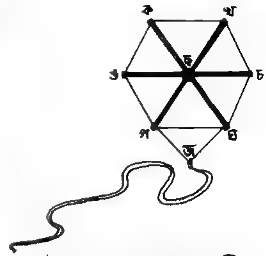
তারা ঘুড়ি

ছবিতে কখ, কগ, আর ঘঙ হচ্ছে তিনটে কাঠি। ঘগ আর খঙ হচ্ছে সুতো দিয়ে টান টান করা। চ আর ছ বিন্দুতে তিনটে কাঠি পরস্পরের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা থাকবে। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সে-ভাবে কাগজ কেটে, কাঠি আর সুতোর কাঠামোটা তার ওপর চাপিয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে হবে। ফেভিকল বা ড্রেনডাইট জাতীয় আঠা হলে তাড়াতাড়ি জুড়ে যাবে, জোড় শক্ত হবে আর নোংরাও কম হবে। কাগজটা কাটতে হবে কাঠামোর চেয়ে সামান্য একটু বড় করে, যাতে কাঠি ও সুতোর গা বরাবর কাগজের প্রান্ত আঠা দিয়ে মুড়ে দেওয়া যায়। ক, খ, ও গ বিন্দুতে তিনটে সুতো পিরামিডের মত বেঁধে কল তৈরি করতে হবে।



সাপ ঘুড়ি

কখ, গঙ ও ঘচ হচ্ছে তিনটে কাঠি। বাকি সব সরলরেখা হচ্ছে টান টান সুতো। দুটো কাঠি ছ ও খ সুতো বা আঠা দেওয়া ছোট কাগজ দিয়ে বাঁধতে হবে। খচ রেখার নিচে যে লেজটা ক্রমশ সরু হয়ে আসছে, তা মূল কাঠামোর চেয়ে আটগুণ বড় করতে হবে। ক বিন্দুর থেকে একটু নীচে ও খ বিন্দুর থেকে একটু ওপরে মাঝের কাঠির চারপাশে কল বাঁধো।

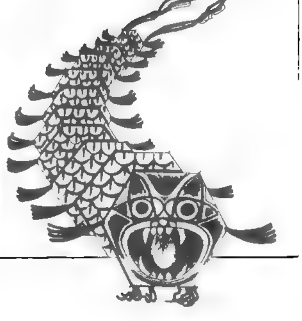


মৌচাক ও ড্রাগন ঘুড়ি

কঘ, খগ ও ঙচ হচ্ছে তিনটে কাঠি। ছ বিন্দুতে সুতো দিয়ে বা আঠা লাগানো কাগজ দিয়ে চেপে বাঁধতে হবে। বাকি সরলরেখাগুলো, অর্থাৎ ষড়ভুজের ধার বরাবর সুতো টানটান করে বাঁধতে হবে। গ ও ঘ বিন্দুতে আলাদা দুটো সুতো বেঁধে লেজ লাগালে ভারসাম্য বাড়বে। এরপর আগের নিয়মে ষড়ভুজ কাগজের ওপর কাঠামো আটকে দিলেই তৈরি হবে মৌচাক ঘুড়ি। কল বাঁধতে হবে ক, খ, ও ছ বিন্দুতে।

এরকম একাধিক মৌচাক তৈরি করে সুতো দিয়ে সমান্তরালভাবে সাজিয়ে নিলে ড্রাগনের মতো দেখাবে। সেক্ষেত্রে মৌচাকগুলো এক ফুট অন্তর সমান্তরালভাবে রেখে প্রত্যেকটার ক-বিন্দু ও খ-বিন্দু সুতো দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। অবশ্য পিছনের মৌচাকগুলো যদি ক্রমশ ছোট আকৃতির তৈরি করা হয়, তা হলে ওড়বার সময় দারুণ দেখতে হবে। তার ওপর প্রত্যেকটা মৌচাককে যদি রঙচঙে করে দেওয়া যায়, তা হলে তো কথাই নেই। অবশ্য যে কোনও ঘুড়ির বেলাতেই একথা প্রযোজ্য।

ধার বরাবর সুতোগুলো কাঠির সঙ্গে সরাসরি না বেঁধে কাঠির প্রান্তটা সামান্য চিরে সুতো ঢুকিয়ে দিলে আরও সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। এ-রকম টুকিটাকি আরও টিপস্ দেওয়া যায়, কিন্তু মাথা খাটিয়ে নিখুঁত সব সৃষ্টির যে আনন্দ, তা মাঠে মারা যাবে সব বলে দিলে।



চাবি হারানো

তারাপদ রায়



চাবি হারানো ছিল এক গুরুতর ব্যাপার। দশ-পনেরো দিন বাদে-বাদেই প্রায় নিয়মিত ঘটত ব্যাপারটা। চাবি হারিয়ে যেত, মা কিংবা ঠাকুমা চাবি হারিয়ে ফেলতেন। আজকালও লোকে চাবি হারায়। কিন্তু চাবি হারানো আর সেই সঙ্গে চাবি খোঁজার মধ্যে এখন আর তত ঘটা নেই। কারণ সবাই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। এখন আর কেউ হলফ করে বলতে পারে না যে, বাড়ির মধ্যেই সে চাবি হারিয়েছে। রাস্তায়, অফিসে, ট্রামে-বাসে কত জায়গায় পড়ে গিয়ে থাকতে পারে সেই চাবি। তাই বাসায় খোঁজা আর তেমন জোরদার হয় না। কিন্তু তখন চাবি হারালে বাড়ির মধ্যেই হারিয়েছে। গিন্নিদের শাড়ির আঁচলে ফশ্‌কা গিঁট দিয়ে বাঁধা থাকত চাবির তোড়া। তাঁরা কদাচিৎ বাড়ির বাইরে যেতেন। শুধু পুকুরঘাটে স্নান করতে যাওয়ার সময় বা জামাকাপড় বদলাবার সময় তাঁরা চাবি আঁচল থেকে খুলে অন্য কোথাও রাখতেন।

এই সময়েই ঘটত আসল গোলমাল। আমার মা এবং ঠাকুমা দু'জনেই ছিলেন চাবি সম্বন্ধে অতি সাবধানী। চাবি আঁচল থেকে খুলে খুব সাবধানে কোথাও রেখে দিতেন, বইয়ের তাকের পেছনে কিংবা বিছানার তোশকের নীচে, এই সব দুর্গম জায়গায়। এবং পরে অনেক সময়ে তাঁরা মনে করতে পারতেন না, ঠিক কোথায় চাবিটা রেখেছেন। প্রথমে আলগোছে কিছুটা খুঁজতেন, তারপরেও যদি না পেতেন তখন শুরু হত গোলমাল। চারপাশে গোঁজ-খোঁজ পড়ে যেত। আমরা ছোটরা সবাই মিলে লেগে যেতাম চাবি খুঁজে বের করার কাজে। বিছানা উলটিয়ে, খাট-চেয়ার-টেবিল সরিয়ে, আলমারির মাথায় উঠে, কুলুঙ্গি-তাক সমস্ত ঘেঁটে ওলটপালট করে আমরা চাবি খুঁজতাম। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত চাবি খুঁজতে, সকাল থেকে দুপুর, নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠত, চাবি খোঁজা চলছে তো চলছেই। তারপরে হয়তো চাবি পাওয়া যেত অন্য জায়গায়, ইঁদারার পাড়ে বা রান্নাঘরের তাকে। চাবি খোঁজার একটা নেশা ছিল। তা ছাড়া আমার মা আবার সওয়া পাঁচ আনার বাতাসার হরিলুট মানত করতেন চাবি ফেরত পাওয়ার জন্যে। ফলে সব সময় সত্যিই যে চাবি হারাত তা নয়। মা'কে একটু ভয় পেতাম, কিন্তু কখনও কখনও ঠাকুমা'র চাবি আমি আর দাদা নিজেরাই লুকিয়ে রেখে পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে উদ্ধার করেছি। কারণ ঠাকুমা'র চাবি খুঁজে দিলে শুধু হরিলুট নয়, নগদ বখশিসও পেতাম আমরা। ঝকঝকে তামার পয়সা কিংবা ডবল পয়সা, ঠাকুমা খুঁজে-পাওয়া চাবি দিয়ে তোরঙ্গ খুলে আমাদের বের করে দিতেন। সোনার টাকার মতো উজ্জ্বল ছিল সেই সব তামার পয়সা।

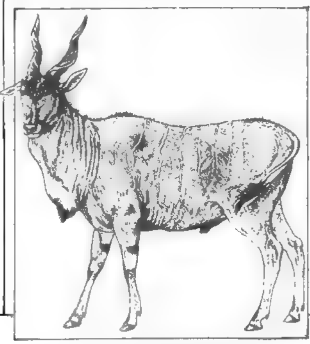
ছবি : প্রবীর সেন

জানা-অজানা

কৃষ্ণসার মৃগ ইল্যাণ্ড

বসুন্ধরা

কৃষ্ণসার মৃগ দেখতে বড় সুন্দর। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণসার মৃগের নাম ইল্যাণ্ড। এই ধরনের মৃগের মধ্যে ইল্যাণ্ড আকারে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সৌষ্ঠবপূর্ণ। তাদের শিং চার ফুট লম্বা এবং শিং-এর গাঁটগুলো প্যাঁচানো। এই শিংগুলো ফাঁপা। অনেক কৃষ্ণসার মৃগ একটা সময়ের পর তাদের পুরনো শিং ফেলে দেয়, তাদের আবার নতুন শিং গজায়। ইল্যাণ্ড কিন্তু তা করে না। শিং-এর প্যাঁচগুলো দেখে তাই ইল্যাণ্ডের বয়েস বোঝা যায়। অবশ্য সব সময় এ-কথা খাটে না, কারণ অনেক হরিণের শিং-এ কোনও চক্করই দেখা যায় না। মেয়ে-পুরুষ দু'জাতের ইল্যাণ্ডেরই গলকম্বল আছে। মধ্য এশিয়া ছিল এদের আদি চারণভূমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরা আফ্রিকাকেই বাসভূমি হিসেবে বেছে নিল। এদের পাঁচটি প্রজাতির মধ্যে পশ্চিম সুদানি ও পূর্ব সুদানি ইল্যাণ্ডই আকারে সবচেয়ে বড়। আর একটি প্রজাতি এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—এটিও ইল্যাণ্ড জাতীয়। এরা হল আফ্রিকার বঙ্গো হরিণ। ইল্যাণ্ড গভীর অরণ্যে বাস করে এবং ফল-মূল ও পাতা খেতে ভালবাসে। এরা একলা বা জোড়ায়-জোড়ায় চরে বেড়ায়। এদের বারবার তেষ্টা পায়। পশ্চিম ও পূর্ব সুদানি অতিকায় ইল্যাণ্ড ছয় থেকে পঁচিশটির দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এরা খুব সহনশীল। আফ্রিকার প্রচণ্ড গরম এরা গ্রাহ্য করে না। এরা খাদ্যের খোঁজে দূরদূরান্তে ঘোরাফেরা করে। এরা ঘামে কম। তাই এদের শরীরের জলীয় ভাগ সামান্যই হ্রাস পায়। মেয়ে-ইল্যাণ্ডের কপাল ঘিরে লোমের গুচ্ছ থাকে না। কিন্তু পুরুষ-ইল্যাণ্ডের কপাল ঘিরে থাকে জমকালো লোমগুচ্ছ। মেয়ে-ইল্যাণ্ডের গায়ের রং হালকা হলুদ ও বালি-বালি। বয়েস বাড়লে নীল-ধূসর রঙের পুরুষ-ইল্যাণ্ডের গায়ের রং একেবারে সাদা হয়ে যায়। ইল্যাণ্ডের বাচ্চারা জন্মানোর সাতদিন পর থেকে হাঁটতে শুরু করে। এরা অনেকদিন পর্যন্ত মায়ের দুধ খায়। মোষ বা অন্যান্য গৃহপালিত পশুর চেয়ে ইল্যাণ্ডের কর্মশক্তি অনেক বেশি। দুর্ভিক্ষের সময় এরা কাঁটা গাছ খেয়েই নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। এদের বৈশিষ্ট্য হল, আফ্রিকার ভয়ঙ্কর ঘুম-পাড়ানি রোগবাহী সি-সি মাছির কামড়ের প্রতিষেধক এদের শরীরে আছে।



এবারের আশ্বিনে

রথীন্দ্র সেনগুপ্ত

আমরা এখানে মালিন্য নিয়ে থাকি,
আমরা এখানে পিঞ্জরে পোষা পাখি।
মাথার উপর বিশাল আকাশ চাই না,
বুক ভরাবার অমল বাতাস পাই না,
সবুজ বনের গন্ধ-জড়ানো মাটি,
নেই, তাই কালো পাঁকের মধ্যে হাঁটি।
কিছুদিন এই জীবনটা পাল্টাব,
এবার ছুটিতে শিলং পাহাড়ে যাব।
আমরা ক'জন নবীন, বয়সে কাঁচা,
জীবনের রসে ভরপুর হয়ে বাঁচার।
স্বাদ নিতে যাব এবারের আশ্বিনে,
পাহাড়িয়াদের হাসি-কান্নাকে চিনে।
তাদের সঙ্গে হাটেবাটে বনে-বনে।
পায়ের চিহ্ন রেখে যাব গৃহকোণে।
আকাশে-শৃঙ্গে ওড়াব খুশির তুলো,
ঘষে মেজে নেব হৃদয়ের জং-গুলো।



শুধাও গিয়ে

প্রভাকর মাঝি

কালকে ছিল আকাশটা এক
ছিচকাঁদুনি মেয়ে,
খিলখিলিয়ে আজ হাসছে যে কার
হঠাৎ সাড়া পেয়ে।
টকটকে নীল আরশিতে মুখ
দেখতে দেখতে ক্রমে
তুলোর মতো মেঘরা মনে
স্বপ্ন হয়ে জমে।
কংসাবতীর বাঁকে বাঁকে
হিজল তোলার আগে,
বকের পালক কাশের গুচ্ছির
দোলন কেমন লাগে!
জোর কদমে হচ্ছিল পাঠ,
অমনি গুটি গুটি
কে ঢং ঢং ঘণ্টা দিল,
ছুটি। ছুটি। ছুটি।
কু- ঝিক-ঝিক ডাফরিন ব্রিজ,
পার হল এক্সপ্রেস,
লোক-গিজগিজ, জম্মু নাকি
জামতাড়াতে শেষ?
শান্ত তাকে করল কে কাল
ফুঁসছিল যে নদী,
শুধাও গিয়ে শিউলিকে, ও
বলতে পারে যদি।



এবার পুজোয়

হিমাংশু জানা

এবার পুজোয় যেতে পারি
পিসির বাড়ি কাতলামারি,
মাসির বাড়ি গাদিয়াড়া।
থাকেন মামা পাইকপাড়ায়।
সেখানেও যাবার কথা।
ভিলাই যেতে স্বর্ণলতা
বলে গেছে গত মাসে।
ভয় করে সোলপাট্টা বাসে।
নইলে যেতাম বরঙ্গিতে।
যাবার জায়গা পৃথিবীতে
বহু আছে। খাদিনানে
কী যে খাতির, আদি জানে!
উঠতে-বসতে খালি খাওয়া।
হয়েছিল বালি যাওয়া
সেই যে কবে! ইচ্ছে রুমার,
ঘুরে আসে নন্দকুমার।

ছবি প্রবীর সেন

ডোরাকাটা জামা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : ইস্কুলের ফাংশানে নানারকম মজার কাণ্ড। বেঁটে ও লম্বুর হাত থেকে নিতুকে উদ্ধারের পর বেঁটে পালাল। লম্বু অর্থাৎ সুদর্শনের হার্ট-অ্যাটাক হল। পুলিশ উইলিয়ামসনের পোড়ো বাংলো খুঁড়ে অনেক সোনার বিস্কুট পেল। নিতুকে নিয়ে কমল ভৌমিক ওই বাংলো দখল করতে গিয়ে পুলিশের ঝগড়া দেখে জঙ্গলে চলে গেলেন। অনেক খুঁজে কমল ভৌমিককে পাওয়া গেল। তিনি ফুলে গেছেন। সুকু ভোরবেলা উঠে দেখল, উইলিয়ামসনের কুকুর গোলা মরে পড়ে আছে। চাঁদপাল ছুটল কফিন আনতে। ডক্টর মুখার্জি একটা নতুন চাদর এনে গোলাকে ঢেকে দিলেন। ডোরাকাটা পাজামা-চাইনিজ কোট পরে সুদর্শন হাজির। ডক্টর মুখার্জি সুদর্শনকে পরীক্ষা করছিলেন। এমন সময় পুলিশ-কুকুর নিয়ে পুলিশ এসে কমল ভৌমিককে থানায় ধরে নিয়ে গেল। থানায় তখন হচপচ অবস্থা। ডক্টর মুখার্জি এস-পি'র বাংলোয় গেলেন। কমল ভৌমিককে অ্যারেস্ট করা যে ঠিক হয়নি এই নিয়ে তিনি এস· পি'র সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। তারপর…



টুকটুকে লাল একটা গাড়ি, তার পেছনে ধপধপে সাদা একটা গাড়ি। সাদা গাড়িটার পেছনের কাচে ক্রস। লাল গাড়িটার ডান দিকের বনেটের পাশ দিয়ে লিকলিকিয়ে উঠেছে একটা অ্যান্টেনা। সামনের আসনের কাছে ওপর থেকে ঝুলছে একটা টেলিফোন ওয়্যারলেস।

লাল গাড়িতে এস· পি·। নিজেই চালাচ্ছেন। সাদা গাড়িতে ডাঃ মুখার্জি। যেখানে এই শহরের জলের পাম্প আর বিশাল সেই শিশুগাছ, মুখোমুখি সেইখানে দেখা হয়ে গেল অপূর্ব সেই পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে। কাদা মেখে ভূত। একজনের মাথার ওপর ডোবার পানা চলার তালে-তালে দুলছে। কাদা ভর্তি বুট বুজুর-বুজুর শব্দ ছাড়ছে।

এস· পি· প্রথমে ভেবেছিলেন, 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' হচ্ছে। একটু চিন্তার পর ধারণাটা ঝেড়ে ফেললেন। এরা পুলিশ। তাঁরই বিখ্যাত পুলিশবাহিনী। রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করালেন। দরজা খুলে নেমে, গলা উঁচিয়ে হাঁকলেন, "হল্ট।"

বাহিনী থামল না। এগিয়েই চলল। থামবে কী! সবাই তো ঘুমোচ্ছে। গত দু'রাত্রি ঘুম নেই। পাঁক জলে ভেজা ইউনিফর্ম। যত বাতাস লাগছে শরীর তত জুড়োচ্ছে। প্যারেড করা অভ্যাস। সেই অভ্যাসে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে হেঁটে চলেছে। সোজা রাস্তা। পিচ ঢালা, মসৃণ।

এস· পি· আবার হাঁকলেন, "হল্ট।"

তখন তাঁর সামনে শেষ হাবিলদারটি। বেচারার ঘুম খুব পাতলা। আচমকা 'হল্ট' শুনে তার চটকা ভেঙে গেল। সে ভয়ে উলটো দিকে দৌড় মারল। তালের ঠিক ছিল না। সোজা গিয়ে শিশুগাছে ধাক্কা মেরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

ডাক্তারবাবু বললেন, "কাদের হল্ট বলছেন? সবাই তো ঘুমোচ্ছে। সারির প্রথম তিনজনের নাক ডাকছে।"

"এদের এই অবস্থা করলে কে? এমন পাঁকে পড়া মোষের অবস্থা?"

তিনি গটমট করে এগিয়ে গিয়ে সারির বিশালবপু প্রথম পুলিশটিকে হাতের আঙুল দিয়ে ভুঁড়িতে একটা খোঁচা মারলেন। আঙুলে জলকাদা লেগে গেল। মুখটা বাঁকালেন। বিরাট চিৎকার করে বললেন, "অ্যায়।"

সে কোনওরকমে চোখ খুলে বললে, "ক্যায়?"

এস· পি'র খুব অপমান-ভাব জাগল। এস· পি কে বলছে, ক্যায়। স্যালুট-ফ্যালুট নেই, কিচ্ছু নেই।

আবার বললেন, "অ্যাই।"

পুলিশ বললে, "ক্যাই?"

কেউ থেমে নেই। পুলিশের মিছিল চলেছে। এস· পি· পাশে মার্চ করছেন। ডাক্তারবাবুও হাঁটছেন। ডাক্তারবাবু বলছেন, "ব্যর্থ চেষ্টা। এরা ফেটিড্গ। ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে চলে গেছে। রাগ করবেন না।"

এস· পি· তখন দু'হাত দিয়ে পুলিশটিকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। তার ঘুম ছুটে গেল। চিনতে পারলেন এস· পি·কে। সঙ্গে-সঙ্গে 'অ্যাটেনশান'-এর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পেল্লায় এক স্যালুট ঠুকল।

"ঘুমিয়ে পড়েছিলুম স্যার।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাওয়া হয়েছিল কোথায়? যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"

"স্যার, থানায় যাচ্ছি।"

"থানা কোন্ দিকে বাবু?"

লোকটি হকচকিয়ে গেল। অসহায় ভাবে এদিকে ওদিকে তাকাল, "থানা তো এই দিকেই ছিল স্যার।"

এস· পি· এবার ভীষণ রেগে বললেন, "অ্যাবাউট টার্ন। ফরোয়ার্ড মার্চ।"

হয়েছিল কী! ঘুম-চোখে চার মোহনায় বাঁক নিতে ভুল করেছিল। তারপরে তো গভীর ঘুম। আগে চলেছে পাঁক-মাখা পুলিশের সার। তার পেছনে ধীরে চলেছে দু'খানা গাড়ি।

ডিকি কুকুরের চেনটা গারদের লোহার সঙ্গে বেঁধে, প্যান্টের পকেট থেকে একটা রবারের টুকরো বের করে তাঁর কুকুরকে চিবোতে দিলেন। রবারের টুকরোটা ঠিক একটা হাড়ের মতো দেখতে। ডিকির

সেপহার্ড ডগ মনের আনন্দে কাঁউ-কাঁউ করে চিবোতে লাগল। গন্ধ শুঁকে চোর-বদমাশ ধরার বুদ্ধি আছে ; কিন্তু গন্ধ শুঁকে হাড় কি রবার, বোঝার ক্ষমতা নেই। হায় ভগবান ! কুকুরের কাণ্ড দ্যাখো !

ডিকি মনে-মনে এইসব ভাবতে ভাবতে একটা সিগারেট ধরালেন। সকাল থেকে যা ঝামেলা গেল, এখন একটা সিগারেট পাওনা হয়েছে। চেয়ারে বসতে-না-বসতেই ঝনঝনিয়ে ফোন বেজে উঠল।

"হ্যালো।"

"ডুমারাওগঞ্জ পি· এস· ?"

"ইয়েস।"

"আর ইঞ্জিরি বলতে হবে না। খুব হয়েছে। জল ট্যাঙ্কির কাছে শিশুগাছের তলায় তোমাদের একজন পুলিশ চোখ উলটে পড়ে আছে যে গো।"

"সে আবার কী ? মরে গেছে না বেঁচে আছে ?"

"নাক দিয়ে কী রকম একটা শব্দ বেরোচ্ছে।"

"বুকটা ওঠানামা করছে কি ?"

"অতশত বলতে পারব না। কাছে গিয়ে কে দেখবে ? তারপর হঠাৎ উঠে যদি পেটাতে শুরু করে ?"

"তুমি কে ?"

"তা তো বলব না। আমি কি অত বোকা ছেলে ! নাম বলে জেলে যাই আর কি ?'

ফোন কেটে গেল। ডিকি সিগারেটে এক টান মেরে সকলে শুনতে পায়, সেইরকম গলায় বললেন, "শহরটাকে দেখছি ভূতে ধরেছে। শিশুগাছের তলায় শুয়ে আছে বুড়ো পুলিশ।"

কমল ভৌমিক গারদের ভেতর থেকে বললেন, "একটা আয়না আছে ভাই। আয়না ?"

ডিকি বললেন, "আয়না কী হবে ?"

"চেহারাটা একবার দেখতুম, কতটা ফুলেছি।"

"আয়নার বায়না করতে নেই, ছিঃ। এটা যে থানা !"

সেকেন্ড অফিসার করুণ মুখে ঘরে ঢুকলেন। বেশ বোঝাই যায়, কিছু একটা হয়েছে। চেয়ারে আধ-বসা হয়ে বললেন, "আপনার কাছে পেট-খারাপের দাওয়াই আছে ?"

"আমার কাছে সিগারেট ছাড়া কিছুই নেই।"

"থানার মাঠে একটা বেলগাছ ছিল। গত বছর দুম্ করে কেটে দিলে।"

"কেটে দিলে কেন ? বেলগাছ শুনেছি কাটতে নেই।"

"আরে, সেই কাটার পর থেকেই তো যত গোলমাল শুরু হয়েছে।"

"এইমাত্র ফোন এসেছিল।"

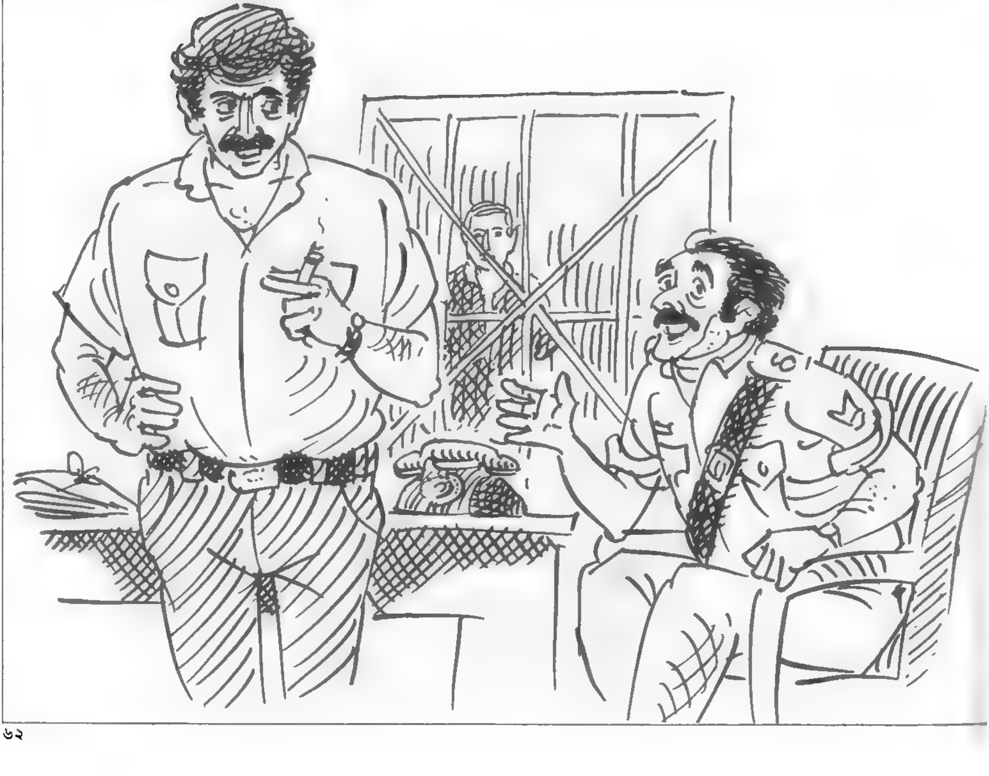
সেকেন্ড অফিসারের চোখ বড়-বড় হল, "কার ? কার ফোন ?"

"নাম বললে না ; শুধু একটা সুসংবাদ দিলে।"

"পেয়েছে ? পেয়ে গেছে ?"

"কী পাবে ?"

সেকেন্ড অফিসার সামলে গেলেন, "না, মানে, অনেকে অনেক



সময় অনেক কিছু পায় তো!"

"পেয়েছে। গাছতলায় একটা পুলিশ কুড়িয়ে পেয়েছে।"

চার্চের সামনে গোলার শব মিছিল পৌঁছে গেছে। ফাদার টাইসন বেরিয়ে এলেন। ছোট একটা তামার পাত্র থেকে একটা তামার দণ্ড দিয়ে গোলার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন জর্ডন নদীর জল। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, "In the Lord put I my trust : how say ye to my soul. Flee as a bird to your mountain?" আবার জল ছিটিয়ে দিলেন তিনবার।

খোলা কফিনে গোলা শুয়ে আছে ফুলের বিছানায়। মুখটুকু জেগে আছে। এবার যেন হাসি ফুটেছে মুখে। একটু পরে গোলাকে আর দেখা যাবে না। চলে যাবে মাটির তলায়। উইলিয়ামসনের পোড়ো বাংলোর শেষ প্রহরী চলে গেল। বারো বছরের সুন্দর একটা জীবন শেষ হয়ে গেল।

সুকু চার্চের অফিসঘরে ঢুকে একটা কাগজে লিখল, 'গোলা, আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসতুম। তুমি চলে গেলে, আমি রইলুম। তোমার সঙ্গে আবার যেন দেখা হয়!'

ফ্লোরিস্টের মেয়ে মেরি ফুলের মতো জামা পরে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ফুলের মতো সুকুর বয়সী একটি মেয়ে। কাঁধের পাশ দিয়ে মুখটা ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী লিখলে সুকুদা?"

সুকু ইংরেজি করে শোনাল। শোনাতে-শোনাতে সুকুর চোখে জল এসে গেল। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছে, উইলিয়ামসনের মেয়ের সমাধির পাশে বসে আছে গোলা। সে টিফিন-ক্যারিয়ারে করে খাবার এনেছে। মা সব গুছিয়ে দিয়েছেন। ভাত, ডাল মাংস। গরমে গোলা এক বাটি টক দই খেত। গোলার কোনও লোভ ছিল না। সুকুকে সে ভীষণ ভালবাসত। গোলা লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসত। সামনের দুটো পা বুকের ওপর রেখে সুকুর সামনে উঠে দাঁড়াত। গোলার মুখটা তখন চলে আসত সুকুর মুখের কাছে। সুকুর গাল দুটো চেটে দিয়ে নেমে দাঁড়াত। টিফিন-ক্যারিয়ারটা নামিয়ে রেখে সুকু ঘাসের ওপর বসে পড়ত। গোলার মাথায়, গলায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিত। গোলা ছিল মানুষের চেয়েও পরিষ্কার। সে নিজে-নিজেই চান করত। পেয়ারাপাতা চিবিয়ে দাঁত পরিষ্কার রাখত। সুকুর একবার জ্বর হয়েছিল, তখন খাবার আনতেন সুকুর মা। গোলাকে বলতেন, "ছেলেটা জ্বরে পড়ে গেছে বাবা।" গোলা সেই সময় নিজে-নিজেই সুকুকে দেখতে এসেছিল। সকলে অবাক। এমনও হয়! আরও অবাক কাণ্ড, উইলিয়ামসনের বাগানে তখনও গোলাপ ফুটত। গোলা মুখে করে বড় একটা সাদা গোলাপ এনেছিল। কাঁটার খোঁচায় নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। সে দৃশ্য ভোলার নয়। সেই গোলাপটা এখনও আছে স্বচ্ছ একটা প্লাস্টিকের কৌটোয়। শুকিয়ে গেলেও গোলাপের আকৃতি গোলাপের মতোই আছে।

পুরনো সেইসব কথা চিন্তা করতে করতে সুকু আর-একবার কেঁদে ফেলল। সুকুর চোখে জল দেখে মেরিও কেঁদে ফেলেছে। মেরি সুকুকে ভীষণ ভালবাসে। মনে-মনে বলে, "আমার পাগলা-দাদা।" মুখটা ঠিক যেন যিশুখ্রিস্টের মতো। চোখ দুটোয় সব সময় কেমন যেন একটা দুঃখ লেগে আছে। মেরি সুকুর গালে গাল ঠেকিয়ে বললে, "তুমি কেঁদো না। তোমার কান্না দেখে আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে।"

ফাদার আমহার্স্ট ওপাশে বসে লিখছিলেন, তিনি শোকার্ত এই ছেলেমেয়ে দুটির ভালবাসা দেখে, আপন মনে বলে উঠলেন, "হেভ্‌ন, হেভ্‌ন।"



মেরি তার হাত থেকে টেনে-টেনে ছোট্ট-ছোট্ট চুড়ি দুটো খুলে ফেলল, তারপর সুকুর হাতে দিয়ে বললে, "তোমার ওই লেখাটার সঙ্গে এই চুড়ি দুটোও দিয়ে দাও দাদা। এই চুড়ি দুটো আমার খুব প্রিয়। গোলার সঙ্গে থাক।"

সুকু মেরির মুখের দিকে তাকাল। ফুলের মতো সুন্দর। দু'চোখে টলটল করছে জল। সুকু বললে, "তোমার বাবা বকবেন।"

"না না, বাবা বকবে না। বাবা আমাকে ভীষণ ভালবাসে। তোমাকেও খুব ভালবাসে।"

"আমি তা হলে আমার এই গলার লকেটটাও দিয়ে দিই?"

"না না, ওটা তো তোমার ঠাকুর।"

"তাতে কিছু হবে না। আমার ঠাকুর গোলারও ঠাকুর, তোমারও ঠাকুর।"

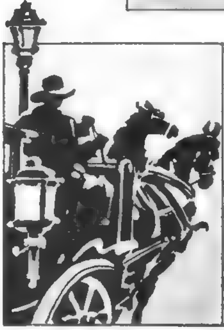
সুকু আর মেরি চার্চের অফিস থেকে বেরিয়ে এল। শব-মিছিল আবার চলতে শুরু করল। উইলিয়ামসনের বাংলোর অনেকটা ভেঙে ফেলেছে, তবে বেশ কিছুটা আছে। বাড়িটাকে মাঝামাঝি জায়গা থেকে ফাটিয়ে দিয়েছে। আধখানা আছে, আধখানা মাটিতে। গেট দুটো আছে। মিছিল ঢুকে পড়ল বাগানে। সাহেবের মেয়ের সমাধিটা এখনও ঠিক আছে। সুকু অবাক হয়ে দেখল, মা দাঁড়িয়ে আছেন অনেক ফুল হাতে।

(ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

খালি বাড়ি

আগে যা ঘটেছে : ধীর-স্থির সম্ভ্রান্ত যুবক রোনালড অ্যাডেয়ারের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লন্ডন তোলপাড়। হোমস এবং ওয়াটসন বেরিয়ে পড়লেন। গন্তব্যস্থল একটা নির্জন খালি বাড়ি। অন্ধকারে দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একটি ছায়ামূর্তি খুব সাবধানে গুড়ি মেরে ঘরের মধ্যে ঢুকল। তার হাবভাব অনেকটা হিংস্র বন্য জন্তুর মতো। লোকটার হাতে বন্দুক। বন্দুকের কুঁদোটা বেশ জুত করে বাগিয়ে ধরে লোকটা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। তারপরই আঙুল ট্রিগারের ওপর চেপে বসল। সঙ্গে সঙ্গে হোমস বাঘের মতো সেই লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চিত করে ফেলল। হোমসের বাঁশির আওয়াজ শুনে ঘরে ঢুকল দু'জন কনস্টেবল আর একজন সাদা পোশাক-পরা ডিটেকটিভ। তারপর···



একটু থেমে হোমস বললে, "এটা একটা অসাধারণ অস্ত্র," তারপর বললে, "দারুণ জোরে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করবে, অথচ শব্দ হবে না একটুও। অন্ধ জার্মান কারিগর ফন হার্ডারকে আমি জানতুম। প্রোফেসর মরিয়ার্টি এই অস্ত্রটা ওকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিল। এটার কথা আমি অনেক দিন ধরে শুনছি, তবে আজই প্রথম জিনিসটা চাক্ষুষ করলুম। লেস্ট্রেড এই এয়ারগানটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করবে। আর কী ধরনের বুলেট এতে লাগে সেটাও দেখবে।"

"সে-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, মিঃ হোমস," বলে লেস্ট্রেড চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালে, "আর কিছু বলতে চান নাকি ?"

"হ্যাঁ, একটা কথা। কর্নেলের নামে কী অভিযোগ আনবে ভাবছ ?"

"কেন ?" লেস্ট্রেড রীতিমত অবাক হয়ে হোমসের দিকে চাইল। "মিঃ শার্লক হোমসকে খুন করার চেষ্টার জন্যে কর্নেলকে অভিযুক্ত করা হবে।"

"না, লেস্ট্রেড। এ-ব্যাপারটার সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না। আজকের এই আশ্চর্য উপায়ে গ্রেফতার করার সমস্ত কৃতিত্ব তোমার, শুধু তোমারই। হ্যাঁ লেস্ট্রেড, আমি তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সত্যি যেরকম বুদ্ধির প্যাঁচে আর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তুমি একে গ্রেফতার করলে, তার জন্য তোমাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না।"

"গ্রেফতার করলুম ? কাকে গ্রেফতার করলুম, মিঃ হোমস ?"

"যাকে ধরবার জন্যে সমস্ত পুলিশবাহিনী হন্যে হয়ে ঘুরছে। সেই কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান, যিনি অনারেবল রোনাল্ড অ্যাডেয়ারকে তাঁর ৪২৭ নম্বর পার্ক লেনের বাড়ির দোতলা ঘরে এয়ারগানের এক্সপ্যান্ডিং বুলেট দিয়ে খুন করেছিলেন গত মাসের ৩০ তারিখে। এই অভিযোগেই তুমি কর্নেলকে অভিযুক্ত কোরো।···এখন ওয়াটসন, যদি ভাঙা জানলা দিয়ে বয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাসে তোমার ঠাণ্ডা লাগবার ভয় না থাকে তো চলো সিগার খেতে খেতে একটু গল্পটল্প করা যাক।"

মাইক্রফট হোমস আর মিসেস হাডসনের চেষ্টায় আমাদের পুরনো বাসাটি আগের মতোই আছে। তবে ঘরে পা দিতেই প্রথমে যেটা নজরে পড়ে সেটা হল যে, ঘরদোর বড় বেশি সাজানো-গোছানো। কিন্তু আগেকার অগোছাল দিনের কিছু-কিছু ছাপ ঘরের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরের যেদিকটায় হোমস তার নানান ধরনের রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত, সেই দিকের দেওয়ালেও কাচের একটা টেবিলে নানান রাসায়নিক দ্রব্যের ছাপছোপ লেগে রয়েছে। ঘরের একপাশের বইয়ের র‍্যাকে বড় আকারের দুটো বিরাট-বিরাট টুকরো খবরের খাতা। আমি জানি লন্ডনে এমন বহু লোক আছে যারা ওই খাতা দুটো নষ্ট হয়ে গেলে খুবই খুশি হবে। হোমসের বিচিত্র সব নক্শা, বেহালার বাক্স, পাইপের তাক, এমনকী সেই পার্শিয়ান চটিটি যার মধ্যে হোমসের তামাকের থলি থাকে, সব কিছুই আমার নজরে পড়ল। ঘরের ভেতরে দু'জনকে দেখতে পেলুম। একজন মিসেস হাডসন। আর একজন নকল শার্লক হোমস। আজকের সন্ধের এই অ্যাডভেঞ্চারে এই অদ্ভুত মূর্তিটার পার্টও বড় কম নয়। মূর্তিটা শার্লক হোমসের একটা মোমের আবক্ষ প্রতিমূর্তি। খুব সুন্দর করে তৈরি। একটা নিচু টেবিলের ওপর ওই আবক্ষ মূর্তিটা রাখা। হোমসের একটা ড্রেসিংগাউন মূর্তিটার গায়ে চাপানো। তাতে সব ব্যাপারটা বেশ স্বাভাবিক আর জীবন্ত হয়ে উঠেছে।"

"মিসেস হাডসন, আমি যেমন-যেমন বলেছিলুম আপনি সেগুলো ঠিকমতো করেছিলেন তো ?"

"হ্যাঁ। আপনার কথামতো আমি হামাগুড়ি দিয়ে ওটার কাছে গিয়েছিলুম।"

"চমৎকার। আপনি একদম নিখুঁতভাবে সবকিছু করেছেন। বুলেটটা কোন্ দিকে গিয়েছিল, খেয়াল করেছিলেন কি ?"

"হ্যাঁ। আপনার এই সুন্দর আবক্ষ মূর্তিটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। গুলিটা মূর্তির মাথা ভেদ করে দেওয়ালে গিয়ে লাগে। কার্পেটের ওপর গুলিটা পড়ে ছিল দেখে তুলে রেখেছি। এই যে সেই গুলিটা।"

হোমস বুলেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিলে, "ওয়াটসন, তুমি জানো নিশ্চয়ই যে এ-ধরনের বুলেটকে বলে সফ্ট রিভলভার বুলেট। লোকটা সত্যিই প্রতিভাশালী। এয়ারগান থেকে এ-ধরনের বুলেট ছোঁড়ার কথা কারও মাথাতেই আসবে না। ঠিক আছে মিসেস হাডসন, আপনি যা করেছেন তার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার ছুটি। আপনি এখন যেতে পারেন। আর ওয়াটসন, তুমি তোমার নিজের চেয়ারে গিয়ে বোসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এই কেসটার বেশ কটা পয়েন্ট তোমার সঙ্গে আলোচনা করে নিতে চাই।"

হোমস গা থেকে সেই পুরনো তেল চিটচিটে ওভারকোটটা খুলে ফেলেছিল। এখন হোমসকে ঠিক আগের মতো দেখাচ্ছিল। হোমস

মূর্তির গা থেকে ওর ধূসর রঙের ড্রেসিংগাউনটা তুলে গায়ে চাপিয়ে নিলে।

"এ-কথা মানতে হবে যে, বয়েস হলেও আমাদের এই বৃদ্ধ শিকারির নার্ভ এখনও বেশ শক্ত আছে, আর চোখের দৃষ্টিও রীতিমত প্রখর।" নিজের আবক্ষ মূর্তির প্রায় উড়ে-যাওয়া খুলিটার দিকে তাকিয়ে হোমস্ হাসতে হাসতে বললে।

"ঠিক খুলির পিছনে গিয়ে বুলেটটা লেগেছে। তারপর মস্তিষ্ক ছেঁদা করে বেরিয়েছে। ভারতবর্ষে ওর মতো অব্যর্থ লক্ষ্য আর দ্বিতীয় কোনও লোকের ছিল না। তুমি কি ওর নাম শুনেছিলে?"

"না, আমি ওর নাম শুনিনি।"

"সে কী! এত নাম! অবশ্য আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তুমি তো প্রোফেসর জেমস মরিয়ার্টির নামই শোনোনি। মরিয়ার্টির মতো এরকম ধুরন্ধর শয়তান তো এই শতাব্দীতে জন্মায়নি। বইয়ের র‍্যাক থেকে জীবনীর যে নির্ঘণ্টটা আছে সেটা দাও তো।"

হোমস তার আরাম-চেয়ারে বসে আরাম করে হেলান দিয়ে সিগারের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তার জীবনীসংগ্রহের নির্ঘন্টের পাতা ওলটাতে লাগলে।

"'এম' দিয়ে শুরু নামের তালিকাটা বেশ জবরদস্ত। মরিয়ার্টির হাটহদ্দ সব কিছু লেখা আছে। শুধু মরিয়ার্টিকে নিয়েই একটা বই লেখা যায়। তারপর হচ্ছে মরগান। লোকটা বিষ দিয়ে লোক মারতে পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। তারপর দেখছি মেরিডিউ। লোকটা এত জঘন্য প্রকৃতির যে, ওর নাম উচ্চারণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। তারপর ম্যাথু। লোকটা চেয়ারিং ক্রশ স্টেশনে আমার বাঁ দিকের শ্বদন্তটা উপড়ে ফেলেছিল। তারপর রয়েছে আমাদের আজকের সন্ধ্যার অতিথি।"

হোমস খাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিলে। আমি পড়লুম 'মোরান, সেবাস্টিয়ান, কর্নেল। এখন বেকার। আগে বাঙ্গালোর পাইওনিয়ারের প্রথম বিভাগে চাকরি করত। লন্ডনে আঠারোশো চল্লিশ সালে জন্ম। বাবার নাম স্যর অগস্টস মোরান, সি বি। (ইনি কিছুকাল পারস্যদেশে ব্রিটিশ মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিলেন) শিক্ষা ইটনে ও অক্সফোর্ডে। জোওয়াকি যুদ্ধে ও আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া চরসিয়ার, শেরপুর এবং কাবুলেও কাজ করেছেন। হেভি গেমস্ ইন ওয়েস্টার্ন হিমালয়াস (১৮৮১) এবং থ্রি মান্থ্স ইন দ্য জাঙ্গল্ (১৮৮৪) নামে দুটি বইয়ের লেখক। ঠিকানা কনডুইট স্ট্রিট। দি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, দ্য ট্যাংকারভিল, দ্য ব্যাগাটেল কার্ড ক্লাবের সভ্য।'

এরপর হোমসের হাতের গোটা গোটা অক্ষরে পরিষ্কার লেখা 'লন্ডন শহরের দু'নম্বর সাঙ্ঘাতিক লোক।'

হোমসকে খাতাখানা এগিয়ে দিয়ে আমি বললুম, "খুব আশ্চর্য ব্যাপার তো! লোকটির সম্বন্ধে যা লেখা, তাতে তো বেশ সম্ভ্রান্ত ও সৎ সৈনিক বলেই মনে হয়।"

হোমস বললে, "সে-কথা ঠিক বটে। অনকেদিন পর্যন্ত ও বেশ সহজ সরল লোক ছিল। তবে লোকটার ধাত খুব কড়া। ওর সম্বন্ধে একটা কথা এখনও ভারতবর্ষে চলে। সেটা হল যে, একবার ও একটা আহত নরখাদক বাঘকে নর্দমার ভেতরে তাড়া করেছিল। বুঝলে ওয়াটসন, অনেক গাছ দেখবে যেগুলো কিছু দূর পর্যন্ত খাড়া উঠে গেছে আর তারপরই গাছটা বেঁকেচুরে একটা কিম্ভূত রূপ ধরেছে। এই ব্যাপারটা মানুষের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। আমার একটা থিয়োরি আছে। সেটা হল যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তার বংশের প্রকৃতি আর ধারা প্রকাশ পায়। তবে কখনও কখনও হঠাৎ কোনও একজনের মধ্যে তার পূর্বপুরুষের একজনের চরিত্রের দোষ-গুণ, ভালমন্দ খুব বেশি ভাবে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ সেই লোকটি হঠাৎই খুব বেশি রকমের ভাল বা খারাপ হয়ে উঠতে পারে। ফলে সেই লোকটি তার বংশের ভাল-মন্দের প্রতীক হয়ে ওঠে।"

আমি বললুম, "এটা একটু মাত্রাছাড়া কল্পনা হয়ে যাচ্ছে না।"

"যাকগে, এ-ব্যাপারে আমি তোমার ওপর জোর-জবরদস্তি করতে চাই না। তবে কারণ যাই হোক না কেন, কর্নেল মোরান ক্রমশ খারাপ হয়ে যেতে লাগল। শেষকালে অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে, ওর পক্ষে ভারতবর্ষে বাস করাই দায় হল। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে মোরান লন্ডনে ফিরে এল। কিছুদিনের মধ্যেই লন্ডন শহরের কুখ্যাত লোকেদের মধ্যে মোরান বেশ আসর জমিয়ে বসলে। ক্রিমিনালদের মধ্যে ওর যখন বেশ নামডাক হয়েছে, তখনই মরিয়ার্টি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিছুদিনের মধ্যেই ও মরিয়ার্টির ডান হাত হয়ে ওঠে। মরিয়ার্টি ওকে প্রচুর টাকা-পয়সা দিত। আর খুব দরকার না পড়লে মোরানকে কোনও কাজে লাগাত না। যেসব কাজ খুব শক্ত, যেসব কাজ সাধারণ খুনে-গুণ্ডাদের দিয়ে হবার নয়, সেই ধরনের কাজের ফয়সালা করতেই মোরানের ডাক পড়ত। আঠারোশো সাতাত্তর সালের মিসেস স্টুয়ার্টের খুনের ব্যাপারটা তোমার মনে আছে কি? বুঝলে ওয়াটসন, আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, ওটা মোরানেরই কাজ। তবে কোনও কিছুই প্রমাণ করা যায়নি। মোরানকে ওরা এমন লুকিয়ে লুকিয়ে রাখত যে মরিয়ার্টির দল যখন ধরা পড়ল তখন মোরানের সঙ্গে মরিয়ার্টির কোনও যোগাযোগই আমরা প্রমাণ করতে পারলুম না। যেদিন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে তোমার বাড়ি যাই, সেদিনের কথা তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই। সেদিন আমি এয়ারগানের ভয়ে ঘরের সব জানলা বন্ধ করে দিই সে-কথাও তুমি ভোলোনি নিশ্চয়ই। সেদিন তোমার মনে হয়েছিল যে, আমি রজ্জুতে সর্পভ্রম করছি। কিন্তু আমি যা করেছিলুম, তা ভেবেচিন্তেই করেছিলুম। আমি এয়ারগানের খবর জানতে পেরেছিলুম। আর এয়ারগান যে ছুঁড়বে, তার নিশানা যে অব্যর্থ তাও



আমি জানতুম। আমরা যখন সুইজারল্যান্ডে যাই তখন মরিয়ার্টির সঙ্গে মোরানও আমাদের ধাওয়া করেছিল। আর রাইখেনবাক জলপ্রপাতে মরিয়ার্টির মৃত্যুর পর ওই যে আমাকে পাথর চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল সে-ব্যাপারে আমার মনে অন্তত কোনও সন্দেহই নেই।

"তারপর আমি যখন লুকিয়ে লুকিয়ে ফ্রান্সে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, তখন আমি রোজ খবরের কাগজ খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে ওর কার্যকলাপের দিকে নজর রাখতুম। যতদিন এই লোকটি লন্ডন শহরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে ততদিন আমার বেঁচে থাকাটাই একটা সমস্যা হয়ে থাকবে। দুষ্টগ্রহের মতো ও আমাকে সব সময় তাড়া করে ফিরবে। আর চেষ্টা করতে করতে একদিন হয়তো ও আমাকে খতম করে দেবে। উলটো দিকে আমার সমস্যা হল, আমি কী করব? আমি তো আর ওকে মেরে ফেলতে পারি না। তাতে লাভের মধ্যে লাভ হবে এই যে, আমিই ফাঁসিকাঠে ঝুলব। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরবার করেও লাভ নেই। কারণ আমার কথা সব সত্যি হলেও সেগুলোকে অন্যের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার মতো কোনও প্রমাণ আমার হাতে নেই। সাধারণভাবে লোকের মনে হতে পারে যে, এসবই আমার নিছক সন্দেহ। যাকে ফ্যাক্ট বলে তা তো নয়। তাই আমার দিক থেকে ঠিক তখনই করবার কিছুই ছিল না। গা-ঢাকা দিয়ে আমি শুধু অপেক্ষা করতে লাগলুম। আমি যেখানে যত অপরাধমূলক কাজ-কারবার হচ্ছে তার খবর জোগাড় করতে লাগলুম। আমি জানতুম যে, আজই হোক আর কালই হোক ধরে আমি ওকে ফেলবই। এইরকম যখন অবস্থা তখন রবার্ট অ্যাডেয়ার খুন হল। এতদিন ধরে যে সুযোগের অপেক্ষা করছিলুম, সে সুযোগ এল। আমি বুঝতে পারলুম যে এই খুন কর্নেল মোরান ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। মোরান অ্যাডেয়ারের সঙ্গে ক্লাবে তাস খেলেছিল। ওরা দু'জনে একই সঙ্গে ক্লাব থেকে বেরিয়েছিল। তারপর ও রবার্ট অ্যাডেয়ারকে অনুসরণ করে ওর বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল। ওই খোলা জানলা দিয়ে গুলি ছুঁড়ে রবার্টকে খুন করে। ব্যাপারটা যে এই রকমই ঘটেছে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। ওই ঘরের মধ্যে যে বুলেট পাওয়া গেছে, তার দ্বারাই কর্নেলকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আমি আর দেরি না করে লন্ডনে ফিরে এলুম। লন্ডনে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই ওর লোকেরা আমাকে দেখে ফেললে। আর আমার আসবার খবরও মোরানকে জানিয়ে দিলে। আমার হঠাৎ লন্ডন ফিরে আসবার কারণ যে কী হতে পারে তা বুঝতে ওর ভুল হল না। আমি এইভাবে হঠাৎ ফিরে আসায় ও যে খুব ভয় পাবে তা আমি জানতুম। আর এ-কথাও জানতুম যে, প্রথম সুযোগেই ও আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে। আমাকে খুন করবার জন্যে যে ও ওই এয়ারগানটা ব্যবহার করবে তাও আমি জানতুম। তাই আমি ওর সুবিধের জন্যে একটা নিশানা রেখে এলুম আমার ঘরের জানলার কাছে। ইতিমধ্যে পুলিশকেও সব কথা জানিয়ে রাখলুম। ভাল কথা ওয়াটসন, আমাদের বাড়ির দরজার কাছে যাদের ঘোরাঘুরি করতে দেখে তুমি সন্দেহ করেছিলে তারা আসলে পুলিশের লোক। পুলিশকে রাস্তায় মোতায়েন করে আমি ঠিক করলুম যে, এই খালি বাড়ি থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব লক্ষ করব। যে-কথাটা আমার একবারও খেয়াল হয়নি সেটা হল এই যে, মোরান তার কাজ হাসিল করবার জন্যে এইখানেই আসতে পারে। সব ব্যাপারটা হল যাকে বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।... ওয়াটসন, আর কিছু ব্যাখ্যা করে বলতে হবে কি?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ। একটা কথা বুঝলুম না। রবার্ট অ্যাডেয়ারকে মোরান খুন করলে কেন? খুনের পেছনে উদ্দেশ্যটা কী?"

"দ্যাখো ওয়াটসন, খুনের 'মোটিভ'টা আন্দাজ করতে পেরেছি। তবে আন্দাজ করার ক্ষেত্রে অসাধারণ বুদ্ধিমান লোকেরও ভুল হতে পারে। তাই প্রত্যেকেরই এ-সম্বন্ধে নিজের নিজের মত থাকতে পারে। আর এই সব ভিন্ন ভিন্ন মতের যে-কোনও একটা ঠিক হতে পারে। আমার মতটাই ঠিক আর তোমারটা ভুল এ-কথা জোর করে বলা যাবে না।"

"তা তোমার মতটা কী শুনি।"

"জানা গেছে যে, অ্যাডেয়ার আর মোরান জুটি তাস খেলায় অনেক টাকার বাজি জিতেছিল। মোরান এই খেলার সময় জোচ্চুরি করত, সে-কথা আমি জানতুম। আমার মনে হয় সেদিন খেলতে খেলতে মোরানের এই জোচ্চুরি অ্যাডেয়ার কোনওভাবে টের পেয়ে যায়। খেলার পর দু'জনে যখন ক্লাব থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে আসে তখন অ্যাডেয়ার মোরানকে সরাসরি চেপে ধরে। হয়তো ওকে এই বলে ভয় দেখায় যে, মোরান যদি তাস খেলা আর ক্লাবের সদস্যপদ ছেড়ে না দেয় তো অ্যাডেয়ার এই জালজোচ্চুরির কথা ফাঁস করে দেবে। অ্যাডেয়ার আসলে অত্যন্ত শিক্ষিত সজ্জন ভদ্র যুবক। ওর পক্ষে কোনও বয়স্ক লোককে পাঁচজনের সামনে খোলাখুলিভাবে চোর বদনাম দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তাই এই নিয়ে ও কোনওরকম হইচই করতে চায়নি। অ্যাডেয়ারের কথা শুনে মোরানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। তাস খেলা বন্ধ হলে ওর সমূহ বিপদ। তাসে লোক ঠকিয়ে পয়সা উপায় করেই এখন ওর দিন চলে। তাই প্রাণের দায়ে ও অ্যাডেয়ারকে খুন করতে বাধ্য হয়। যে সময় অ্যাডেয়ারকে মোরান খুন করে সেই সময়ে অ্যাডেয়ার যারা খেলায় হেরেছে, তাদের তার নিজের ভাগের টাকাটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে হিসেব করছিল। পাছে সেই সময় তার মা-বোন এসে পড়ে আর তাকে জিজ্ঞেস করে যে, সে লোকের নামের তালিকা আর টাকা-পয়সা নিয়ে কী করছে, তাই অ্যাডেয়ার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল।...কী হে কথাটা মনে ধরল?"

"তুমি যা বললে তাই হয়েছে বলে মনে হয়।"

"আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে তা বিচারের সময় জানা যাবে। যাই হোক মোরান আর আমাদের বিরক্ত করবে না। ইতিমধ্যে ফন হারডারের এই অদ্ভুত এয়ারগান স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিউজিয়ামে শোভা পাবে। আর মিঃ শার্লক হোমসও লন্ডন শহরের এই বিচিত্র জনসমারোহের মধ্যে দু-একটা ছোটখাটো সমস্যার সমাধান বেশ নিশ্চিন্তভাবে করতে পারবে।"

অনুবাদ সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়


টারজান
এডগার রাইস বারোজ
জনবল কম, তাই হাতিকে কাজে লাগিয়েছি।
আমরা কী করব, বলে দাও।
আমরা গাছপালা কেটে ফেলছি, আপনার লোকেরা আগাছা সাফ করে ফেলুক, জমিটা পরিষ্কার হওয়া চাই।
পিগমিদের গ্রাম সুরক্ষিত করে শিফ্‌টা-দস্যুদের ঠেকাবার দায়িত্ব নিয়েছেন টারজান
আফ্রিকার হাতি যে মাল বহন করে, তা তো শুনিনি।
তান্তোর আমার বন্ধু-হাতি। যা বলি, তা-ই করে।
বেড়ার এখানটায় ফাঁক রেখেছ কেন?
শিফ্‌ট-দস্যুরা এই ফাঁক দিয়ে গাঁয়ে ঢুকবে! তারপর বুঝবে মজা!
যেই ঝাঁপ পড়বে, অমনি ফাঁকটা বন্ধ হয়ে যাবে, বুঝলি?
শিফ্‌ট-দস্যুরা বলেছিল, বর্ষা নামবার আগেই তারা ফের হানা দেবে!
আমরা তৈরি থাকব।
ব্যাপার কী, চাকা?
ওরা আসছে!
অর্থাৎ ওরা কথা রেখেছে!


হালুম !
কী করছ ক্যাপ্টেন ? আসছ তো ?
আসছি, আসছি !
ছেলেটাকে একটু ভয় দেখিয়ে এলুম, এই আর কি
পরদিন সকালে
আরে দূর-দূর, এইভাবে তুমি ইয়েতির গুহা খুঁজে বার করবে ?
বিচিত্র নয় । কুট্টুস গন্ধ পেয়েছে, গন্ধ শুঁকে-শুঁকে এগোচ্ছে ! এবারে সেই শিঙের মতো দেখতে চূড়াটা খুঁজে নিতে হবে !
বেশ, খুঁজে নাও !
আরে, ওই তো ! চূড়াটা তো সত্যি চমরী-গাইয়ের শিঙের মতো
রাত হলে নিঃশব্দে ওই পাহাড়ের তলায় পৌঁছবে। তাঁবুটা গোপন রাখা চাই !
তিন দিন বাদে
ধেত্তেরি, তিন দিন হল চুপচাপ এখানে বসে আছি, কিন্তু মিগু-ব্যাটার পাত্তা নেই ! কী হে টিনটিন, কী করব এখন ?
পুরোহিত ওই শিঙের নীচে চোখের কথা বলেছিলেন । চোখের উপরে নজর রাখো, ক্যাপ্টেন । ছটফট কোরো না !
ছটফট কোরো না ! ধুত, কাঁহাতক এইভাবে বসে থাকা যায় ! কত বচ্ছর যে বসে থাকতে হবে, তাও জানি না !
হা-আ-আ-আ-আ !

তিব্বতে টিনটিন


ইয়েতি ! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ! পাহাড়ের আড়ালে থেকে বেরিয়ে এল !
ওইদিন চলে গেল ! চলো ক্যাপ্টেন, এই সুযোগে ওর গুহায় যাব !
অ্যাঁ, কী করব ?
এই ফাঁকে ইয়েতির ডেরায় ঢুকে চ্যাংকে উদ্ধার করব !
তা হলে ক্যামেরাটা নিয়ে যাও !
ইয়েতির একটা ফোটো যদি তুলতে পারো, সাড়া পড়ে যাবে !
দেখা যাক !
থামো !
তুমি বরং এইখানে থাকো ! ইয়েতিকে ফিরতে দেখলে শিস দিয়ে আমাকে সাবধান করে দেবে !
ঠিক আছে ! ফোটোটা তোলা চাই !
!
এই তো গুহার মুখ !
টিনটিনকে একা যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি ! কী হবে, কে জানে !



তারকারা অনেকেই আসছেন না, তবু

বিশ্বকাপ জমবে

মানস চক্রবর্তী

অনেকেই নয়, কেউ কেউ মনে করেন আসন্ন রিলায়ান্স কাপ তেমন গুরুত্ব পাবে না। এরকম একটি বিদঘুটে ধারণা গড়ে তুলেছেন কয়েকজন ইংরেজ ক্রিকেট-সাংবাদিক। তাঁদের মতে, রিলায়ান্স কাপ আসলে 'ইন্দো-পাক ক্রিকেট সার্কাস'। এ ধরনের সমালোচনায় রিলায়ান্স কাপের গুরুত্ব, জাঁকজমক, আকর্ষণ ও আয়োজনের নিশ্চয় কোনও ঘাটতি হবে না। কিন্তু সমালোচকদের ওই বিরূপ মনোভাব হয়তো প্রভাবিত করেছে প্রথম সারির বেশ কিছু ক্রিকেটারকে। ফলে আসন্ন রিলায়ান্স কাপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন কয়েকজন তারকা।

আপাতত তালিকাটি দীর্ঘ না হলেও উপেক্ষণীয় নয়। ইয়ান বথাম, ডেভিড গাওয়ার, ম্যালকম মার্শাল, জোয়েল গার্নার, গ্রেগ ম্যাথুজ এবং গ্রেম হিকের পক্ষে এই টুর্নামেন্টে খেলা সম্ভব হচ্ছে না। প্রশ্নচিহ্ন ঝুলছে রিচার্ড হ্যাডলি ও মার্টিন ক্রো-র নামের পাশেও। তবে এঁরা সবাই যে একই কারণে আসছেন না, তা নয়।



গার্নার

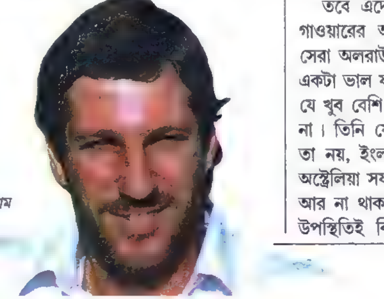


মার্শাল

বিশ্বের সেরা ফাস্ট বোলার ম্যালকম মার্শাল না আসায় ভারত ও পাকিস্তানের দর্শকরা যেমন বঞ্চিত হবেন এই স্পিড-স্টারের 'রকেটে'র কার্যকারিতা দেখতে, তেমনি হীনবল হয়ে পড়বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং আক্রমণ। বস্তুত যে চারজন বোলারের ওপর নির্ভর করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাফল্যের রথ তরতরিয়ে এগিয়ে চলত, সেই চারজনই এবার তাদের দলে নেই। অ্যান্ডি রবার্টস ও মাইকেল হোল্ডিং আগেই অবসর নিয়েছেন। এবং মার্শাল ও জোয়েল গার্নার এখন জানালেন, এই টুর্নামেন্টে খেলবেন না। বিচিত্র কারণ দেখিয়েছেন মার্শাল। ইংল্যান্ডের কাউন্টিতে মার্শাল হ্যাম্পশায়ারে খেলেন। আগামী বছর তাঁর বেনিফিট ইয়ার। মার্শালকে এখন থেকেই নাকি তার প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। তাঁর হাতে সময় এতই কম যে, এখন রিলায়ান্স কাপে খেলার সময় তাঁর নেই।

মার্শাল তবু কারণটা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এক কাঠি এগিয়ে গেছেন গার্নার। 'বিগ বার্ড' গার্নার, যিনি গত বিশ্বকাপের ফাইনালের সেরা বোলার, বলেছেন, ক্রমাগত কাঁধের ব্যথায় তিনি এতই কাবু যে ভারত-পাকিস্তানে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। শুধু এইখানেই থেমে থাকলে তাঁর সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সমবেদনা থাকত। কিন্তু এর পরের মন্তব্যটিতেই বোঝা যায়, গার্নার হয়তো ঠিক কথা বলছেন না। তিনি জানিয়েছেন, 'যতবারই ভারত সফরে গেছি, ততবারই আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।' মিথ্যে কথা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে কোনওদিন ভারত সফরে আসেননি গার্নার। দিন-তিনেকের জন্য তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত ডাবল উইকেটে খেলার জন্য এসেছিলেন। অসুস্থ হয়েছিলেন? না, সেরকম কোনও খবর জানা নেই আমাদের।

দুর্দান্ত ফর্মে আছেন জিম্বাবোয়ের গ্রেম হিক। গত বছর উইজডেনের বর্ষসেরা পাঁচজনের একজন তিনি। তাঁর অন্তর্ভুক্তিতে জিম্বাবোয়ের শক্তিবৃদ্ধি হত। কিন্তু হিক দেশের হয়ে বিশ্বকাপ খেলার চেয়ে ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট খেলতে বেশি আগ্রহী। এখন জিম্বাবোয়ের হয়ে খেললে তাঁর টেস্ট খেলা আরও পিছিয়ে যাবে। অগত্যা তিনি আর কী করবেন!



বথাম

তবে এঁদের চাইতেও উল্লেখ্য বথাম ও গাওয়ারের অনুপস্থিতি। বিশ্বের সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডার বথাম অবশ্য ইদানীং খুব একটা ভাল ফর্মে নেই। ক্রিকেট খেলে তিনি যে খুব বেশি আনন্দ পাচ্ছেন, তাও মনে হয় না। তিনি যে শুধু বিশ্বকাপেই খেলছেন না তা নয়, ইংল্যান্ড দলের হয়ে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া সফরেও যাচ্ছেন না। বথাম থাকা আর না থাকার মধ্যে তফাত অনেক। তাঁর উপস্থিতিই বিপক্ষের ভীতির কারণ। কিছু

করুন বা না করুন, একটা দারুণ ক্যাচ, দু-একটা উইকেট নিয়ে কিংবা ঝটপট কিছু রান করে বথাম খেলার গতিপথ বদলে দিতে পারেন। বথামের মতোই ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ডেভিড গাওয়ারকেও। ফ্রাঙ্ক উলির পর ইংল্যান্ডের সেরা ন্যাটা ব্যাটসম্যান, হাজার ছয়েক রানের অধিকারী গাওয়ারের ব্যাটিংয়ের কারুকার্য দেখার জন্য হাজার মাইল হেঁটে আসা যায়। দুর্ভাগ্য আমাদের, গাওয়ারও বিশ্বকাপকে গুরুত্ব দিলেন না। আসছেন না ইংল্যান্ডের স্পিনার এড্‌মন্ড্‌স এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের গ্রিনিজ।

সম্পূর্ণ অন্য কারণে দল থেকে বাদ পড়েছেন গ্রেগ ম্যাথুজ। শারজায় চ্যাম্পিয়ান ট্রফিতে তিনি এমন কিছু অপরাধ করেছিলেন, যার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে 'ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন' নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-বোর্ড। ম্যাথুজ না থাকায় অস্ট্রেলিয়া দল থেকে উবে যাবে শোম্যানশিপ।

তবে সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদটা এখনও আসেনি। শোনা যাচ্ছে, রিচার্ড হ্যাডলি ও মার্টিন ক্রো'ও নাকি অব্যাহতি চেয়েছেন। এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা বোলার হ্যাডলি গত ১৪ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত থাকলেও কোনওদিন ভারতে খেলেননি। যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে নিউজিল্যান্ড ভারতে আসছে না, আর ৩৫ বছরের হ্যাডলি খুব বেশি দিন টেস্টও খেলবেন না, তাই এটাই হয়তো ক্রিকেটার হ্যাডলির ভারতে আসার শেষ সুযোগ। একইরকমভাবে আমরা উদগ্রীব বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান মার্টিন ক্রোকে দেখবার জন্য। শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড বোর্ডের চাপে এঁরা যদি আসেন তা হলে ভাল, না হলে নিউজিল্যান্ড দলের তো বটেই, বিশ্বকাপের জৌলুসও অনেকটা কমে যাবে।

তবু যাঁরা আসবেন, তাঁদের আকর্ষণই বা কম কিসের। লর্ড্‌সের দ্বিশতবার্ষিকী টেস্টে দু'দলের যে বাইশজন খেলবেন তাঁদের উনিশজনই বিশ্বকাপে খেলতে আসছেন। তার মানে, তারকাদের হাট বলা যায়। ইমরান, মিয়াঁদাদ, রিচার্ডস, অ্যালান বর্ডার, ব্রড, গ্যাটিং, ডিন জোন্স এবং সঙ্গে আমাদের ভারতের সুপার স্টাররা তো থাকছেনই। তাই কয়েকজন তারকা না হয় এলেনই না।

বিশ্বের কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টার হতে চলেছেন

বিশ্বনাথন আনন্দ

মনোজ চক্রবর্তী

বাগুইও সিটি থেকে টেলিপ্রিন্টারে উড়ে আসা খবরটি ছিল ছোট, কিন্তু বারুদে ঠাসা। মুহূর্তেই তাতে বিস্ফোরণ হল—তামিলনাড়ুর দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দ বিশ্ব জুনিয়ার দাবা চ্যাম্পিয়ান। ইদানিং আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গণে ভারতীয়দের ব্যর্থতার কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা যখন প্রায় হতাশ, আমাদের খেলোয়াড়দের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, ঠিক তখনই আনন্দের এই কীর্তি শুধু এখানকার দাবাড়ুদেরই মাতিয়ে দেবে না, উৎসাহিত করবে, অনুপ্রেরণা জোগাবে এ দেশের সমস্ত ক্রীড়াবিদকে। ক্রমাগত পিছু হটতে হটতে যারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান তো দূরের কথা, এশিয়ায় সেরা হবার স্বপ্ন দেখতেও ভয় পেত, তাদের অন্তত একবার আশা জাগিয়ে দিলেন আনন্দ—বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ভারতও তৈরি করতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি, ভারতীয় খেলাধুলোর ইতিহাসে আনন্দের এই কীর্তির পাশাপাশি আর কোনও জয় নেই। অবশ্যই এখানে ব্যক্তিগত খেলাগুলির কথা বলা হচ্ছে। মাইকেল ফেরিরার তিনবার কিংবা উইলসন জোন্স ও গীত শেঠির দু'বার বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ান হওয়া বিরাট কৃতিত্বের ঘটনা। কিন্তু সংশ্লিষ্ট খেলায় তাঁরা (যেহেতু পেশাদার নন) প্রকৃত চ্যাম্পিয়ানদের থেকে অনেক পিছিয়ে।

বিশ্বনাথন আনন্দ



আনন্দের এই জয়ের কাছাকাছি রাখা যায় প্রকাশ পাড়ুকোনের অল ইংল্যান্ড জেতা, রোম ওলিম্পিকের ৪০০ মিটারে মিলখা সিং-এর চতুর্থ স্থান লাভ কিংবা মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকের ৮০০ মিটারে শ্রীরাম সিং-এর সপ্তম স্থান পাওয়ার ঘটনাগুলি। প্রশ্ন উঠতে পারে, জুনিয়ার বিশ্ব দাবা কি সত্যিই এত গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন প্রতিযোগিতা ? হ্যাঁ,যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই মুহূর্তে দাবা পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলাগুলির অন্যতম। আর বিশ্ব দাবা ফেডারেশনের নিয়ম, নীতি, রেটিং ইত্যাদি মেনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়া রীতিমত কঠিন। 'আনন্দমেলা'র ২৬ নভেম্বর ১৯৮৬ সংখ্যায় আনন্দকে নিয়ে লেখাটিতে তাঁর সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল। আজ সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়েছে।

আনন্দের এই কৃতিত্বে ওঁর মা সুশীলা দেবীর অবদান সবচেয়ে বেশি। প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং উপদেশ জুগিয়েছেন প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ান ম্যানুয়েল অ্যারন। এ কথা আমরা জানি। কিন্তু সম্প্রতি আরও একটি তথ্য দিলেন দিব্যেন্দু বড়ুয়ার পিতা শ্রীবিনয় বড়ুয়া। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল, "দক্ষিণ রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনন্দের পিতা বেশ কিছুকাল ডেপুটেশনে ম্যানিলায় ছিলেন। এশিয়ার সবচেয়ে বড় দাবা কেন্দ্র ম্যানিলা, ওখানে দাবার চর্চা ঘরে মধ্যে আন্তঃ স্কুল দাবায় চ্যাম্পিয়ান হবার সূত্রে আনন্দ দেখা পান এক দাবা-বিশারদের। তিনি হলেন এশিয়ার প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার ইউজিন টোরের দাদা জেস টোরের-। জেসই আনন্দের অনেক ভুল-ত্রুটি শুধরে দেন।" যে-ফিলিপিনসে আনন্দের প্রথম প্রতিযোগিতা জয়, সেই ফিলিপিনসের মাটিতেই আনন্দ বিশ্বের সেরা জুনিয়ার দাবাড়ুর মর্যাদা পেলেন।

এশীয় জুনিয়ার দাবার পর বিশ্ব জুনিয়ার দাবা চ্যাম্পিয়ান। এখন লক্ষ্য গ্র্যান্ড মাস্টার



আমেরিকার অ্যান্ড্রু সলটিস-এর বিরুদ্ধে খেলছেন বিশ্বনাথন আনন্দ *ফোটো সন্তোষ ঘোষ*

ঘরে। ওখানকার টি ভিতেও দাবা নিয়ে মাতামাতি কম নয়। সপ্তাহে একদিন 'চেস টুডে' বলে একটি অনুষ্ঠানে দাবা শেখাতেন সেখানকার বিখ্যাত দাবাড়ুরা। মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ জানান হত বিদেশী দাবাড়ুদের। অনুষ্ঠানের শেষে থাকত 'চেস পাজ্‌ল' নামে একটি প্রশ্নোত্তরের আসর। কঠিন কঠিন প্রশ্ন করা হত তাতে। দশ বছরের আনন্দ বেশ কয়েকবার ওই প্রশ্নমালার সঠিক উত্তর দিয়ে টি ভির অনুষ্ঠানে একবার আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। এবং কিছুদিনের হওয়া। ইতিমধ্যেই একটি নর্ম ওঁর সংগ্রহে। আর একটি দরকার। এই মুহূর্তে আনন্দ লন্ডনে দুটি আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় খেলছেন। একটি ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়ানশিপ, অন্যটি লয়েড্‌স ব্যাঙ্ক দাবা প্রতিযোগিতা। ১৯৮৪তে লয়েড্‌স ব্যাঙ্ক দাবায় গ্রান্ডমাস্টার গ্রিনফিল্ডকে হারিয়ে আনন্দ প্রথম আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্ম লাভ করেন। এবার কি সেখানেই আর একটি জি এম নর্ম পেয়ে আনন্দ হবেন বিশ্বের কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টার?

প্রশ্ন

১ ফুটবল মাঠের মাপ কী বলতে পারো?

২ ক্রিকেটে স্টাম্পের উচ্চতা মাটি থেকে কতটা?

৩ টেবিল টেনিস খেলার টেবিল লম্বায় কতটা হয়?

৪ বাস্কেটবল খেলায় এক-একটি ম্যাচ কতক্ষণ খেলা হয়?

৫ কোন্ বিখ্যাত অ্যাথলেটকে 'অ্যাবনি অ্যান্টেলোপ' (যা বাংলা করলে আবলুস হরিণ বলা যায়) নামে অভিহিত করা হত?

৬ হ্যান্ডবলে গোলকিপার ছাড়া কোনও কোর্ট-প্লেয়ার কি গোলকিপারের কাজ করতে পারেন?

৭ দাবায় কোনও প্রতিযোগী যদি বেআইনি চাল দেন, তা হলে কী শাস্তি হবে?



৮ টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ ধরার রেকর্ড (উইকেটকিপার বাদে) কার দখলে? এই রেকর্ডটি কী?

৯ সবচেয়ে ধীর গতির ইনিংস খেলায় ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে কার রেকর্ড আছে?

উত্তর

(১) লম্বায় ১২০ মিটারের বেশি নয় ও ৯০ মিটারের কম নয়; চওড়ায় ৯০ মিটারের বেশি নয় ও ৪৫ মিটারের কম নয়। (২) ২৮ ইঞ্চি। (৩) ২৭৪ সেন্টিমিটার। (৪) দুই অর্ধে ২০ মিনিট করে খেলা হয়। মাঝে ১০ মিনিটের বিরতি। (৫) জেসি ওয়েন্স। (৬) হ্যাঁ। (৭) ঘুঁটিগুলো বেআইনি চাল দেবার আগের অবস্থায় আবার সাজানো হবে। (৮) গ্রেগ চ্যাপেল। ৮৭ ম্যাচে ১২২ ক্যাচ। (৯) মনসুর আলি খাঁ পতৌদি। ৭২-৭৩ সিরিজে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বম্বেতে ১০২ মিনিটে ৫ রান করেছিলেন।

রত্না শূর

লড়াই করে জিততে হয় প্রতিটি পয়েন্ট : দিব্যেন্দু

সুদেষ্ণা করবড়ুয়া

ভিলাই-এ অনুষ্ঠিত এবারের জাতীয় 'বি' দাবা প্রতিযোগিতার আসরটি ছিল দারুণ জমজমাট আর উত্তেজনাপূর্ণ। শেষ রাউন্ড পর্যন্ত একদিকে যেমন চলেছে জোর লড়াই, অন্যদিকে তেমনই দাবা অনুরাগীদের জল্পনা কল্পনা। কারণ পাল্লা কখনও ঝুঁকেছে এ দিকে, কখনও ও দিকে। একেবারে শেষ দিনে পঞ্চদশ রাউন্ডের পর সব তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে শীর্ষস্থানটি দখল করলেন দিব্যেন্দু বড়ুয়া।

নিজের খেলা সম্বন্ধে দিব্যেন্দু বলেন, 'এলাম দেখলাম জয় করলাম, এ কথাটি আমার জীবনে প্রায় ঘটেনি বললেই চলে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাকে জিততে হয় প্রতিটি পয়েন্ট। বহু পরিশ্রম করতে হয় এক একটি খেতাবের জন্য।'

সত্যিই তাই। এবারের প্রতিযোগিতায় সেই লড়াই করেই বিজয়ীর সম্মান পেতে হয়েছে দিব্যেন্দুকে। প্রতিযোগিতার প্রথম দিকে কিন্তু এগিয়েই ছিলেন দিব্যেন্দু। তবু লক্ষ্যে পৌঁছতে ওঁকে পেরোতে হয়েছে অনেক বাধা। খেলা ড্র করতে বাধ্য তো হয়েছেনই, সরাসরি পরাস্তও হয়েছেন দু'এক বার। কারণ প্রতিপক্ষ তো দুর্বল নয়। প্রবীণ থিপসে, এন· সুধাকর বাবু, নাসির আলি, রাজা রবিশেখর ভার্গিজ্জ কোশি, পবিত্রমোহন মহান্তির মতো প্রতিভাবান দাবাড়ুরা সবাই ছিলেন এই আসরে। বিপদ ছিল পদে পদে। ফাঁদে পা দিয়েছেনও দিব্যেন্দু এক-আধবার। আর তাই শেষ জয়টির পর ওঁর পয়েন্ট দাঁড়িয়েছিল ১১·৫। পবিত্র মহান্তিরও ঠিক তাই। তিনি যে হারিয়েছিলেন দিব্যেন্দুকেও। দু'জনের পয়েন্ট সমান সমান, ভরসা টাইব্রেকার। আর ভাল মিডিয়াম পয়েন্টের জোরে এগিয়ে গেলেন দিব্যেন্দু। অর্থাৎ জয়লাভ এবারেও সেই যুদ্ধ করেই। এভাবে চলছে আজ প্রায় দশ বছর।

অঙ্কের হিসেবে দেখতে গেলে, দিব্যেন্দুর দাবাড়ু জীবনের শুরু চোদ্দ বছর আগে। ওঁর বয়স তখন ছয়। বল নিয়ে দৌড়ো-দৌড়ি করছিল দিপু (দিব্যেন্দু)। ঘরে চৌকির ওপর দাবার ছক, বাবা বসেছেন এক বাজি খেলার জন্য। হঠাৎই বোর্ডের দিকে নজর পড়ে গেল ছেলেটির। এ দৃশ্য তো ওর অতিপরিচিত। বাবা খেলেন, মা খেলেন আর খেলে দাদা। কিন্তু এ কী, এ-চাল কেন দিলেন বাবা ? ভুল করলেন কেন এমন ? নিজে এগিয়ে এসে ঘোড়াটিকে এগিয়ে দিল ও। অসাধারণ চাল। হতবাক দুই বয়স্ক খেলোয়াড়। কবে শিখল ও এমন খেলা ?

সেই হঠাৎ-দেওয়া চালই সেদিন দিপুর সামনে খুলে দিয়েছিল এক নতুন জগতের দরজা। ছ'বছর বয়েসেই ও খেলল জীবনের প্রথম টুর্নামেন্ট। তারপর এল অভিজ্ঞতা, যশ ও খ্যাতি, এল পুরস্কার, আর সবার ওপর নানান খেতাব। খুবই অল্প বয়সে দাবার এই 'বিস্ময়-বালক' পেলেন জাতীয় চ্যাম্পিয়ানের সম্মান সিনিয়ার, জুনিয়ার এবং সাব জুনিয়ার স্তরে। স্বীকৃতি পেলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জুনিয়ার দাবাড়ু হিসেবে। নাম ছড়াল দেশে-বিদেশে। আন্তর্জাতিক মাস্টার দিব্যেন্দুর প্রধান লক্ষ্য কিন্তু বহু আকাঙ্ক্ষিত গ্র্যান্ড মাস্টার খেতাবটি।

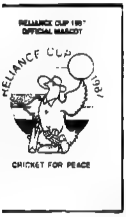


ভিলাই-এর এই খেলার পর দিব্যেন্দুর যাওয়ার কথা লন্ডনে। লয়েডস ব্যাঙ্ক টুর্নামেন্টে তিনি খেলবেন । এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে কিন্তু জড়িয়ে আছে ওঁর জীবনের এক রোমহর্ষক স্মৃতি। কয়েক বছর আগের কথা। সেদিন খেলতে বসার কয়েক মিনিট আগে দিব্যেন্দু জানতে পারেন, ওঁর প্রতিপক্ষের নাম—ভিক্টর করশনয়। 'ও নাম আগে জানলে খেলতে পারতাম কি না সন্দেহ। টেনশনের জন্যই খেলা পন্ড হয়ে যেত।' তখন কিন্তু আর ভাবার সময় ছিল না। তাই খেলতে বসে গেলেন দিব্যেন্দু। ষোলো বছরের ভারতীয় ছেলেটিকে দেখে হয়তো বা একটু বিরক্তই হয়েছিলেন করশনয়। হয়তো ভেবেছিলেন, এ শুধু সময় নষ্ট। কিন্তু ভুল যখন ভাঙল তখন আর ফেরার সময় ছিল না। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা খেলে সেদিন দিব্যেন্দু হারিয়েছিলেন বিশ্বের দু'নম্বর বাছাই বাহান্ন বছর বয়সী দাবাড়ুকে।

'সে-অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। ও রকম খেলা খেললে মনে জোর আসে, উৎসাহ হয় আরও ভাল খেলার। কিন্তু আমার খেলায় দোষ-ত্রুটি এখনও আছে। অনেক সময় প্রথম কয়েকটি চাল ভাল না হওয়ার ফলে পুরো খেলাটাই চলে যায় হাতের বাইরে,' বলেন দিব্যেন্দু। তবে এখন নানান বইপত্র পড়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই ত্রুটি শোধরানোর।

দাবা ভালবাসেন দিব্যেন্দু। দাবা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। তাই একদিকে কলেজ, অন্যদিকে চাকরির সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন দাবা নিয়ে পড়াশোনা আর কঠিন অনুশীলন।

ভারতে দাবার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণের অভাব দিব্যেন্দুকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। তিনি চান বিদেশে কিছুদিন অন্তত ট্রেনিং নিতে। এত বড় দাবাড়ু হয়েও তিনি যে আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন না, এটাই বড় কথা।



বিশ্বকাপের সেরা ইনিংস

অশোক রায়

বিশ্বকাপের সেরা ইনিংস কোন্‌টা ? সহজ প্রশ্ন। কিন্তু সেরা ইনিংস বেছে নেওয়াটা বেশ কঠিন। 'দুর্দান্ত' বলতে কয়েকটা ইনিংস হাতে গোনা যায়। যেমন ১৯৭৫-এর বিশ্বকাপ ফাইনালে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অসাধারণ ১০২ রানের ইনিংস খেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে জেতান ক্লাইভ লয়েড। মনে পড়বে ১৯৭৯-এর বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভিভ রিচার্ডসের 'ম্যাজেস্টিক' সেঞ্চুরি (১৩৮)। একই ম্যাচে কলিস কিং-এর ঝোড়ো ব্যাটিং (৬৬ বলে ৮৬ রান)। কিন্তু ভয়ঙ্কর চাপের মুখে দলের যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে এক 'অলৌকিক' ইনিংস খেলেন কপিলদেব '৮৩ বিশ্বকাপে। তাঁর ১৭৫ রানের ইনিংস শুধু ওই প্রতিযোগিতায় একজন অধিনায়কের সর্বোচ্চ রানের ইনিংসই নয়, বিশ্বকাপের ইতিহাসেও সর্বোচ্চ। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে আমেদাবাদে কপিলের ৮৩ রানে ৯ উইকেট নেবার ঘটনাটি একজন টেস্ট-অধিনায়কের সর্বোত্তম বোলিং রেকর্ড।

তারিখটা ছিল ১৮ জুন। কেন্টের টানব্রিজ ওয়েলস্‌-এ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগে ভারতের রিটার্ন ম্যাচ। ভারতের ওপর চাপ ছিল এইজন্য যে, জিম্বাবোয়ে গ্রুপ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল। তাই তাদের হেলাফেলা করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, পয়েন্টের দিক দিয়ে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া তখন সমান সমান হলেও, রান রেটে অস্ট্রেলিয়া ছিল এগিয়ে। প্রথমে ব্যাট করে ৩০০-র বেশি রান তোলাই ছিল ভারতের প্রধান লক্ষ্য।

উইকেট ছিল ভিজে। স্কোর বোর্ডে কোনও রান ওঠার আগেই রসনের প্রথম ওভারের শেষ বলে শূন্য রানে ফিরলেন গাওস্কর। তাঁর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরলেন শ্রীকান্ত (০), পাটিল (১) এবং মহিন্দর অমরনাথ (৫)। ভারতের রান তখন ৪ উইকেটে মাত্র ৯। মুখ ফিরিয়ে সূর্যকে দেখে নিয়ে এই ভয়ঙ্কর সময়ে মাঠে নামলেন অধিনায়ক কপিলদেব। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে আউট হলেন যশপাল শর্মা (৯)। বল হাতে রসন (৩ উইকেট) এবং কারেন (২ উইকেট) তখন দানব হয়ে উঠেছেন। গোটা মাঠে জিম্বাবোয়ের ক্রিকেটারদের উল্লাস। স্কোর বোর্ড মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে—১৭ রানে ৫ উইকেট। অলৌকিক কিছু না হলে এই ম্যাচ থেকে বেরিয়ে আসার কোনও সম্ভাবনাই নেই। রসনের প্রথম দফার ৬ ওভার শেষ হল। আর উইকেটও শুকিয়ে আসছিল।এই সময়টাকেই বেছে নিলেন কপিলদেব। বিনির (২২) সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে যোগ করলেন মহামূল্যবান ৬০ রান। বিনি ফিরে যাবার পর এলেন শাস্ত্রী। এবং ফিরে গেলেন মাত্র এক রান করে। ভারতের রান দাঁড়াল ৭ উইকেটে ৭৮। ভারতীয় সমর্থকদের কাছে তখন বাতাস আবার অক্সিজেনহীন। মাঠে নামলেন বহু যুদ্ধের নায়ক মদনলাল। উইকেটের মাঝখানে এগিয়ে গিয়ে কপিল বললেন, "উইকেট কামড়ে পড়ে থাকো। তারপর দেখা যাক কতদূর যাওয়া যায়।"

খানিকটা দূরে যাওয়া গেল। দলের ১৪০-এর মাথায় আউট হলেন মদনলাল (১৭)। এতক্ষণ কপিল মনোযোগী ছিলেন শুধু সিঙ্গল্‌সের প্রতি। কিরমানি উইকেটে আসতেই কপিল সিদ্ধান্ত নিলেন অন্তত একবার চাবুকটা ঘোরানো দরকার। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। পরের ১৮টি বলের তিনটি মাটি দিয়ে এবং তিনটি আকাশপথে ছুটল বাউন্ডারির বাইরে। ধীর, স্থির কিরমানিকে (২৪) নিয়ে কপিল নবম উইকেটে জুড়লেন রেকর্ড সংখ্যক ১২৬ রান। নিজে অপরাজিত রইলেন ১৭৫ রানে (মাত্র ১৩৮ বল খেলে)! এর মধ্যে ছিল ৬টি ছক্কা এবং ১৭টি বাউন্ডারি। ভাবা যায়, ভারতের ২৬৬ রানের ইনিংসে একা কপিলেরই ১৭৫।

১৯৭৯ সালের ২৩ জুন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ফাইনালে ভিভ রিচার্ডসের ঝকঝকে সেঞ্চুরি (১৩৮) নিঃসন্দেহে মনে রাখার মতো। কিন্তু সেদিন রিচার্ড্‌সকেও ছাপিয়ে যান কলিস কিং। চোখ ধাঁধানো ঘটনাটা ঘটে এইভাবে ইংলিশ বোলারদের চাপে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩৪ ওভারে



বিশ্বকাপের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একটি নাম লয়েড

(খেলা ৬০ ওভারের) তোলে ৪ উইকেটে ১২৫ রান। ইংল্যান্ডের দিক দিয়ে এ-পর্যন্ত সবই চলছিল ঠিকঠাক। কিন্তু অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারলিকে পঞ্চম বোলারের দায়িত্বটি ছেড়ে দিতেই হল বয়কট, গুচ এবং লারকিনসের ওপর। এই দুর্বল মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিলেন কিং। ড্রাইভ, হুক, পুলের অস্ত্রে ঝাঁঝরা করে দিলেন ইংল্যান্ডের দুর্বল মুহূর্তের আক্রমণ। অন্য প্রান্তে রিচার্ড্‌সকে প্রায় দাঁড় করিয়ে রেখে ৩টি ছক্কা এবং ১০টি বাউন্ডারিসহ মাত্র ৬৬ বলে কিং পৌঁছলেন নিজের ৮৬ রানে। ভিভের সঙ্গে ২১ ওভারে এই জুটিতে যোগ হয় ১৩৯ রান। কিং আউট হবার পর শেষ দিকে প্রচণ্ড মেরে (বিশেষ করে ইনিংসের শেষ বলে হেনড্রিকসকে



▲ *ভিভ রিচার্ড্‌স*
◀ *কপিলদেব*

ওভার বাউন্ডারিতে পাঠানো, ভোলা যায় না) 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' হলেন অবশ্য রিচার্ডসই।

১৯৭৫-এর ২১ জুন প্রথম বিশ্বকাপের ফাইনালে ক্লাইভ লয়েড (১০২) যে ইনিংসটি খেলেছিলেন, সেটি ছিল অধিনায়কোচিত দৃঢ়তায় ভরা। টসে জিতে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল ফিল্ডিং নেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্রুত তিনটি উইকেট হারায় ৫০ রানে। এই পরিস্থিতিতে মাঠে নামেন লয়েড। ইনিংসের শুরুতে অন্যান্য অনেক ব্যাটসম্যানের মতোই তিনি ছিলেন একটু নড়বড়ে। 'সেট' হতে একটু সময় নেন। কিন্তু সেদিন ২৬ হাজার দর্শক দেখলেন লর্ড্‌সের লর্ডকে। লিলি-টমসন-গিলমোরদের বল তিনি নিক্ষেপ করতে থাকেন যত্রতত্র। বলতে গেলে একা লয়েডই উলটে দিলেন বিপক্ষ দলের সব হিসেবপত্র। এমন ইনিংস লয়েড নিজেও আর কখনও খেলেছেন কি না সন্দেহ! 'ইনিংস অব এ লাইফ টাইম' বলে কি একেই?

শেষ খেলা হোক ইডেনে

বোম্বাইয়ের চিকলওয়াড়ির ছোট্ট গলিতে একদিন যে খেলা শুরু করেছিলেন সুনীল মনোহর গাওস্কর, সেই খেলাই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের প্রশস্ততম রাজপথে। একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও কঠিন সাধনা গাওস্করকে দিয়েছে এই সাফল্য। ক্রিকেটের কিংবদন্তী ডোনাল্ড ব্রাডম্যানের পাশে আজ আর এক কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন সুনীল। আসন্ন বিশ্বকাপের পর আর তাঁকে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে দেখা যাবে না। বিশ্বকাপের ফাইনালে যদি ভারত উঠতে পারে, তা হলে গাওস্করের শেষ আন্তর্জাতিক খেলা হবে কলকাতার ইডেনে। ইডেন আর এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকুক—গাওস্করের অসংখ্য অনুরাগীর এটাই প্রার্থনা। পুরো ফর্মে থাকতে থাকতেই গাওস্কর ক্রিকেট থেকে বিদায় নিলেন। বছরের পর বছর এভাবে ফর্ম ধরে রাখাটাও বোধহয় একটা রেকর্ড। গাওস্করের অসংখ্য রেকর্ডের মধ্যে এটাও রেকর্ড হয়ে থাক যে, যখন তিনি আরও ভাল খেলছিলেন, তখনই খেলা থেকে সরে গেলেন। নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের গাওস্করের যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে হবে।



ওপরে, চিকলওয়াড়ির সেই গলি, যেখানে ক্রিকেটে গাওস্করের প্রথম হাতে-খড়ি হয়েছিল ; মাঝখানে গ্যারাজ, এটাই ছিল স্টাম্প ; নীচের বাড়িটিতে থাকতেন গাওস্কর পরিবার। সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যানের কাছ থেকে বিশেষ পুরস্কার নিচ্ছেন গাওস্কর





রোভার্সের রয়
মেলচেস্টার রোভার্স
সেই রাত-দুপুরে বিপক্ষ-দলের হোটেলে ছুটল রয় !
স্কটল্যাণ্ডে টুর্নামেন্টের ফাইনালের আগের রাত্তিরে রোভার্সের হোটেলের সামনে বিপক্ষদলের সমর্থকদের হৈ-হল্লা। রয় শুনল, রোভার্সের সমর্থকরা বিপক্ষ হাইবরোর খেলোয়াড়দের হোটেলের সামনে হৈ-হল্লা করছে, এটা তারই বদ্‌লা !
হাইবরো ! হাইবরো
আরে, এত চেঁচাচ্ছ কেন ? খেলোয়াড়দের ঘুমুতে দেবে না ?
তোমাদের খেলোয়াড়দের হোটেলের সামনে গিয়ে চেঁচাও !
সে তো রোভার্সের ভক্তরাই চেঁচাচ্ছে !
তারা আমাদের খেলোয়াড়দের ঘুমুতে দিচ্ছে না, বঝলে ?
আমরাও তাই তোমাদের ঘুমুতে দেব না !
হাইবরো ! হাইবরো !
রয় চটপট পোশাক পালটে নিল...
আমি তোমার সঙ্গে যাব রয় ?
এলে ভালই হয়, ব্ল্যাকি !
এ-সব কে করছে আমি জানি !
খানিক বাদে
মেলচেস্টার রোভার্স ! রোভার্স !
PARKSIDE
ট্রেভর ব্রিন্সডেনের সাঙ্গোপাঙ্গদের কাণ্ড !
উগ্র সমর্থক ব্রিন্সডেনের কাণ্ড দেখে রয় ক্ষুব্ধ..
রয় জিন্দাবাদ ! শাবাশ রয়
রোভার্স যাতে জেতে, তার জন্য আমরা সব করব !
ওরে গবেট, এ-ভাবে আমি জিততে চাই না ! কিছুতেই না !
কিন্তু রয়
ওরে, পুলিশ আসছে !


ARKSIDE
আজ চলে যাচ্ছি ! কাল মাঠে আমাদের কাণ্ড দেখে হাইবরো বুদ্ধু বনে যাবে !
হাঃ হাঃ , ওদের বুদ্ধু বানিয়ে ছাড়ব !
হাইবরোর ক্যাপ্টেন গর্ডন রেগে গেছে রয়ের উপরে...
চেলাচামুণ্ডাদের লেলিয়ে দিয়ে আমাদের শান্তি নষ্ট করে ট্রোফি জিততে চাও ?
গর্ডন, তুমি ভুল বুঝেছ !
তোমার কথা গর্ডন শুনবে না ! চলে গেছে !
চলো, নিজেদের হোটেলে ফিরি
দেখা যাক, সেখানকার হল্লা থেমেছে কি না
বাকি রাত শান্তিতে কাটল...পরদিন মাঠে...
মেলচেস্টার ! মেলচেস্টার !
হাইবরো ! হাইবরো !
দ্যাখ, দ্যাখ, রোভার্স নতুন জার্সি পরে নেমেছে !
উরে বাবা, কানে তালা লেগে গেল যে !
MENDLIES
মিনিট কয়েক বাদে...
বল নিয়ে বেরোতে দিচ্ছি না !
উঃ !
ফাউল করে ন্যাটকে আটকেছে !
রোভার্সের ফ্রি-কিক ! পোস্টে লেগে বল ফিরছে !
একটুর জন্যে গোল হল না !
গোলকিপার কী করছে দ্যাখ !
বল কুড়িয়ে নিচ্ছে !
নাও, মাইক !
হঠাৎ...
এইবার কাগজ ওড়া !
ROVERS
এ কী !
কাগজে জড়িয়ে গিয়ে হকচকিয়ে গেছে গোলকিপার !
রয়ের সামনে ফাঁকা গোল !
গোলকিপার অসহায় ! কী করবে এখন রয় ?
ক্রমশ

উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

বাবা গৌরীশঙ্কর ও মা মঞ্জু দেবীর একমাত্র ছেলে শুভ্রকান্তি দে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট ৯১৩ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে। শুভ্রকান্তি হিন্দু স্কুলের ছাত্র। প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই স্কুলেই পড়েছে। এই বারো বছরের মধ্যে একবার শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হতে পারেনি। অন্যান্য সব ক্লাসে ও বরাবরই প্রথম। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮১৩ নম্বর পেয়ে চতুর্থ হয়েছিল। কিন্তু কোনও পরীক্ষার কোনও নম্বরই ওঁকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। "এর চাইতেও ভাল ফল করতে হবে, এই রকম একটা চিন্তা সবসময়ই আমার ছিল," শুভ্রকান্তি জানাল। এই আকাঙ্ক্ষাই ওঁকে আজ প্রথম স্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে। এর সঙ্গে আছে ওর গৃহশিক্ষকদের সাহায্য, যা শুভ্রকান্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল। স্কুল থেকে তেমন কোনও সাহায্য পায়নি ও।

"প্রশ্নের উত্তর নিজেই তৈরি করতাম। তবে তার আগে দু-তিনটি রেফারেন্স বই আর পাঠ্যবই খুব খুঁটিয়ে পড়ে নিতাম। লেখার অভ্যাস না থাকলে অসুবিধে হয়। তাই প্রায় প্রতিটি প্রশ্নই লিখে তৈরি করেছি আমি।"

পড়াশুনোর বাইরে শুভ্র খেলাধুলো করে, গিটার বাজায়, গান করে। ক্রিকেট খেলতেই ভাল লাগে ওর। ওর প্রিয় ব্যাটসম্যান গাওস্কর আর বোলার চন্দ্রশেখর। গিটারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজায়। গান গাইতে ভালবাসে। দেবব্রত বিশ্বাস ওর প্রিয় গায়ক। প্রিয় লেখক—রবীন্দ্রনাথ।

রেফারেন্স বইয়ের প্রসঙ্গে শুভ্রকান্তি জানাল, বাংলায় অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' আর শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' পড়েছে। পদার্থবিদ্যা পড়েছে দত্ত-পাল-চৌধুরী আর চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের বই। এ ছাড়া আছে Resnick Halliday-এর বইও। রসায়নে রঞ্জিত দাশ, পি. কে. দত্ত উচ্চ মাধ্যমিকের বইয়ের সঙ্গে আছে বি. এসসি-র পোদ্দার-ঘোষের বই। Bruce. H. Mahan-এর বইও পড়েছে।



বিদেশী প্রকাশনার বইগুলি প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে সোজাসুজিভাবে সাহায্য না করলেও নির্দিষ্ট বিষয়গুলির ধারণা পরিষ্কার করতে সাহায্য করেছে। মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিকের মধ্যে বিরাট একটা ফারাক আছে বলে শুভ্র মনে করে। তবে মাধ্যমিকের পর থেকেই যদি ঠিকমতো পড়াশুনো করা যায়, তা হলে ফারাকটা আর তেমন বড় হয়ে উঠতে পারে না। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পরে ও আর সময় নষ্ট করেনি, অঙ্ক কষতে শুরু করে দিয়েছিল।

"কার মতো হতে ইচ্ছে করে? কে তোমার আদর্শ?" আমার এই প্রশ্নের উত্তরে শুভ্রকান্তি ওর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ তুলে খুব মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলল, "আমি আমার নিজের মতোই হতে চাই। তবে জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী পড়েছি। ওঁকে খুব ভাল লাগে।"

পড়াশুনোর বাইরে শুভ্র খেলাধুলো করে, গিটার বাজায়, গান করে। ক্রিকেট খেলতেই ভাল লাগে ওর। ওর প্রিয় ব্যাটসম্যান গাওস্কর আর বোলার চন্দ্রশেখর। গিটারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজায়। গান গাইতে ভালবাসে। দেবব্রত বিশ্বাস ওর প্রিয় গায়ক। প্রিয় লেখক—রবীন্দ্রনাথ।

কেবলমাত্র উচ্চ মাধ্যমিকে নয়, জয়েন্ট এন্ট্রান্সেও প্রথম হয়েছে শুভ্র। শুভ্রর ধারণা, উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যসূচি জয়েন্ট এন্ট্রান্সে সাহায্য করে। প্রশ্নের ধরনটাই শুধু আলাদা।

বর্তমানে খড়্গপুরের আই. আই. টি'তে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে শুভ্র। ভবিষ্যতে ও অধ্যাপনা করতে চায়।

প্রশ্ন

১ চাঁদে কেউ বন্দুক ছুঁড়লে কতদূর পর্যন্ত শোনা যাবে?

২ ফাইটোট্রন কী?

৩ মানুষের দাঁতের সঙ্গে মাছের আঁশের কী সম্পর্ক?

৪ ইংরেজি শব্দ 'ফিউসন' ও 'ফিশন'—এই দুইয়ের তফাত কী?

৫ ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্রটি কোন্ বাঙালি বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছিলেন? (ক) প্রফুল্লচন্দ্র রায় (খ) সত্যেন্দ্রনাথ বসু (গ) জগদীশচন্দ্র বসু

৬ মানুষের চোখে কতগুলি আলোক-সংবেদী কোষ আছে?

৭ জেট ইঞ্জিন ও রকেটের ইঞ্জিনের মধ্যে তফাত কী?

৮ পাহাড়ে ওঠার সময় পর্বতারোহীরা সামনে ঝুঁকে চলে কেন?

৯ বেড়ালের চোখ কি জ্বলে?

১০ উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতে গেলে সব কিছুর ওজন বাড়ে কেন?

উত্তর

(১) চন্দ্রপৃষ্ঠে বাতাস না থাকায় বন্দুক ছোঁড়ার কোনও শব্দই শোনা যাবে না। (২) এক বিশাল যন্ত্র, যা দিয়ে কাচের ঘরে ইচ্ছেমতো যে-কোনও আবহাওয়া তৈরি করা যায়। (৩) বিবর্তনের মাধ্যমে মাছের আঁশ কালক্রমে মানুষের দাঁতে রূপান্তরিত হয়েছে। (৪) ফিউশন হচ্ছে দুটি পরমাণুর সংযুক্তি। ফিসন প্রক্রিয়ায় পরমাণুর সংঘর্ষে তাপ উৎপন্ন হয়। (৫) জগদীশচন্দ্র বসু। (৬) ১,৩০,০০০,০০০। (৭) জেট ইঞ্জিনের জ্বালানি দহনের জন্য বাতাসের অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। রকেটের ইঞ্জিনের জ্বালানিতে তরল অক্সিজেন মেশানো থাকে। (৮) সামনে ঝুঁকে থাকলে শরীরের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রটি (সেন্টার অব গ্র্যাভিটি) সামনে এগিয়ে যায়। ফলে পাহাড়ে চড়তে সুবিধে হয়। (৯) না, ওটা বাইরের আলোর প্রতিফলন। (১০) দুই মেরুতে মাধ্যাকর্ষণ বেশি বলে।

মিলির সময় বড় কম

আমাদের মিলিকে আজকাল দেখবে, সদাই ব্যস্ত। এই সে ইস্কুল থেকে এল, এই চলল কিছু-একটা শিখতে।

It's like that almost all the days of the week.
You'll often find her rushing off to her music classes or dance classes within minutes of returning from school.
She goes for her music lessons three days a week.
This has been going on for years.
Now she has started learning dancing, too.
She has her dancing lessons twice a week.
Also twice weekly she goes to the Dhakuria lakes where she has joined a swimming club.
And for some weeks now she has had another engagement.
The younger sister of a friend of her's comes to her every other day.
Milly helps her with her English.
So you can see that Milly's time is pretty full.
Some days she feels that she has too much to do.
She wishes she had a little more time to read a story book, or just lie in bed doing nothing.





আগের বার আমরা দেখেছি, কোনও ঘটনা খুব ঘন-ঘন ঘটা, তার চেয়ে কম ঘন-ঘন ঘটা, এই রকম ভাবে কমতে-কমতে কদাচিৎ ঘটা, কিংবা একেবারেই না ঘটা—এই সব ইংরেজিতে কী ভাবে বোঝানো হয়।

এইবার দ্যাখো, ঘটনা কী রকম ঘন-ঘন ঘটে, তা আরও কী-কী ভাবে বোঝানো যায়।

যেমন ধরো, একদিন অন্তর কোনও ঘটনা

The younger sister of a friend of her s comes *every other day.*

তেমনি ভাবে :

every other hour, every other month,

ইত্যাদিও বলা যায়।

আরও দ্যাখো

She goes for her music lesson *three days a week.*
She has dancing lessons *twice a week.*
Some days she feels that she has too much to do.

প্রসাদ

অর্থ জানো

পক্ষ্ম...সৃক্কণী...

আমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন বিস্ময়কর, তাদের নামও তেমনি বিচিত্র, 'অপাঙ্গ' শব্দ শুনলে আমরা চোখ কপালে তুলি, অথচ জানি না যে তা চোখের কোণেরই নাম। ওই জাতীয় নীচের প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **কনীনিকা**—(ক) ছোট চোখ, (খ) চোখের পাতা, (গ) চোখের তারা, (ঘ) অক্ষিপটল।

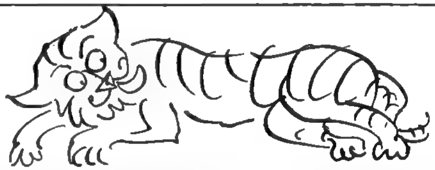
২। **আস্য**—(ক) ওষ্ঠ, (খ) দন্ত, (গ) চক্ষু, (ঘ) মুখ।

৩। **পক্ষ্ম**—(ক) পাখা, (খ) চোখের পাতা, (গ) চক্ষুলোম, (ঘ) চোখের কোণ।

৪। **সৃক্কণী**—(ক) দন্ত (খ) জিহ্বা, (গ) ওষ্ঠ, (ঘ) ওষ্ঠের দুই প্রান্ত।

৫। **কুক্ষি**—(ক) বগল, (খ) বক্ষ, (গ) উদর, (ঘ) কণ্ঠ।





দেব-সেনাপতি

উত্তর : ১। **কনীনিকা**—(গ) চোখের তারা। এর অন্য যেসব অর্থ আছে তা অপ্রচলিত। যেমন, 'নিশ্চল দুটি কনীনিকা যেন নিদারুণ অভিমানে নিষ্প্রভ হয়ে আছে' (সুবোধ ঘোষ)।

২। **আস্য**—(ঘ) মুখ। সংস্কৃত আস্য কথার মূল অর্থ হল যেখানে আহার নিক্ষেপ করা হয় অর্থাৎ মুখ। যেমন, 'সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায় মেলিল বিপুল আস্য' (রবীন্দ্রনাথ)।

৩। **পক্ষ্ম**—(গ) চক্ষুলোম। যেমন, 'এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া/সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া/বিদেশীর অঙ্গ হতে' (রবীন্দ্রনাথ)

৪। **সৃক্কণী**—(ঘ) ওষ্ঠের দুই প্রান্ত। চলতি কথায় বলে কশ। যেমন, 'বাঘটি ভোজন সমাপ্ত করিয়া পরম তৃপ্তির সহিত সৃক্কণী পরিলেহন করিতেছে' (পরশুরাম)।

৫। **কুক্ষি**—(গ) উদর, উদরগহ্বর। যেমন, 'নায়েববাবু ইতিমধ্যেই কিছু টাকা কুক্ষিগত করে বসে আছেন।'

শীর্ষাসন

হাঁটু গেড়ে বোসো। প্রণামের ভঙ্গিতে মাথা মাটিতে ঠেকাও। এবার এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলে গলিয়ে মাথার পেছনে মাটিতে রাখো। কনুই মাটিতে লেগে থাকবে। এরপর দু'পা সোজা করে নিতম্ব ওপরে তোলো। মাথা, পিঠ ও নিতম্ব মাটি থেকে খাড়া অবস্থায় থাকবে। পায়ের আঙুল ও মাথার তালু মাটিতে লেগে থাকবে। এরপর হাঁটু ভাঁজ করে বুকের সঙ্গে লাগাও এবং জোড়া পায়ের পাতা উপরে তুলে গোড়ালি নিতম্ব সংলগ্ন রেখে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখো।

এরপর হাঁটু উপরের দিকে তুলে দু'পা সোজা করো। দেহটি একটি সরল রেখায় থাকবে।

দ্রষ্টব্য ও সাবধানতা : গোড়ার দিকে শীর্ষাসন করার সময় পিছনের দিকে পড়ে গিয়ে ঘাড়ে চোট লাগার আশঙ্কা থাকে। তাই অভ্যাসের শুরুতে ব্যালান্স ভালভাবে না আসা পর্যন্ত দেওয়ালের সাহায্য নিয়ে অভ্যাস করতে পারো।

কনজাংটিভাইটিস, ব্রঙ্কিয়েকটেসিস, হাই ব্লাডপ্রেসার, চোখের রেটিনার কোনও অসুবিধা থাকলে শীর্ষাসন কোরো না।

উপকারিতা : বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মতানুসারে আমাদের জৈব প্রবৃত্তিজনিত উত্তেজনা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ, ভয় প্রশমিত করা ও মানসিক ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় না। আপাত কারণ ছাড়া প্রবৃত্তি চেতনা ও মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সে-ক্ষেত্রে শীর্ষাসন অদ্বিতীয়, কারণ এই আসন নিয়মিত অভ্যাসে মানসিক স্থিতিস্থাপকতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস্ নিরাময়ে সহায়তা করে। শীর্ষাসন অভ্যাসে ভাল ঘুম হয়। অশ্বিনীমুদ্রা সহযোগে এই আসন অভ্যাস করলে অর্শ, চুল পড়া বা অকাল কেশ পক্বতাজনিত ব্যাধি কমে এবং দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি বাড়ে।



বিশ্বনাথ ঘোষ,
প্রেমসুন্দর দাস

ফোটো দিব্যসুন্দর দাস

হবি

ডাকটিকিট

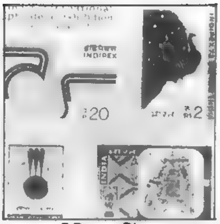
ডাকটিকিট কীভাবে চিনবে

জাল টিকিট—FORGERY এর ওপর জাল ডাকমোহর থাকতে পারে। আসল ডাকটিকিটের ওপর জাল ওভারপ্রিন্ট। GUM—ডাকটিকিটের পেছনে ডাক-কর্তৃপক্ষের লাগানো আঠা। GUTTER— দুটি ডাকটিকিটের মাঝখানের সাদা অংশ। IMPERFORATE—পার্ফোরেশন নেই, এমন ডাকটিকিট। INVERTED—ভুলক্রমে উলটো ছাপা। MINIATURE SHEET—একটি ছোট শিটে এক বা একাধিক ছাপা টিকিট, সাধারণত সংগ্রাহকদের জন্য তৈরি, ডাকেও ব্যবহার করা যায়। MINT—অব্যবহৃত ডাকটিকিট। ডাকঘর থেকে কিনতে পাওয়া যায়। MOUNTED MINT—অব্যবহৃত ডাকটিকিট, হিন্‌জের সাহায্যে যা অ্যালবামে লাগানো হয়েছে। NEWSPAPER STAMP— যা কেবল খবরের কাগজ ডাকে পাঠানোয় ব্যবহার হয়। OFFICIAL STAMPS—সরকারি কাজে লাগে। সাধারণের জন্য নয়। OVERPRINT—ডাকটিকিট ছাপার পর বাড়তি কথা বা দাম পরে ছাপা। যেমন ১৯৪৭ সালে



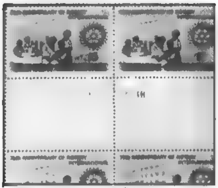
বাংলাদেশের ওভারপ্রিন্ট ডাকটিকিট

পাকিস্তান হওয়ার পর কিছুদিন ভারতের ডাকটিকিটের উপর PAKISTAN ছাপ ব্যবহার করা হয়েছিল। PAQUEBOT



ভারতের মিনিয়েচার শিট

MAIL— জাহাজের ডাকে-দেওয়া চিঠি, যার ওপর অনেক সময় PAQUEBOT ছাপ দেওয়া থাকে। PERFINS—ডাকটিকিটের ছবির ওপর পার্ফোরেশন করা, যা আগে বেসরকারি সংস্থায় চালু ছিল ডাকটিকিট চুরি বন্ধের জন্য। PERFORATIONS —টিকিটের চারধারে ফুটো-ফুটো করা, যাতে তা সহজেই শিট থেকে ছিঁড়ে নেওয়া যায়। POSTAGE DUE STAMPS—কোনও-কোনও দেশের ডাক-কর্তৃপক্ষ চিঠি বা পার্সেলের ওপর ডাকমাশুল কম থাকলে এই টিকিটগুলি লাগিয়ে দেন প্রাপকের কাছ থেকে বাকি অর্থ আদায়ের জন্য। PROOF—ডাকটিকিট ছাপার আগে পরীক্ষামূলক ছাপা। SETENANT — বিভিন্ন রং, ডিজাইন বা দামের ডাকটিকিট একসঙ্গে, একই শিটে ছাপা। SPECIMEN STAMPS—অনেক সময় ডাকটিকিট ছাপার পর তার



গাটার পেয়ার ডাকটিকিট

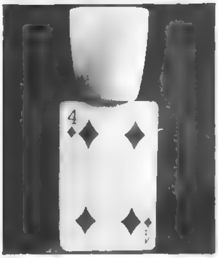
ওপর 'SPCIMEN' কথাটি ছেপে দেওয়া হয় বিভিন্ন কাজ বা উপহারের জন্য। ডাকে ব্যবহারের যোগ্য নয়।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্যাজিক

অদ্ভুতুড়ে ব্যালান্সের খেলা

জাদুকর এক প্যাকেট তাস থেকে একটা তাস নিলেন। তাসের দু'পিঠ দর্শকদের দেখালেন। এবার তাসটাকে টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে আস্তে সরিয়ে নিলেন হাতটা। দেখা গেল, তাসটা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এবার তিনি জলভর্তি একটা ছোট গ্লাস দাঁড়-করানো তাসটার ওপর রাখলেন। আর ঠিক আগের বারের মতনই, আস্তে করে হাতটা সরিয়ে নিলেন। দেখা গেল, টেবিলের ওপর একটা তাস দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তার মাথার ওপর ব্যালান্স করে রয়েছে একটা জলভর্তি গ্লাস। ভাবছ তো কেমন করে হল ? হল ম্যাজিকে। আর সেই ম্যাজিকের জন্য দরকার দুটো তাস। একটা তাসের পিছনের দিক লম্বালম্বি ভাঁজ করে নাও।





ভাঁজ-করা তাসটার সামনের দিকে আধাআধি অংশে আঠা লাগিয়ে সেটা অন্য তাসটার পিছনদিকে সেঁটে দাও। আঠা শুকিয়ে যাওয়ার পর যদি ভাঁজ-করা তাসটার ভাঁজ খুলে সামনের তাসটার সঙ্গে মিলিয়ে চেপে ধরে, তা হলে একটা তাস বলেই মনে হবে। এই অবস্থায় দু'পিঠ ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় ওটা একটাই তাস। ছবি দেখলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে।

এবার দেখানো। ওপরে যেমনভাবে বলা হয়েছে, সেইভাবে তাসটার দু'পিঠ দেখিয়ে দাও। এবার তাসের সামনের দিকটা দর্শকের দিকে রেখে টেবিলের ওপর বসাও। পিছন দিকের ভাঁজ-করা তাসটা আস্তে-আস্তে খুলে দাও। তাসটা দাঁড়িয়ে থাকবে। এবার জলভর্তি একটা গ্লাস তাসটার ওপর রাখলেও পড়বে না।

(জাদুকর) তাপস বসু

কার্ডটা দারুণ দেখতে। রুচিশীল, পরিচ্ছন্ন। তুলোট কাগজ। ধপধপে সাদা। মাঝে-মধ্যে রুপোলি রেশমি আঁশ। তার উপরে লাল কালিতে ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র।

ছোট্‌কার নামেই এসেছিল কার্ডটা। ছোট্‌কার বন্ধু অরুণকাকা ও মাধুরীকাকিমার বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। সেই উপলক্ষে অরুণকাকার ভাইরা ও মেয়ে শ্রীপর্ণা মিলে একটা ছোটখাটো উৎসবের আয়োজন করেছে। উৎসবটা হবে সল্ট লেকেই, অরুণকাকার নতুন বাড়িতে। ছোট্‌কার নেমন্তন্ন।

অরুণকাকা ও মাধুরীকাকিমা দু'জনেই চাকরি করেন। মেয়ে শ্রীপর্ণাও গত বছর ইকনমিক্স-এ এম. এ. পাশ করেছে। এ-বছরের গোড়াতে সেও একটা ব্যাঙ্কে অফিসার হয়ে ঢুকেছে। ছোট্‌কা বলছিল, বিয়ের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ, আসলে অরুণকাকাদের কাছে অনেকগুলো খাওয়া পাওনা বন্ধুবান্ধবদের।

ছোট্‌কা অবশ্য বিশাল ফুলের তোড়া ও ছোটখাটো উপহার নিয়ে গেল নেমন্তন্ন রক্ষা করতে, শ্রীপর্ণার জন্যও সুন্দর একটা ব্যাগ কিনেছে। আর যাবার আগে আমার জন্য রেখে গেল একটা চমৎকার ধাঁধা। সেটা দিয়েই শুরু করছি।

প্রথম ধাঁধা ॥ অরুণকাকা ও মাধুরীকাকিমার বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। দু'জনের বয়সের ব্যবধান ছ'বছর। আর, দু'জনের এখনকার বয়স গুণ করলে হয়,



২২৯৫।

এ-থেকে বলতে হবে, বিয়ের সময় অরুণকাকার বয়স কত ছিল, মাধুরীকাকিমারই বা কত বয়স তখন? পারবে না? বলে ফেলো তা হলে।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একটা ফুলের নাম বসিয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ করো—চণ্ডীমঙ্গল-এর কবি মু—রাম চক্রবর্তী!

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও— জয়জরতন্ত্রী

গতবারের উত্তর ॥ (১) '৮৪ সালে লিপইয়ার ছিল। ফেব্রুয়ারি ও মার্চের দিনসংখ্যা তাই ৬০(২৯+৩১)। ৬০ দিনই কাজ করলে মিস্ত্রি পেত ৬০০ টাকা বকশিশ। কিন্তু ৩২৫ টাকা (৬০০-২৭৫) কম পেয়েছে। কামাইয়ের জন্য দিন বাদ গিয়েছে ১৩ টাকা (১০+৩) করে। তা হলে তার কামাই হয়েছে (৩২৫÷১৩) অর্থাৎ ২৫ দিন। তা হলে কাজ করেছে ৩৫ দিন। (২) প্লাবন। (৩) আশিরপদনখ।

সত্যসন্ধ

"উপন্যাস লিখেছেন দেখলাম। তা কাকে দিয়ে লেখালেন?"

"আমি না হয় কাউকে দিয়ে লিখিয়েছি, আপনি কাকে দিয়ে পড়ালেন?"

হোটেলের ছোট ঘর দেখে পছন্দ হল না দু' বন্ধুর। বিরক্ত হয়ে ম্যানেজারকে বলল, "এই তো শুয়োরের খোঁয়াড়। এর ভাড়া কুড়ি টাকা?"

ম্যানেজার হেসে উত্তর দিলেন, "একটা শুয়োরের জন্য কুড়ি টাকা। দুটো থাকলে পনেরোতেই হবে।"

"কোন্ বাচ্চাকে বাঘের দুধ খাওয়ানো দরকার?"

"বাঘের বাচ্চাকে।"

"আসামিই যে খুন করেছেন, প্রমাণিত হয়েছে। নরহত্যা যে পাপ আসামির শেখা উচিত। আমি ফাঁসির হুকুম দিলাম।"



"দোহাই ধর্মাবতার, ফাঁসি দেবেন না। তা হলে কিছুই শিখতে পারব না।"

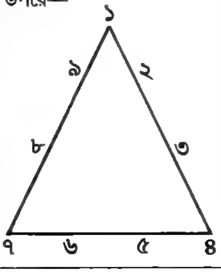
ছবি প্রবীর সেন

মজার খেলা

খুব সহজ অথচ সুন্দর একটি খেলা শেখা যাক এবার। এ-খেলার জন্য কোনও পূর্বপ্রস্তুতির দরকার নেই। বন্ধুদের আড্ডায় কি বাড়িতে কেউ এলে, চট করে দেওয়া যায় এই মজার খেলাটা। দেখবে, বেশ কিছুটা সময় আনন্দে কেটে যাবে কেমন।

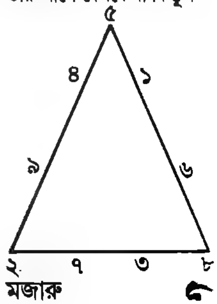
হ্যাঁ, সময় লাগবেই। কেননা, ভেবেচিন্তে সমাধান করতে হবে তো! ধরলাম আর সমাধান করলাম, এমন চটজলদি সমাধান মোটেই নয়। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা দরকার, কোথায় কী বসালে শর্তটা মিলবে।

কাগজ আর পেনসিল নাও। আর নীচের ছবির মতো একটা ত্রিভুজ এঁকে ফেলো কাগজের উপরে—



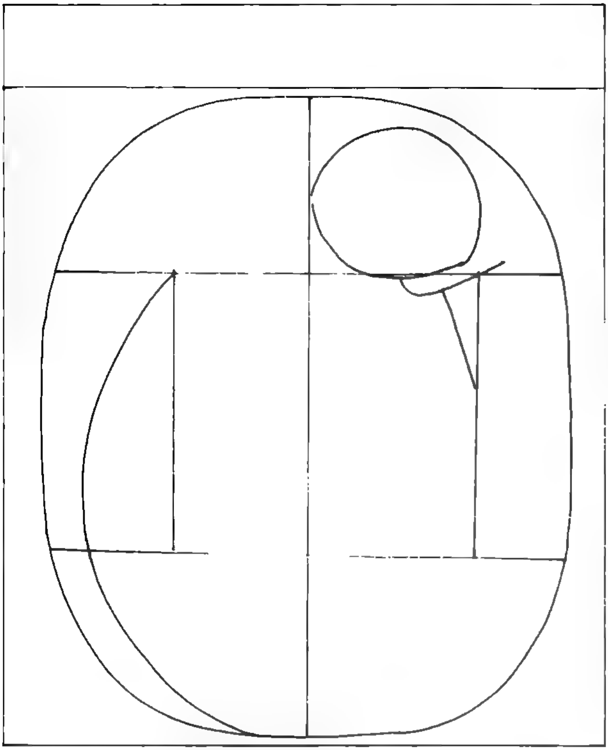
ত্রিভুজটা এঁকে পাশে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাও বসিয়ে দাও। তিন কোণে তিনটে সংখ্যা আর তিন বাহুর প্রত্যেকটার মধ্যে দুটো করে সংখ্যা। এবার কী করতে হবে শোনো। সংখ্যাগুলোকে এমনভাবে জায়গা বদল করে বসাতে হবে, যে, প্রত্যেক বাহুর যোগফল যেন সমান হয়। এখন যেভাবে সাজানো আছে তাতে কোনও বাহুর যোগফল ২৫, কোনওটার ১০, আবার কোনওটার ২২। এটাই বদলে তিনক্ষেত্রে সমান করতে হবে।

একটা সমাধান দেওয়া রইল। নিজে না পারলে, দেখে নিয়ো। তার আগে দেখবে না কিন্তু।



মজারু

তুমিও ভাবতে থাকো



এবার ৪ নং গোলের মধ্যে যে ভাগটিকে দেখানো হয়েছে, তাকে ঘিরে কী গড়ে উঠবে সেটাই ভাবতে হবে। এখানে সেই গড়ে-ওঠার আকারটির ইঙ্গিত দেওয়া হল। তুমিও ভাবতে থাকো কেমনভাবে একে সম্পূর্ণতা দেওয়া যায়।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিসের ফোটো

ফোটো : রবিন বিশ্বাস



গত সংখ্যায় ছিল ফ্লাস্কের মুখের ফোটো

১	২	৩			৪	৫	৬
৭					৮		
		৯	১০	১১			
	১২		১৩			১৪	
	১৫						
১৬						১৭	১৮
১৯					২০		

সংকেত পাশাপাশি (১) প্রণম্য। (৪) পৃথিবীর এক প্রান্ত। (৭) সড়কি। (৮) দুধের সর। (৯) মেরুদণ্ড। (১৩) এই কথা বলে গালে হাত দিয়ে মেয়েরা অনেক সময় বিস্ময় প্রকাশ করে। (১৫) বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। (১৬) কোন্ প্রাণীকে সবচেয়ে ক্রূর বলা হয়? (১৭) রাষ্ট্র, মুলুক। (১৯) গানের তালবিশেষ। (২০) আগুন।

উপর-নীচ (১) ধারাপাতে নয়ে কী? (২) কুস্তিগির। (৩) পৌরাণিক মণি। (৪) দক্ষিণের অন্তরীপ। (৫) উৎসব বা পরব উপলক্ষে প্রদর্শনী। (৬) তাসের চিহ্ন। (১০) জলজ উদ্ভিদ। (১১) শূন্যস্থান পূরণ 'ছিল—, হয়ে গেল বেড়াল।' (১২) লোকালয়। (১৪) শ্রীকৃষ্ণ। (১৬) কালোর বিপরীত। (১৮) যে-জাতির নামে একটি অব্দ প্রচলিত আছে

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

মে	ঘ	ম	ল্লা	র		পা	ক
ঘ		হু		শি	লা	লি	পি
না	গ	রা	জ		জ		ধ্ব
	র		গা	ল		বা	জ
ডা	ব		ই	হ		লু	
ং		শি		রা	ত	কা	না
গু	গা	বা	বা		ড়ি		ক
লি	মা		ঘ	টো	ৎ	ক	চ

রঞ্জন

সালকিয়া হিন্দু হাই স্কুল (ইউনিট-২)

উত্তর হাওড়ার সালকিয়ার ঘিঞ্জি রাস্তা দিয়ে এসে পৌঁছলাম গোলাপি রঙের তিনতলা বাড়ির সামনে। একই বাড়িতে তখন দুটি বিদ্যালয়ের ক্লাস চলছে। আমার প্রয়োজন ছিল সালকিয়া হিন্দু হাই স্কুল (ইউনিট-২)-এ। তাই, ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবীপ্রসাদ মিত্রের সহায়তায় গিয়ে পৌঁছলাম প্রধানশিক্ষকের ঘরে।

প্রাথমিক কথাবার্তার পরে প্রশ্ন রাখলাম, "একই বাড়িতে দুটি বিদ্যালয়ের ক্লাস চলে কেন?" উত্তরে শিক্ষক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের মুখে জানা গেল স্কুলের ইতিহাস। মধুসূদনবাবু এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র।

প্রায় একশো বছর আগে এই স্কুলের নাম ছিল সালকিয়া হিন্দু এইচ· ই· স্কুল। ১৯৬০ সাল থেকে স্কুলের নাম হয় সালকিয়া হিন্দু



প্রধানশিক্ষক

স্কুল। ছাত্রসংখ্যা খুব বেড়ে যাওয়ার জন্যে ১৯৬৫ সালে এই ইউনিটটিকে সালকিয়া হিন্দু জুনিয়র হাই স্কুল নামে আলাদা করা হয়। ওই সালের ১০ অগস্ট থেকে এটিকে আলাদা স্কুল হিসেবে ধরা হয়। ১৯৬৬ সালে এই স্কুলটি বোর্ডের অনুমোদন পায়। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে মাধ্যমিক পরীক্ষার অনুমোদনও লাভ করে। তখন আবার স্কুলের নতুন নাম হয়—সালকিয়া হিন্দু হাই স্কুল (ইউনিট-২)।

স্কুলটি আলাদা ভাবে শুরু হওয়ার সময় ছাত্রসংখ্যা ছিল আনুমানিক সাতশো। বর্তমানে ছাত্রের সংখ্যা আটশো।

প্রথম বছর স্কুল-ফাইনাল কোর্সে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় একশো। জনাতিনেক বাদে বাকি সবাই পাশ করেছিল। মাধ্যমিক স্কুল হওয়ার পর থেকে প্রধানশিক্ষকের পদে আছেন বামাপদ দাস। সহ-প্রধানশিক্ষকের নাম বাসুদেব আদক।

প্রধানশিক্ষক বললেন, "প্রতি বছর



মাধ্যমিকে আমাদের স্কুলে পাশের হার নব্বই থেকে পঁচানব্বই শতাংশ। এবার অবশ্য তুলনামূলক বিচারে পাশের হার ভাল নয়। এই স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই শিল্পাঞ্চল-এলাকার ছেলেমেয়ে। এদের অনেকের বাড়িতেই পড়াশোনা করার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। তবে, আমাদের স্কুলের শিক্ষকরা শুধু পড়াশোনাই নয়, ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ চান। নানা বিষয়ে ছাত্রদের উৎসাহ দেন শিক্ষকরা। বিভিন্ন সৃজনমূলক রচনা, যোগ-ব্যায়াম, খেলাধুলো ইত্যাদি ব্যাপারে ছাত্ররা বেশ সুনাম অর্জন করেছে।" এই প্রসঙ্গে জানা গেল, এ-বছর জেলাভিত্তিক ও রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ এবং সৃজনমূলক রচনায় এই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র রাজু দণ্ডলকর ও দশম শ্রেণীর অমিতাভ গায়েন প্রথম স্থান লাভ করেছে।

স্কুল থেকে 'ইঙ্গিত' নামে সাহিত্যবিষয়ক একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ-ছাড়া, ছাত্ররা মাসিক দেওয়াল-পত্রিকাও প্রকাশ করে। ওয়ার্ক এডুকেশনে মাটির কাজে ছেলেরা খুব দক্ষ। এ-বিষয়ে লেটারও পায়।

স্কুলে খেলাধুলোরও ভাল ব্যবস্থা আছে। বার্ষিক স্পোর্টস স্থানীয় কোনও বড় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেল, ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে মাঝেমধ্যে ফুটবল খেলাও হয়ে থাকে।

স্কুলের গ্রন্থাগারে প্রায় হাজারের ওপর বইপত্র আছে। ছাত্ররা গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকে নিয়মিত ভাবে।



লেখাপড়ায় ছাত্রদের ভাল ফল করার ব্যাপারে বিভিন্ন শিক্ষকের অভিমত জানতে চাইলে প্রধানশিক্ষক বললেন, "আমি ইতিহাস পড়াই। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস কমিটির সদস্য। সাল-তারিখের বদলে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার ওপর ছাত্রদের জোর দেওয়া দরকার। তা হলে ইতিহাস সম্পর্কে একটা মূল্যবোধও গড়ে উঠবে।"

ইংরেজির ব্যাপারে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদন ঘোষ নতুন সিলেবাসকে ভালই বললেন। তবে, সাহিত্যের চাইতে ভাষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। তাই ছাত্রদের পড়ার অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন।

ভূগোলের শিক্ষক শশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত, "বর্তমান সিলেবাস বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়ায় ছাত্রদের পড়ার আগ্রহ বেড়েছে। এই আগ্রহ শুধু পড়ায় নয়, ছবি ও মানচিত্র অঙ্কনেও বাড়াতে হবে। তা হলে পরীক্ষায় নম্বর বেশি উঠবে। মানচিত্র চিহ্নিতকরণের নিয়মিত অভ্যাস প্রয়োজন।"

"বাংলায় জ্ঞান বাড়াতে হলে পাঠ্য বইয়ের বাইরের বইও পড়া দরকার।" এ-কথা জানালেন বাংলার শিক্ষক জীবনকৃষ্ণ মিত্র।

"ছাত্রদের মধ্যে দু'ধরনের মেধা দেখা যায়। যাদের মেধা ভাল তারা ভাল ফল করতে পারে। কিন্তু যাদের মেধা কম তাদের টেস্ট পেপারস্ থেকে বেশি করে অনুশীলন করা দরকার।" অঙ্ক প্রসঙ্গে এই কথাটি জানালেন ওই বিষয়ের শিক্ষক সুশান্ত রায়।

ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক অনিল গায়েন বললেন, "ছাত্রদের ছোট-ছোট প্রশ্নের সাহায্যে পড়াই। তাতে তাদের উপকার হয়। ছাত্ররা ভাল ফল করে, লেটারও পায়।"

বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষিকা বীথিকা বাগচী জীবনবিজ্ঞান প্রসঙ্গে জানালেন, "ছাত্রদের সিলেবাসের বাইরের বইও পড়া দরকার।"

ইন্দিরা রায়

ফোটো অমিত দত্ত



ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

দশম শ্রেণীর ফার্স্ট বয় শুভেন্দু জানা এই স্কুলে ফাইভ থেকে পড়ছে। ফাইভ থেকে সিক্সে ওঠার সময় সেকেন্ড হয়েছিল, তা ছাড়া প্রতি বছরই ফার্স্ট হয়ে উঠেছে। নবম থেকে দশম শ্রেণীতে ওঠার সময় তার প্রাপ্ত নম্বর ৭০২। মাধ্যমিকে স্কুলের সুনাম রাখার মতোই ফল করতে চায়। পড়ার ব্যাপারে পাঠ্য বইয়ের বাইরের বইপত্রও পড়ে। ঘণ্টাসাতেক পড়ে। পড়ার সঙ্গে লেখার অভ্যাসও চলে।

পড়াশোনার বাইরে আর কী ভাল লাগে, এই প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু জানাল—ফুটবল খেলা। বাগান করারও ঝোঁক আছে। ছোটগল্প পড়তে ভালবাসে। প্রিয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র। হালের লেখকদের মধ্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সমরেশ মজুমদারের লেখা ভাল লাগে।

বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে শুভেন্দু। বাবা ব্যবসায়ী। ভবিষ্যতে শুভেন্দুর ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে।

‘বন্ধু’ এক আশ্চর্য মাত্রার ছবি

সত্যজিৎ রায় উপস্থাপিত নতুন সিরিয়াল শুরু হয়েছে ২৯ জুলাই। প্রথম ছবিটির নাম ‘বন্ধু’। এটি এক আশ্চর্য মাত্রার ছবি। এই বোধহয় প্রথম ভারতীয় ছবিতে আমরা ভিন গ্রহ ‘ভিনাস’-এর এক মানুষ বা অতিমানুষের দেখা পেলাম। এই মানুষের মাথাটি বেশ বড়, উজ্জ্বল দুটি চোখ। দুটি হাত, কিন্তু হাতের আঙুল মাত্র তিনটি! মোটা-মোটা আঙুল হলে হবে কী, এই মানুষটি দিব্যি একটা মহাকাশযান চালিয়ে পৃথিবীতে এসে নেমেছে এবং বিহারের একটি গ্রামের ভূগোল-শিক্ষকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। এই বন্ধুত্বের পর থেকে ভূগোল-শিক্ষকের জীবনের ধারাই গেল বদলে। এই গল্পটির লেখক সত্যজিৎ রায়। এরপর আরও এগারোটি অংশে দেখানো হবে আরও দুটি গল্প। এ দুটিও তাঁরই লেখা। একটি হল গোয়েন্দা-কাহিনী। ফেলুদা অবশ্যই আছেন গোয়েন্দা হিসেবে। অন্যটি বিজ্ঞান-সংক্রান্ত গল্প। ছবিগুলির পরিচালক সন্দীপ রায়।
বিজ্ঞান-সংক্রান্ত গল্পটির প্রথম অংশ কিছুটা ধীর-গতি, কিন্তু খুবই ভাল।
ইউ· জি· সি’র যে-সব অনুষ্ঠান দুপুরে এবং বিকেলে দেখানো হয়, সেগুলি সম্পর্কে প্রচারের বিশেষ আগ্রহ দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের থাকে না। প্রতিদিন পরবর্তী দিনের যে অনুষ্ঠানসূচি প্রচার করা হয়, তাতে কেবল বলা হয়—শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান। কিন্তু কী-কী দেখানো হবে তার কোনও পরিচয় দেওয়া হয় না। এর জন্য অনেকেই দুপুরের এই অনুষ্ঠানগুলি দেখার আগ্রহ বোধ করেন না। অনুষ্ঠানগুলির প্রতি আগ্রহ জাগানো দূরদর্শনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আরও একটা কথা, এতে যেসব অনুষ্ঠান দেখানো হয় সেগুলির কিছু-কিছু পুরনো। হ্যালির ধূমকেতু বিরাট এক ঘটনা ছিল ১৯৮৫ সালে,



‘বন্ধু’ ছবির একটি দৃশ্য

এই ধূমকেতু প্রতি পঁচাত্তর বছরে একবার পৃথিবীর কাছাকাছি আসে। এই ধূমকেতুটিকে দেখার ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য রুশরা কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার দলিলচিত্র আমরা দেখতে পেলাম ৭ অগস্ট। কিন্তু এই চিত্র এখন পুরনো হয়ে গেছে। বরং ওই সব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে নতুন কী জানা গেছে, কতখানি জানা গেছে, সেসব নিয়ে একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলে ভাল হত।
কিছুদিন আগে আর্থার ক্লার্ক-এর সঙ্গে আলোচনা-সংক্রান্ত একটি চমৎকার অনুষ্ঠান হল শূন্য অভিযান। ক্লার্ক যখন দিল্লিতে এসেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে আলোচনার একটি ভিডিও করা হয়েছিল। কিন্তু এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমরা আগে থেকে কিছুই জানতাম না। এমনকী, ইউ· জি· সি· যে সংবাদপত্রে দু’সপ্তাহের অনুষ্ঠানসূচির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, তাতে কেবল লেখা ছিল : এ প্রফেট অব দি স্পেস এজ-২। মনে হয়, এর আগে প্রথমাংশ প্রচারিত হয়েছে। ভাল-ভাল অনুষ্ঠান কেবল প্রচারের অভাবে অনেকেই দেখেন না। অথচ প্রচার কঠিন কাজ নয়। দূরদর্শনের বেশ কিছু অনুষ্ঠানই প্রচারমূলক। তা সত্ত্বেও প্রচারে তাঁদের এই বিমুখতা কেন? আরও একটা কথা, এটি স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য প্রচারিত হলেও অধিকাংশ ছাত্রই এই অনুষ্ঠান দেখানোর সময় থাকে স্কুলে বা কলেজে।
৩১ জুলাই মানিক সরকারের ছোট্ট অনুষ্ঠানটি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। বাঙালি এই ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকায় থাকেন এবং তাঁর দুই মেয়ে ও স্ত্রীর সহায়তায় যে মজার ছড়া ও গানের অনুষ্ঠান দেখালেন, তা বেশ উঁচু স্তরের।
খেলার অনুষ্ঠান বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে রবিবার এবং সোমবার। বিশেষ করে সোমবার যখন পশ্চিম বাংলার খেলা, খেলোয়াড়দের নিয়ে (বিশেষ করে ছোটদের) অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠান দেখে তরুণ খেলোয়াড়রা নিশ্চয়ই প্রেরণা পায়।
সংবাদ বিভাগ কলকাতায় খুবই দুর্বল। দিল্লির সংবাদ পরিবেশনও বেশ খারাপই বলা যায়। তবে, ৩০ জুলাই শ্রীলঙ্কায় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ওপর আক্রমণ বেশ তৎপরতার সঙ্গেই দেখানো হল। টিভির পর্দায় পুরো ব্যাপারটাই আমরা দেখতে পেলাম বিকেল চারটেতেই। কিন্তু বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ সেদিনই দেওয়া হয়নি কলকাতা দূরদর্শনে।
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পর্কে একটি চমৎকার আলোচনা হল ৩ অগস্ট। আলোচনা করলেন শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং প্রদীপ মজুমদার। এই আলোচনায় জানা গেল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বইপত্র এখন আর দোকানে পাওয়া যায় না। ব্যাপারটি খুবই দুঃখের।
১৩ অগস্টের ‘চিচিং ফাঁক’-এ প্রশ্ন করা হয়েছিল স্টেথোস্কোপ কে আবিষ্কার করেন? এর উত্তর হওয়া উচিত ছিল, স্টেথোস্কোপ কেউ আবিষ্কার করেননি। স্টেথোস্কোপ উদ্ভাবন করা হয়েছে। আবিষ্কার এবং



শ্রীলঙ্কার সেই দুর্ঘটনা

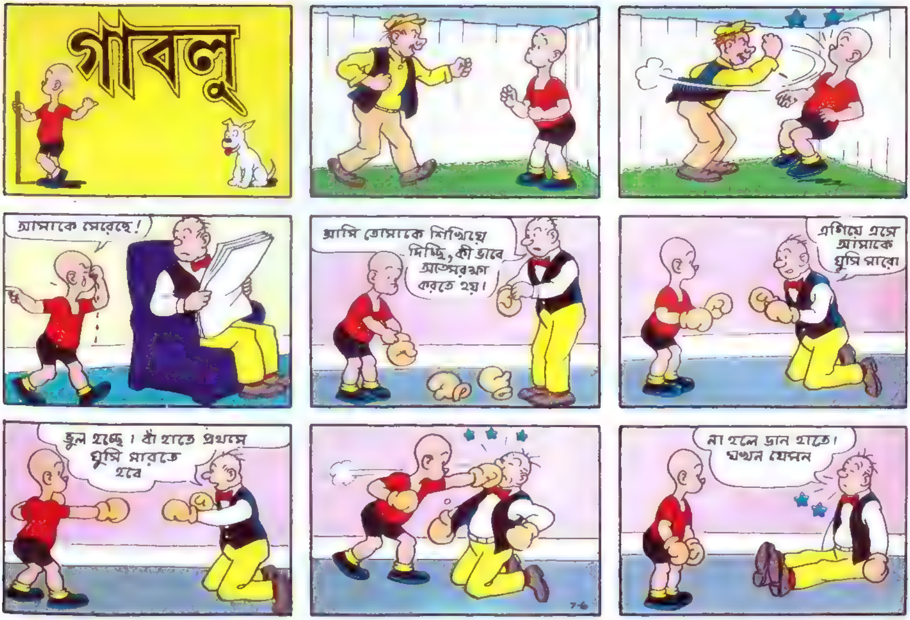
উদ্ভাবন—এই শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন, সেলাই কল উদ্ভাবন করেন হাউ নামের এক আমেরিকান। যাঁরা প্রশ্ন করেন তাঁরা যদি সতর্ক হয়ে ভাষা প্রয়োগ করেন এই সব সাধারণ ভুল এড়ানো যেতে পারে। ১৩ অগস্ট এক ঘোষিকা বললেন, তরুণদের জন্যেতে! এখানে কেবল ‘জন্যেই’ ছিল যথেষ্ট। আরও মজার ঘটনা ঘটে এই কলকাতার দূরদর্শনে। এখানে বাংলা অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় ‘ক্লোজ-আপ’! কী বলব, থ্রি চিয়ার্স?

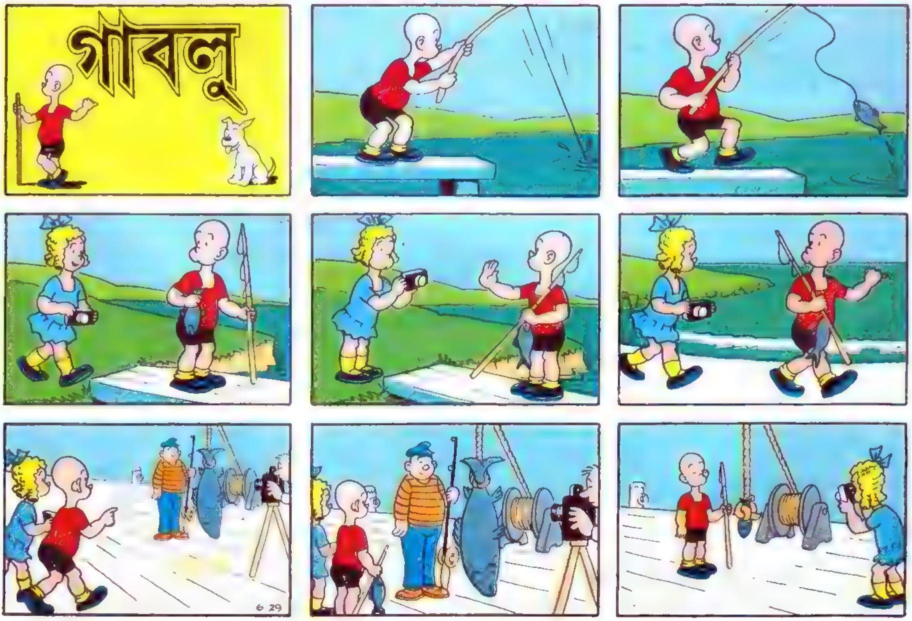
দিগ্‌দর্শক


স্পাইডারম্যান
লেখা স্ট্যান লি
আঁকা ফ্লোরো ডেনি
সহজ, স্বাভাবিক এক কলেজ-ছাত্র কি অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ও গোপন পরিচয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে…নাকি বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী ?
মেরি জেন, তুমি নিশ্চয় আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ না ?
BEACHFRONT HOTEL
না, আমি সুটকেস হাতে নিয়েই সব সময় বেড়াতে যাই !
না, যেতে পারবে না । শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই আমরা এখানে এসেছি !
এই তো দেখা হয়ে গেল !
তুমি চলে গেলে এই সাগরসৈকত ফাঁকা হয়ে যাবে !
এভাবে হঠাৎ চলে যাচ্ছ কেন ?
TAXI
বলেছিলাম না, একজনকে ভোলার জন্যই এখানে এসেছি ?
হ্যাঁ । কিন্তু…
ভোলা আর হল না !
4/19
আমার চেয়ে মেরি জেনের ভাগ্য ভাল । সে যাদের সঙ্গে কথা বলছে তারা ওর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন । কিন্তু আমার প্রতি জো রিজলার যে বৈরী, তা ওঁর কথাতেই বোঝা গেল ।
মাকড়সা-মানুষ ! ওকে না আটকালে আমাদের সবাইকে ফ্যাসাদে ফেলবে !
ওকে আটকাব বলেই তো এসেছি !
তা হলে আটকাও !
আসরে আসছেন নায়করা !



তেজস্ক্রিয় মাকড়সার আকস্মিক কামড়ে পিটার পার্কার অমিত শক্তির অধিকারী । কামড় খেয়েই সে হয়ে উঠেছে…
স্পাইডারম্যান
লেখা : স্ট্যান লি
আঁকা :
ভয়ঙ্কর এক মুখোশধারী, নাকি আধুনিক কালের এক যোদ্ধা ?
তোমার সঙ্গে মিটমাট করে নেব । তবে নিউ ইয়র্কে ফিরে আসার সময় মেরি জেন কী ভাবছে জানি না । তবে এতো আমার গল্প, তাই আমার মতো করেই এটা বলব·
এখন বুঝতে পারছি পিটারকে ছেড়ে আসা উচিত হয়নি !
আমি ওকে ছেড়ে চলে আসার পর ওর সঙ্গে যেন আর কারও দেখা না হয় !
হ্যাঁ, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে । তবে ওরা আমার বন্ধু নয় !
খেল খতম, রিঙ্কলার । আপনার জানা উচিত দুষ্টু লোকেরা সব সময় জেতে না !
ভেবেছিলাম, তুমি মরে গেছ !
আমি জানি, আমার আচার-আচরণ দেখে ওরা অনেক সময় বোকা বনে যায় ।
এখন বশ-মানা লোকের মতো বাঁধন খুলে ফেলুন রবার্টসন !
তুমি এখনও জেতোনি, মাকড়সা-মানুষ !
ওঃ!!
!
বাবা, তুমি নিশ্চয় ভাবোনি যে, আমি তোমার কোনও কাজে লাগব না !
রবিন !


গাবলু
আমাকে মেরেছে!
আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি, কী ভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়।
এগিয়ে এসে আমাকে ঘুসি মারো
ভুল হচ্ছে। বাঁ হাতে প্রথমে ঘুসি মারতে হবে
না হলে ডান হাতে। যখন যেমন
7-6


গাবলু
6 29


জামসাহেব দ্বিতীয় রনমলের তৈরি লাখোটা দুর্গ

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

জামনগরে

তোমাদের মধ্যে যারা ক্রিকেট খেলতে বা দেখতে ভালবাসো, তাদের নিশ্চয়ই রঞ্জি ট্রফির নাম বলে দিতে হবে না। আর যারা রঞ্জি ট্রফির নাম জানো, তারা নিশ্চয়ই এটাও জানো যে, এই প্রতিযোগিতার নামকরণ হয়েছে একজন বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটারের নামে। তিনি হচ্ছেন রণজিৎ সিংজি। তবে রণজিৎ সিংজি যে দেশীয় রাজ্য নবনগরের শাসক ছিলেন, এটা হয়তো সবার জানা নেই।

হ্যাঁ, জামসাহেব রণজিৎ সিংজি দেশীয় রাজ্য নবনগরের রাজা ছিলেন, এবং সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল জামনগর। জামনগর বর্তমানে গুজরাত রাষ্ট্রের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত একটি সুন্দর শহর। কিছুদিন আগে সেই শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, এখানে সেই কথাই বলছি।

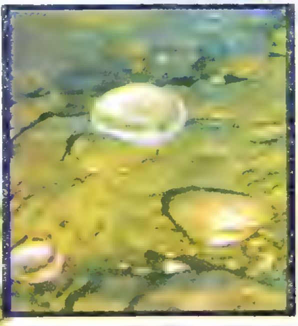
কিন্তু জামনগরের কথা বলতে হলে নবনগরের জামসাহেবদের (শাসক) কথা বাদ দেওয়া যাবে না। এঁরা শুধু এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতাই নন। ওখানে যা কিছু দ্রষ্টব্য আছে, তা প্রায় সবই বিভিন্ন জামসাহেবের আনুকূল্যে নির্মিত। এই জামসাহেবরা জাতেজা বংশীয়, জাতে রাজপুত। কিংবদন্তী এই যে, জাতেজারা এসেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশ, অর্থাৎ যাদব বংশ থেকে। কিংবদন্তীর সত্য-মিথ্যা জানা নেই, তবে ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রথম জামসাহেব রাওয়ালজি (১৫৩৫ – ১৫৬২ খ্রিঃ) কচ্ছ উপদ্বীপ পার হয়ে সৌরাষ্ট্রে এসে নবনগর রাজ্যের স্থাপনা করেন। এই রাজ্যের প্রথম রাজধানী ছিল খাম্বালিয়া বলে একটি জায়গায়, যদিও জামনগর নগরীর সূত্রপাতও হয় তখন থেকেই। কিছুদিন পর রাজধানী খাম্বালিয়া থেকে জামনগরে সরিয়ে আনা হয়।

রণজিৎ সিংয়ের জন্ম ১৮৭২ সালে, ও মৃত্যু ১৯৩৩-এ। উনি তদানীন্তন জামসাহেবের দত্তকপুত্র। ১৯০৭ সালে রণজিৎ সিং জামসাহেবের পদে অধিষ্ঠিত হন।

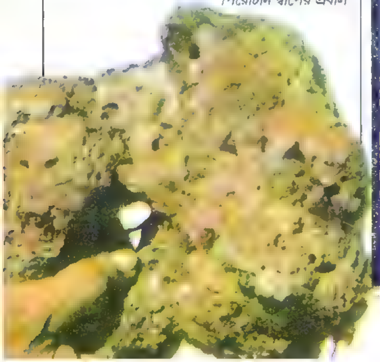
সেকালের অন্যান্য দেশীয় রাজাদের ছেলেদের মতো রণজিৎ সিংজিরও শিক্ষা-দীক্ষা ইংল্যাণ্ডে। তাঁর ক্রিকেট খেলার সূত্রপাতও সেখানেই। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রণজিৎ সিং নানাভাবে নিজের রাজ্যের উন্নতি করেন, এবং তাঁর আমলেই জামনগর একটি আধুনিক শহরে পরিণত হয়। জামনগরের রাস্তাঘাট চওড়া, অনেক সুন্দর-সুন্দর প্রাসাদ ইত্যাদিও আছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রণজিৎ সিংজি


খাম্বালিয়া গেট

পিবোটান দ্বীপেব জেলি ফিশ



পিরোটান দ্বীপের প্রবাল





প্রতাপ প্যালেস

কয়েকদিন



খাম্বালিয়া গেটের কারুকার্য

জামনগরে অনেক স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনা করেন এবং সাধারণের জন্য পানীয় জল সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করেন। এক কথায়, রণজিৎ সিংকে জামনগরের জনক বলা চলে।

জামনগরের ওপর মোটামুটি কিছু তথ্য সংগ্রহ করে আমরা শহরে পৌঁছলাম। তবে তথ্য সংগ্রহ করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ, গুজরাতের টুরিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরোর কাছে রাজ্যের বিভিন্ন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগরী সম্পর্কে কোনও প্রচারপুস্তিকাই নেই। কয়েকজন ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা এনেছিলাম। কথা ছিল, তাঁরাই আমাদের সাহায্য করবেন শহরটি ও তার আশপাশের দ্রষ্টব্যগুলো দেখতে। তাঁরা কিন্তু একবাক্যে বললেন, শহরে তেমন কিছু দেখার নেই। শুনে নিরাশ হলাম।

শহরটা ঘুরে দেখার জন্য একটি ট্যাক্সি ঠিক করা হয়েছিল। ট্যাক্সিচালককে বললাম, "চার পাঁচদিনের প্রোগ্রাম করে এসেছিলাম। শুনছি শহরে বিশেষ কিছু দেখার নেই। যা আছে দেখিয়ে দিতে পারবে?"

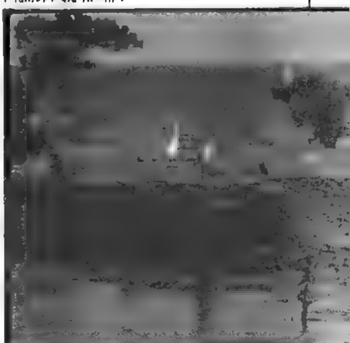
ট্যাক্সিচালক গোঁফ চুমড়ে হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কে বলেছে জামনগরে দেখার কিছু নেই? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সব। পাঁচদিন পর বলবেন, 'অর্জুনভাই, আরও লম্বা প্রোগ্রাম করলাম না কেন?'" এর পর থেকে অর্জুনভাই-ই আমাদের গাইড হয়েছিল। তার কাছেই আমরা জামনগরের উপকূলে অবস্থিত পিরোটান দ্বীপের মেরিন পার্ক, বা জামনগর থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে খিজাড়িয়া পাখিরালয়ের কথা জানতে পারি।

শহরের প্রধান দ্রষ্টব্য অবশ্য ঐতিহাসিক প্রাসাদ, দুর্গ, এগুলি। জামসাহেবদের প্রাসাদ 'প্রতাপ প্যালেস' এর মধ্যে অন্যতম। বিরাট এই প্রাসাদে নাকি কয়েকশো ঘর আছে। এর গড়নও খুব সুন্দর। কিন্তু বর্তমানে এই প্রাসাদ তালাবন্ধ থাকে। জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। শুনলাম, বর্তমান জামসাহেব নাকি ওঁদের এস্টেটের আঙিনায় একটি ছোট বাড়িতে থাকেন। কিন্তু খারাপ লাগল এই দেখে যে, প্রতাপ প্যালেসে রক্ষণাবেক্ষণের বড্ড অভাব। প্রাসাদের চারপাশের ফলের বাগান নিষ্পত্র। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগল এই দেখে যে, প্যালেসের প্রায় গায়ে-গায়েই উঠছে বহুতল ফ্ল্যাট। শুনলাম অর্থাভাবে বর্তমান জামসাহেব এইসব জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। বিদেশে নিশ্চয়ই এই ধরনের ঐতিহাসিক প্রাসাদের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ সরকার থেকেই করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তা আশা করা বাতুলতা।

আমরা উঠেছিলাম সার্কিট হাউসে। এই সার্কিট হাউসের বাড়িটিও পুরনো। বাড়িটির নাম 'লাল বাংলা' (লাল পাথরে তৈরি এটি) এবং জামসাহেবদের আমলে এটি রাজকীয় অতিথিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হত। লাল বাংলাও একটি ছোটখাটো প্রাসাদ। এর ভেতরে নানা কারুকার্য আছে। বিরাট কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে হলে পৌঁছেই চোখে পড়ে মেহগনি কাঠের পুরনো আসবাব, সোফা, চেয়ার-টেবিল প্রভৃতি। এগুলিতে চমৎকার কারুকার্য-করা। বলে রাখা ভাল যে, প্রাচীন কালে গুজরাত কাঠখোদাই কাজের জন্য বিখ্যাত ছিল। আসবাব ছাড়াও কারুকার্য-করা কাঠের পার্টিশন, মাথার ওপর সুদৃশ্য ঝাড়লণ্ঠন এবং ইতালিয়ান মার্বেল বসানো ফায়ারপ্লেস দেখার মতো। সেকালে ছিল অতিথিশালা, আজও তাই। সেজন্য অন্তত এই সুন্দর জিনিসগুলি নষ্ট হচ্ছে না।

এরপর আমরা গেলাম লাখোটা দুর্গ দেখতে। একটি বড় হ্রদের মধ্যে গোলাকার এই দুর্গ তৈরি করিয়েছিলেন জামসাহেব দ্বিতীয় রনমল, ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে। দুর্গটিতে একটা উঁচু গম্বুজ ছিল, যেখান থেকে সারা শহর ও আশপাশের এলাকায় নজর রাখা হত। সেই গম্বুজের এখন ভগ্নদশা। কিংবদন্তী এই যে, দুর্গটি তৈরি করতে তখনকার দিনে এক লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। তাই দুর্গটির নাম লাখোটা দুর্গ। দুর্গটির ভেতর কয়েকটি ভূ-প্রকোষ্ঠ রয়েছে, যদিও তা সাধারণের আওতার বাইরে। কোনও-কোনও জায়গায় রয়েছে সামান্য

পিরোটান দ্বীপের পাখি



কারুকার্য এবং একটি ঘরে রয়েছে কিছু দেওয়ালচিত্র। ফুল পাতা ইত্যাদির সঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহের চিত্রও রয়েছে। দুর্গটি বর্তমানে মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। গুজরাতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া কিছু মূর্তি আছে। তার মধ্যে কয়েকটি সুরসুন্দরীর মূর্তি সত্যিই সুন্দর। একটি ঘরে রাখা আছে একটি অতিকায় তিমিমাছের কঙ্কাল।

লাখোটা দুর্গের কাছেই রয়েছে একটি জৈন মন্দির। এই মন্দিরে পার্শ্বনাথের স্ফটিকে তৈরি মূর্তি রয়েছে। মূর্তিটি খুবই ছোট, কিন্তু তার দ্যুতি হিরার মতো।

এরপর আমরা এলাম খাম্বালিয়া গেটে। গুজরাতের সব শহরেই আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেকালে শহরের চারধারে দেওয়াল তুলে দেওয়া হত, এবং মাঝে-মাঝেই থাকত বিরাট গেট। জামনগরও তার ব্যতিক্রম নয়। শহরের চারপাশের দেওয়াল কালক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেছে, শহরও বেড়ে চলেছে। যখন শহর ঘিরে দেওয়াল তৈরি করা হয়, তখন পাঁচটি বড়-বড় গেট তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে শুধু খাম্বালিয়া গেটই অক্ষত অবস্থায় আছে।



বাঁধনি শাড়ির কারিগরেরা



এই গেটটি তৈরি করেছিলেন জামসাহেব জাসাজি, ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে। এই গেটটি খুবই উঁচু ও এর দুটি লোহার দরজা এত ভারী যে, এদের নড়ানো প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া, এই গেটের পাথরের দেওয়ালে কয়েকটি অপূর্ব সুন্দর মূর্তি খোদাই করা।

ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যগুলো দেখে আমরা ফিরলাম আধুনিক জগতে। জামনগরের রাস্তাঘাট চওড়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শহরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে উইলিংডন ক্রেসেন্ট। এটি নয়াদিল্লির কনট প্লেসের মতো। অর্ধচন্দ্রাকৃতি দালানের নীচে দোকানপাট, ওপরে অফিস। এটিও তৈরি করেছিলেন রণজিৎ সিংজি। শহরে আধুনিক দোকানপাটের অভাব নেই। আবার একশো বছরের পুরনো দোকানও আছে। আছে আধুনিক সিনেমা, হোটেল। জামনগরে জাহাজি লোকেদেরই যাওয়া-আসা বেশি। তাদের কথা মনে করেই হয়তো একটি আধুনিক তিন-তারা হোটেলের নাম দেওয়া হয়েছে 'সেভন সিজ' বা সাত সমুদ্দুর। হোটেলের সাজসজ্জায়ও জাহাজি ও নৌ-জীবনের অনুকৃতি, জাহাজের চাকা, নোঙর ও মাস্তুল ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, জামনগর ভারতীয় নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনীর একটি প্রধান কেন্দ্র।

রণজিৎ সিংজি জামনগরে অনেক স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছিলেন, তা আগে বলেছি। এখানে মেডিক্যাল কলেজ; আয়ুর্বেদীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। হাসপাতালও আছে অনেকগুলো। তার মধ্যে রণজিৎ সিং স্থাপিত লেডি আরউইন হাসপাতাল অন্যতম। এই হাসপাতালে একটি বিশেষ দেখবার জিনিস আছে। তা হচ্ছে 'সোলেরিয়াম'। এই সোলেরিয়ামে সূর্যের রশ্মির সাহায্যে বিভিন্ন চর্মরোগ, বাত, আর্থরাইটিস এসব সারানো হত। এই সোলেরিয়ামে বিভিন্ন কাঁচের প্রকোষ্ঠে সূর্যরশ্মির এক-একটি রঙ আলাদাভাবে বিচ্ছুরিত করে রোগীর গায়ে ফেলা হত, রোগ অনুসারে। জানা গেল, জনৈক জাঁ সেতম্যানের পরিকল্পনায় ও সাহায্যে এই সোলেরিয়াম তৈরি হয়েছিল। শুনলাম, এশিয়ায় এটিই একমাত্র সোলেরিয়াম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজ এই সোলেরিয়াম শুধু দর্শকের কৌতূহল মেটায়, ব্যবহার হয় না। কেন, তার সদুত্তর দিতে পারলেন না কেউই।

জামনগরের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকবে, যদি না বাঁধনি শাড়ি ও তার কারিগরদের বিষয় কিছু বলা হয়। তোমাদের মা-মাসিদের পরনে বাঁধনি শাড়ি নিশ্চয়ই দেখেছ। সাদা মলমলের ওপর ছোট-ছোট রুহিতনের মাধ্যমে ডিজাইন এঁকে সেই আঁকা জায়গাগুলো সুতো দিয়ে শক্ত করে এভাবে বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে ওই জায়গাটায় একটা সুতোর ঘেরাটোপ হয়ে যায় এবং রং লাগে না। তারপর বাটিকের পদ্ধতিতে বিভিন্ন রঙে ডুবিয়ে এই শাড়ি তৈরি হয়। বাঁধনি শাড়ির জন্ম রাজস্থানে। কিন্তু সেখানকার শাড়ির ডিজাইন একটু মোটা দাগের। জামনগরের বাঁধনির ডিজাইন খুব সূক্ষ্ম হয়। বাঁধনির কারিগরেরা মুসলিম। ডিজাইন অনুযায়ী সুতো দিয়ে কাপড় বাঁধা খুবই সময় ও ধৈর্যসাপেক্ষ কাজ। অনেক সময়ই মুসলিম পরিবারের মেয়েরা এবং ছোটরাও এই কাজে হাত লাগায়।

অর্জুনভাই আমাদের এক বাঁধনি কারখানায় নিয়ে গেল। নামে কারখানা, কিন্তু খুবই ঘরোয়া ভাব। মালিক নিজেই একজন ওস্তাদ কারিগর। সেখানে শাড়ির সূক্ষ্ম কাজ দেখে তো আমরা অবাক। ওস্তাদ কারিগর একখানা শাড়ি দেখালেন, তাতে ন'টি রং লাগানো হয়েছে। নাম নবরং শাড়ি। এর পর ওস্তাদ দেখালেন কয়েকখানা সিল্কের শাড়ি, যাতে বাঁধনির ডিজাইনের ওপর সোনালি জরি দিয়ে এমব্রয়ডারি করা। ভীষণ ঝকঝকে এই শাড়িগুলো মেয়েরা বিয়ের পর প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় পরে। নাম 'ঘরাছাড়া শাড়ি'। শোনা গেল, এক-একখানা শাড়ির দাম দশ হাজারের কম হবে না। শুনে তো আমাদের মূর্ছা যাবার উপক্রম।

বাঁধনি শাড়ির কারখানা দেখে আমরা ভাবলাম জামনগর শহরটা দেখা মোটামুটি শেষ হল। কিন্তু অর্জুনভাই মাথা নেড়ে বলল, "না, শহরের আরেকটা দ্রষ্টব্য বাকি

রয়েছে—তা হচ্ছে, জামনগরের শ্মশান।" আমরা তো হতভম্ব। শ্মশানে আবার দেখার কী আছে। কিন্তু এ-পর্যন্ত অর্জুনভাইয়ের কথামতো গিয়ে অনেক কিছু দেখা হয়েছে। তাই ঠিক হল, ওর কথামতোই চলা হবে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম 'মানেকলাল আদর্শ শ্মশান'-এ। গিয়ে দেখি বাসভর্তি করে ভ্রমণার্থীরা এসেছে। শ্মশানটির বিশেষত্ব এই যে, এটি একটি সুন্দর বাগানের মধ্যে অবস্থিত। কল্পনা করা যায়, দাহের চুল্লির পাশেই সবুজের সমারোহ, রং-বেরঙের ফুল ? তা ছাড়া সারা বাগানে ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য মূর্তি। বিভিন্ন দেবতা বা ঋষি-মুনিদের মূর্তি তো আছেই, আছে অনেক রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় নেতার মূর্তিও। তিলক, মহাত্মা গান্ধী, কবির, তুকারাম, সুরদাস, এঁদের পাশেই রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির মূর্তি। তা ছাড়া দেওয়ালচিত্রে রয়েছে রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের কাহিনী। স্বীকার করতেই হল, এই ধরনের শ্মশানের কথা আগে শুনিনি।

জামনগর শহরটা তো মোটামুটি শেষ হল। ঠিক হল এবার যাওয়া হবে খিজাড়িয়াতে, পাখিরালয় দেখতে।

পাখি দেখতে হলে সূর্যোদয়ের সময়ে ওঠা চাই। তাই আগের দিন বিকেলেই আমরা চলে গেলাম খিজাড়িয়াতে। জামনগর শহর থেকে প্রায় ১৫/২০ কিলোমিটার দূরে এই পাখিরালয়ে কিন্তু থাকার কোনও বন্দোবস্ত নেই। জনৈক বন্ধুর মারফত নিকটস্থ সল্ট ওয়ার্কসের এক কর্মীর বাড়িতে রাত কাটানোর ব্যবস্থা হল।

খিজাড়িয়াতে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ফ্লেমিংগো। যদিও সাইবেরিয়ান ক্রেন, পেইন্টেড স্টর্ক, পেলিক্যান, এগুলোও আসে। এ ছাড়া হেরন, আইবিস, এগ্রেট সারস, স্পুনবিল, এসব তো আছেই। শুনলাম কিছুদিন আগেও পাখিতত্ত্ববিদ ডঃ সলিম আলি এখানে নিয়মিত আসতেন। বি বি সি থেকে এখানকার ফ্লেমিংগোর ওপর একটা ডকুমেন্টারি ফিল্মও তোলা হয়েছে। তবে যাঁর বাড়িতে আমরা ছিলাম, তিনি বললেন, "গত দু বছর ধরে গুজরাতে অনাবৃষ্টির ফলে পাখিদের আসা অনেক কমে গেছে।"

ভোরবেলা আকাশ ভাল করে ফর্সা হবার আগেই তৈরি হয়ে নিলাম আমরা। জিপে চড়ে, বাইনোকুলার হাতে। কিছুদুর যেতেই চোখে পড়ল অপূর্ব দৃশ্য। জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে কয়েকশো ফ্লেমিংগো। একটু-আধটু শব্দ হলেই অবশ্য দল বেঁধে উড়েও যাচ্ছে। উড়ন্ত ফ্লেমিংগোর দলকে ভারী সুন্দর দেখায়। একদল যায় তো অন্য দল আসে। এরই মধ্যে-মাঝে মাঝে দেখা যায় অন্যান্য পাখির জটলা।

আকাশের পাখি দেখা শেষ করে আমরা নজর ফেরালাম জলের তলের সামুদ্রিক প্রাণীর দিকে।

এককালে জামনগর প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। কিন্তু আজকাল তেমন বড় জাহাজ এখানে আসতে পারে না। এমনকী, মোটর-লঞ্চ ইত্যাদিও আসে শুধু জোয়ারের সময়। ভাঁটায় পায়ের নীচে জেগে ওঠে খটখটে ডাঙা। জামনগরের উপকূলের সাত-আট কিলোমিটারের মধ্যে কতকগুলি ছোট-ছোট দ্বীপ আছে, ম্যাংগ্রোভ গুল্মে ভরা। এই দ্বীপগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ হচ্ছে 'পিরোটান'। এখানে রয়েছে একটি চমৎকার লাইট হাউস ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু কর্মী। এ ছাড়া কোনও বসতি বা জনপ্রাণী নেই। নেই পানীয় জলও। সব-কিছুই জামনগর থেকে নৌকো করে আসে। জোয়ারের সময় দ্বীপের অনেকটাই চলে যায় জলের তলায়। আবার ভাঁটায় ওড়িশার চাঁদিপুরের মতো সমুদ্রের বুকে অনেক দূর অবধি হেঁটে যাওয়া যায়। তখনই দেখা যায় নানা সামুদ্রিক প্রাণী। বিরাট বিরাট কাঁকড়া। তারা মাছ, জেলি মাছ, অসংখ্য প্রবাল ইত্যাদি। শুনলাম অক্টোপাস, সি-হর্স প্রভৃতিও আছে এখানে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তাদের দেখা পেলাম না। দ্বীপটা আয়তনে বিরাট, তারপর শীতের দিনেও মাথার ওপর চাঁদি-ফাটা রোদ। পুরোটা চক্কর দেওয়া তাই সম্ভব হয়নি। যদিও গুজরাত সরকারের থেকে এই দ্বীপের আশপাশের সমুদ্রকে 'মেরিন পার্ক' বলে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ দর্শকদের জন্য কোন্ দিকে কোন্ প্রাণীর আধিক্য, সে সম্বন্ধে কোনও পুস্তিকা বা বোর্ড নেই। তবে সি-হর্স ইত্যাদি দেখতে না পেলেও নানা আকৃতির জীবন্ত প্রবাল দেখে মন ভরে গেল। সারাদিন কাটিয়ে সন্ধেবেলা জোয়ারের জল এলে জামনগরে ফিরে এলাম আমরা।

পিরোটান দ্বীপে যেতে হলে ভারতীয় শুল্ক বিভাগের অনুমতি নিতে হয়। সঙ্গে খাবার ও পানীয় জল নিতে হবে, কারণ ওখানে কিছুই পাওয়া যাবে না। পরতে হবে মোটা পা-ঢাকা কেডস—যাতে নোনা জল ও ভেজা বালির ওপর হাঁটা যায়। চটি চলবে না, কারণ বালির ওপর ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রস্তরীভূত প্রবাল, যাতে পা কেটে বা ছড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। মোট কথা, পিরোটান দ্বীপের উপর ঘোরাটা আরামপদ নয় মোটেই, কিন্তু তাতে অ্যাডভেঞ্চার আছে। কখনও বা দ্বীপের কোনও দুর্গম জায়গায় স্মাগলারদের দেখা পাওয়াও বিচিত্র নয়।


খিজাড়িয়া পাখিরালয়ে ফ্লেমিংগোর ঝাঁক

জামনগর দেখা শেষ হল। অর্জুনভাই আমাদের স্টেশনে তুলে দিতে এসে বললে, "আশা করি আপনাদের জামনগরে আসা একেবারে বিফলে যায়নি। কিছু-না-কিছু দেখতে পেয়েছেন এখানে, যা অন্যত্র পেতেন না।"

ভারতের অন্যান্য প্রান্ত থেকে যারা গুজরাত ভ্রমণে আসেন, তাঁরা প্রায় সবাই গিরের সিংহ, সোমনাথ ও দ্বারকা দেখে ফিরে যান। তাঁরা যদি একটু ঘুরে জামনগরে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যান, তবে ভাল লাগবে নিশ্চয়ই।

ফোটো : এল· কে· বালসুব্রমনিয়ন

এ-বই আমাদের করবে বিজ্ঞান-সচেতন

বিজ্ঞান যখন ভাবায়। সম্পাদনা অরূপরতন ভট্টাচার্য। সম্পাদনা-সহযোগিতা অনীশ দেব। নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা ৭৩। দাম ৬০ টাকা।

ছাত্রদের বিজ্ঞান-মনস্ক করে তোলার জন্য পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি আরও যত বিজ্ঞানের বই বেরোয় ততই মঙ্গল। যে দেশ বিজ্ঞানে যত উন্নত, সেই দেশের সামগ্রিক উন্নতিও তত বেশি। সারা বিশ্বে তাই এখন বিজ্ঞানচর্চার প্রতি সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হলেও বিজ্ঞানের অকৃপণ সাহায্য নিতে হবে। যুগটাই বিজ্ঞানের।

বিজ্ঞানচর্চায় বাঙালির সুনাম আছে। একটা সময় ছিল যখন ভাল গবেষণাগার, বই, এমনকী উপযুক্ত সুযোগসুবিধাও তেমন পাওয়া যেত না। সেই অবস্থাতেও বাঙালি বিজ্ঞানীরা নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ইদানীং অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। গবেষণারও সুযোগ বেড়েছে। সুযোগ বেড়েছে মাতৃভাষায় বিজ্ঞনচর্চার। এখনও অনেক কিছু করার থাকলেও, এটুকু অন্তত বলা যায়, বিজ্ঞানে আমাদের দেশ ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ এখন বিজ্ঞান-সচেতন হয়েছে।

মানুষকে বিজ্ঞান-সচেতন করে তোলার জন্য বিজ্ঞানের বইগুলি বড় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। করেছেও। যাকে বলা হয় 'পপুলার সায়েন্স'-এর বই, সেরকম বই এখন কিছু-কিছু বেরোচ্ছে। 'বিজ্ঞান যখন ভাবায়' বইটি এ প্রসঙ্গে নতুনতম সংযোজন। বইটির ভূমিকায় বলা হয়েছে

'যে বিজ্ঞান আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, দিবালোক থেকে নিশাকাল পর্যন্ত অন্তরে যে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আছে, বাইরেও যার প্রতি মুহূর্তের উপস্থিতি, সেই বিজ্ঞান সম্পর্কেই আমাদের স্বাভাবিক প্রশ্ন, সচেতন কৌতূহল। বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত এই ধরনের প্রশ্ন এবং তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের উপজীব্য। দুঃখের কথা, অনেক বিষয় একত্রে সঙ্কলিত করে এই ধরনের একটি আকর গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, যদিও এ ধরনের গ্রন্থের বিশেষ উপযোগিতা আছে। সেইজন্যেই এমন একটি গ্রন্থের পরিকল্পনা।'

পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। চোদ্দটি অধ্যায়ে প্রায় ৬০০ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এই বইয়ে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৭৬। প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে ছবি দিয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম ছ'টি অধ্যায়ে আছে অজৈব বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, পরের সাতটি অধ্যায় জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং শেষ অধ্যায়টির নাম 'বিচিত্র প্রশ্নমালা'। শীতের দেশে বেশি কাজ করলে আরাম লাগে কেন, ঝোলার স্ট্র্যাপ কেমন হলে ভার বইতে কষ্ট কম হবে, পাহাড়ে ওঠার সময়ে হাঁফাই কেন—এ ধরনের নানা প্রশ্নের উত্তর আছে এই অধ্যায়ে। প্রশ্ন যতই সহজ মনে হোক, তার উত্তর কিন্তু সব সময় তত সহজ হয় না।



সেইজন্যেই বিজ্ঞান মানুষকে ভাবায়। লুচি ফোলে কেন—এ ধরনের সহজ সরল প্রশ্নের উত্তরেও বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব থাকতে পারে। 'বিজ্ঞান যখন ভাবায়' বইটিতে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরই সুসম্পূর্ণ। জটিল বিষয়কেও সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিক থেকে বইটি বিজ্ঞানের ছাত্রদের নিত্যসঙ্গী হতে পারে। আর যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র নন, তাঁদেরও বইটি কাজে লাগবে। কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তো বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

বইটির পরিকল্পনা নিয়ে দু' একটি কথা এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞানকে আলাদা একটি বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেও ইলেকট্রনিক্স ও বিদ্যুৎ নামে আর একটি অধ্যায় রাখা হয়েছে। এভাবে ভূ-বিজ্ঞান ও সমুদ্র ভূ-বিজ্ঞানকে একত্রে এনেও স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা। বিষয়গুলি এমনই যে, সেগুলি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। অত্যাধুনিক আর্গোনমিক্স বিষয়টিও সম্পাদকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। আর্গোনমিক্সকে শারীর-বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে গণ্য করা হয়। তা হলেও বিষয়টির সঙ্গে অনেকের পরিচয় নেই। এর মূল বিষয়, শরীরের সঙ্গে যন্ত্রের সম্পর্ক। প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যোগ আছে, এরকম বহু প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গত দেওয়া হয়েছে। গরমের দেশে আঁটোসাঁটো পোশাক পরা কি ঠিক, ধুতি, পাঞ্জাবি কি আমাদের দেশের উপযোগী পোশাক, কোন খাবার বেশি খাব—ভাত-রুটি না মাছ-মাংস, এ সব প্রশ্নের উত্তর কার না জানতে ইচ্ছে করে।

এখন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে সারা পৃথিবী তোলপাড় হচ্ছে। ঘরে-ঘরে টেলিভিশন। কিন্তু টিভি ক্যামেরায় যে ফিল্ম থাকে না, তা অনেকেরই জানা নেই। খুব কাছ থেকে লক্ষ করলে টিভির ছবিতে সরু সরু রেখা দেখা যায় কেন, সে প্রশ্নেরও উত্তর জানার প্রয়োজন আছে। মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, সলিড স্টেট কথাগুলো মুখে-মুখে ফেরে। বিজ্ঞাপনেও দেখা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে বিশদভাবে জানার প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞান যখন ভাবায় এ সব উত্তরই সংক্ষেপে দিয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স ও বিদ্যুৎ, রসায়ন-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ও সমুদ্র ভূ-বিজ্ঞান, মৌসুম বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদজগৎ, পক্ষিজগৎ, শারীরবিজ্ঞান, আর্গোনমিক্স, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞ লেখক ও বিজ্ঞানীরা। এঁদের মধ্যে আছেন রমাতোষ সরকার, হরমোহন মুখোপাধ্যায়, অনীশ দেব, পার্থসারথি চক্রবর্তী, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, অজয় হোম, তরুণকুমার দাশ, মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, অমিত চক্রবর্তী ও সম্পাদক নিজে। নির্ভরযোগ্য এক-একটি নাম। সুতরাং বইটি যে উপযোগী হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়


যখন ইচ্ছে খাও সুখে-কুটকুট
বোর্নভিটার পুষ্টিতে ভরা বিসকুট!
Cadbury's
Bournvita
Biscuits
অবশ্যই ক্যাডবেরিস্-এর
ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা
বিস্কিট




Lux